

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮০

প্রকাশক : অমল গুপ্ত অয়ন ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রাকর : রবীন্দ্রনাথ দাশ মুদ্রাকর প্রেস
১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ্ লেন কলকাতা ৭০০০০৩

EINSTEIN : ALOR DISARSE by Amal Dasgupta

সূচিপত্র

এই লেখকের বিজ্ঞানের বই

মহাকাশের ঠিকানা

পৃথিবীর ঠিকানা

মানুষের ঠিকানা

প্রাণের ইতিবৃত্ত

একসময়ে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল নিউটনের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার শেষ কথা ও চূড়ান্ত অগ্রগতি। নিউটনের সূত্র দিয়ে বিজ্ঞানের তাবৎ মৌলিক সমস্যার সমাধান হচ্ছিল এবং বিশ্বের সমগ্র ভবিষ্যৎ ছকে দেওয়া যাচ্ছিল। বিশ্বজগতের কোনো কিছুই অজানা বা রহস্যময় ছিল না। আলেকজাণ্ডার পোপ কবিতা লিখেছিলেন :

প্রকৃতি আর তার নিয়ম নিশায় ছিল কালো।
ঈশ্বর ক'ন, হোক নিউটন! অমনি সব আলো।

তারপরে আইনস্টাইন এলেন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে। নিউটনীয় জগতের চিত্রটির সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে গেল। তখন অন্য এক কবি আরো কয়েকটি লাইন জুড়ে দিলেন :

সেই আলো হায় ক্ষণমাত্র রয়।
হোক আইনস্টাইন! হেঁকেছে শয়তান।
হের চারিধার ঢাকে অন্ধকার
আলো নাহি কোনোখানে—করেছে অন্তর্ধান।

কোথাও আলো নেই। তার মানে, কবির ধারণা, বস্তুজগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লোপ পেয়েছে। কথাটা সনাতন বিজ্ঞানের। আইনস্টাইনের তত্ত্বে নিউটন অগ্রাহ্য নন, বরং সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত। এতে বস্তুজগতের ব্যাখ্যা প্রকৃততর হয়ে উঠেছে—যার অর্থ, বিজ্ঞানের অগ্রগতি। ফলত, নিউটনীয় বিচারের সংকীর্ণ ক্ষেত্র থেকে আলোকে মুক্তি দিয়েছেন আইনস্টাইন। এই অর্থে তিনি আলোর দিশারী। এবং অবশ্যই বিপ্লব ঘটিয়েছেন বিজ্ঞানে।

আইনস্টাইনের জন্ম ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে, বর্তমান পশ্চিম জার্মানীর উল্ম শহরে। আর পারমাণবিক বিদারণ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে তাঁর চিঠি ১৯৩৯ সালের ২রা আগস্ট তারিখে, লং আইল্যাণ্ডের পেকোনিক থেকে। মাঝখানে সময় কেটেছে ৬০ বছর ১৪১ দিন। এই সময়ের সমস্ত পরিস্থিতি যদি সূত্রবদ্ধ করতে হয় এবং অনুসন্ধান করতে হয় এই মানুষটিই কেন এমন একটি চিঠিতে সই দিলেন যা থেকে পারমাণবিক যুগের উদ্ভব হল, তাহলে কল্পনাও হার মানে। উল্ম থেকে

পেকোনিক পর্যন্ত অগ্রগমনকে যদি ক্রমান্বয়ে বিবৃত করতে হয় তাহলে প্রায় সমগ্র বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যার পর্যালোচনা করা দরকার। এই পথের প্রতিটি মোড়ে থেকে গিয়েছে আইনস্টাইনের সুনিশ্চিত ও নির্দেশক উপস্থিতি।

ভবিষ্যতের মানুষ বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধকে চিহ্নিত করবেন আইনস্টাইনের যুগ হিসেবে। যেমন ইতিহাসবিদরা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধকে চিহ্নিত করেন নিউটনের যুগ হিসেবে। নিউটনের সময়ে ও পরে তাঁর চিন্তাধারা কি-ভাবে ধী ও মননের প্রতিটি দিককে ব্যাখ্যা করেছিল তা এখন ইতিহাস। ১৯৫৫ সালে আইনস্টাইনের মৃত্যুর পরে সবে পঁচিশ বছর পার হচ্ছে, কিন্তু এখনো বলা শক্ত আইনস্টাইনের চিন্তাধারার প্রভাব সমাজের সকল স্তরে কতখানি ব্যাপ্ত।

ছোট একটি বইয়ে আইনস্টাইনের সমগ্র জীবন ও বিজ্ঞান উপস্থিত করা প্রায় এক অসম্ভব কাজ। আমি সে-চেষ্টা করিনি। আমি তাঁকে উপস্থিত করেছি তাঁর তিনটি প্রধান বৈজ্ঞানিক কৃতির মধ্যে—বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব। তারই মধ্যে মধ্যে মোটামুটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আইনস্টাইনের জীবনী উপস্থিত করেছি। আইনস্টাইনকে জানা মানে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎকে জানা। এই বইটি পড়ে পাঠক যদি বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহী হন তাহলেই আমার শ্রম সার্থক।

দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির একটি অঞ্চলের নাম সোয়াবিয়া। সেখানে দানিয়ুব নদীর পশ্চিম তীরে প্রচীন একটি শহরের নাম উল্‌ম। ছোট এই শহরে একশোবছর আগে হাজার তিরিশেক লোক বাস করত, আর শিল্প বলতে ছিল একটি ঢালাই কারখানা ও কয়েকটি সুতিকল। শহরের মধ্যে ছিল আঁকাবাঁকা সরু পথ, ঢালু ছাদের ঘরবাড়ি, আর দেড়শো-মিটার উঁচু গম্বুজ সমেত বিশাল এক গোথিক গির্জা। গম্বুজের চুড়োয় উঠলে চোখে পড়ত একদিকে সোয়াবিয়ার আল্‌প্‌স পর্বত, অন্যদিকে বাভারিয়ার সমতল ক্ষেত্র। শহরের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই ক্যাথলিক, কিছু লুথারপন্থী, ছড়ানো ছিটানো কয়েক-শো মাত্র ইহুদী। ইহুদীদের জীবনধারা অন্যদের মতোই, আলাদা করে তাদের চেনা যেত না।

এই উল্‌ম শহরে এক ইহুদী পরিবারে ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম। তাঁর বাবা হেরমান আইনস্টাইন উল্‌ম-এ একটি বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকান খুলেছিলেন বিয়ে করেছিলেন ১৮৭৮ সালে, স্টুটগার্টের এক ধনী শস্য-ব্যবসায়ীর কন্যা পাউলিনে কখ্‌কে। স্টুটগার্ট জিম্‌ন্যাসিয়ামের* পাঠ সম্পূর্ণ করেছিলেন, গণিতে দক্ষ ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখতেন কিন্তু অবস্থার চাপে ব্যবসায়ে নামতে হয়েছিল, অনেকখানি শ্বশুরবাড়ির সাহায্য নিয়েই। আশেপাশে তাঁদের আত্মীয়স্বজনও ছিল অনেক উল্‌ম থেকে চব্বিশ কিলোমিটার দূরে হেষিন্‌গেন-এ থাকতেন

* সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার উচ্চতর বিদ্যালয়।

হেরমানের খুড়তুতো ভাই রুডোল্‌ফ। তাঁর সঙ্গে পাউলিনের বোনের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের মেয়ে এল্‌জা ছিল আলবার্টের সমবয়সী ও ভবিষ্যৎ স্ত্রী। সোয়াবিয়ার স্থানীয় ভাষায় একটা সুরেলা টান থাকত। আইনস্টাইনের কথায় বেশ কিছুকাল এই টান ছিল, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এল্‌জার কথায় সারা জীবন। যেমন এল্‌জা আলবার্টকে বলত আলবার্তল, স্টাট্‌ (শহর)-কে স্তাতল, ইত্যাদি।

আলবার্টের জন্মের একবছরের মধ্যেই উল্‌ম-এ তাঁর বাবার দোকান দেউলিয়া হয়ে গেল। হেরমান উঠে গেলেন ম্যুনিখে। সেখানে তিনি ও তাঁর ভাই ইয়াকব একসঙ্গে মিলে একটি বৈদ্যুতিক সামগ্রীর কারখানা খাড়া করলেন। প্রথমে ছিলেন ভাড়াটে বাড়িতে, ব্যবসার অবস্থা একটু ভালো হতে ম্যুনিখের উপকণ্ঠ সেণ্ডলিঙে বাগান সমেত বাড়ি তৈরি করলেন। কারখানাটি ছোট, সেখানে তৈরি হত ডায়নামো, আর্কল্যাম্প ও মাপজোখের যন্ত্রপাতি। ইয়াকব ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, তিনি কারখানার কাজ দেখতেন। আর ব্যবসায়ের দিক দেখতেন হেরমান।

১৮৮১ সালে আলবার্টের বোন মায়ার জন্ম হল। প্রায় সমবয়সী দুই ভাইবোনে খুবই ভাব ছিল। বাড়ির বাগানে খেলা করত দুজনে। আলবার্ট আইনস্টাইনের বয়স যখন প্রায় ষাট, থাকতেন আমেরিকার প্রিন্সটনে, সে-সময়ে তাঁর এই বোনটিও মুসোলিনির ইতালি ছেড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর কাছে। মায়ার জীবনের শেষ বারোটি বছর প্রিন্সটনে দাদার কাছেই কেটেছিল। ভাইবোনে এক সঙ্গে বই পড়তেন। ১৯৫১ সালে, আইনস্টাইনের মৃত্যুর চারবছর আগে, মায়া মারা যান। তার আগে আইনস্টাইন দুই স্ত্রীকে হারিয়েছেন, নিজেও একবার মরতে মরতে বেঁচে উঠেছেন, মৃত্যুতে তিনি নির্বিকার ছিলেন। কিন্তু মায়ার মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল।

হেরমান আইনস্টাইন ছুটির দিনে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ম্যুনিখের বাইরে গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যেতেন। পরিবারের এটাই রেওয়াজ ছিল। বহু আত্মীয়স্বজনও যোগ দিতেন। মাঝে মাঝে হেখিনগেন থেকে এল্‌জাসহ আসতেন রুডোল্‌ফ আইনস্টাইন।

আলবার্টের মা পাউলিনে গানবাজনায় পটু ছিলেন। পিয়ানো

বাজাতেন ও গান গাইতেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গীতকার ছিলেন বেটহোভেন। আইনস্টাইন-পরিবারে সঙ্গীতের কদর ছিল। ক্লাসিকাল জার্মান সাহিত্যের চর্চা ছিল। পারিবারিক আসরে হেরমান আইনস্টাইন আবৃত্তি করতেন হাইনে, লেসিং ও শিলার। শিলারের কবিতায় সোয়াবিয়ার স্থানীয় ভাষার রেশ পাওয়া যেত, তাই শিলার ছিলেন হেরমান আইনস্টাইনের বিশেষ প্রিয় কবি।

শিশু আলবার্ট ছিল শান্তশিষ্ট ও খানিকটা মুখচোরা। কারও সঙ্গে মিশত না, অন্য ছেলেমেয়েদের দৌড়ঝাঁপ খেলাধুলো ও হৈ-হুল্লোড় এড়িয়ে চলত। বিশেষ করে সৈনিক-সৈনিক খেলা একেবারে বরদাস্ত করতে পারত না। রাস্তা দিয়ে যখন সৈন্যরা মার্চ করে যেত তখন উৎসাহী ছেলেরা সেই সৈন্যদের পায়ে পা মিলিয়ে পাশাপাশি চলত, বড়োরা গর্বের সঙ্গে রাস্তার দু-পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখত। কিন্তু আলবার্ট থাকতে চাইত না, বাবার হাত ধরে টানাটানি করে বাড়ি ফিরে যেতে চাইত। পরে বড়ো হয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'কেউ যে বাজনার তালে তালে সারিবদ্ধ হয়ে কুচকাওয়াজ করায় আনন্দ পেতে পারে---এইটুকু জানাই তার ওপর আমার ভক্তি চটে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। ভুল করে তাকে একটা বড়ো আকারের মস্তিষ্ক দেওয়া হয়েছে; শুধু মেরুদণ্ডতেই তার কাজ চলে যেত। সভ্যতার এই দুষ্টক্ষতের অতি দ্রুত অপসারণ প্রয়োজন। হুকুম মোতাবেক সাহস দেখানো, কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংসা এবং স্বদেশপ্রেমের নামে আর যে-সব চূড়ান্ত মূর্খতা চলে, আমি তা মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। যুদ্ধ আমার কাছে এক হীন ও ন্যক্কারজনক ব্যাপার বলে মনে হয়। এরকম ঘৃণ্য ব্যাপারে অংশগ্রহণ করার চেয়ে আমি বরং ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে রাজী আছি।'

ছোটবেলার আলবার্ট আর পাঁচটা ছেলের মতোই। বরং ততোটাও নয়। কেননা, তিনবছর বয়সেও তার মুখে কথা ফোটেনি। ন'বছর বয়সেও সে কথা বলত ঠেকে ঠেকে, কেউ কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে জবাব দিতে অনেক সময় নিত। বাবা-মার ভয় ছিল ছেলেটা না হাবা হয়। ছোটবেলায় আলবার্টকে দেখে কখনো মনে হয়নি তার মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা আছে।

বাল্যকাল কেটেছিল সিধে ও সরলভাবে। পাঁচবছর বয়সে তাকে ভর্তি করা হয় বাড়ির কাছেই একটি ক্যাথলিক স্কুলে। ইহুদী বাড়ির ছেলে হিসেবে তাকে কোনো ইহুদী স্কুলেই দেওয়া উচিত ছিল। সেটা হয়নি এ-কারণে যে প্রথমত ধারেকাছে কোনো ইহুদী স্কুল ছিল না, দ্বিতীয়ত ইহুদী স্কুলে পড়ার খরচ আইনস্টাইন পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট বেশি ছিল। তাছাড়া আইনস্টাইন পরিবার ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত। কাজেই, হোক ক্যাথলিক স্কুল, ভালো লেখাপড়া যদি হয় তো ক্ষতি কি।

এই সময়ে আলবার্টের চিন্তাভাবনাকে প্রচণ্ডরকমের নাড়া দেবার মতো একটি ঘটনা ঘটেছিল।

আইনস্টাইনের বয়স যখন সাতষট্টি তখন তিনি নিজের জীবন সম্পর্কে একটি ছোট লেখা লিখেছিলেন : কাগজে কারও মৃত্যু-সংবাদ ছাপা হলে সেই সঙ্গে সংক্ষিপ্ত একটি জীবনীও প্রকাশ করা হয়—তার নাম 'অবিচুয়ারি'। আইনস্টাইন আত্মজীবনীমূলক নিজের এই শেষ বয়সের লেখাকে বলে গিয়েছেন তাঁর 'অবিচুয়ারি'। এই অবিচুয়ারিতে ঘটনাটির উল্লেখ এইরকম :

> আমি তখন চার কি পাঁচ বছরের শিশু, আমার বাবা আমাকে একটি কম্পাস দেখিয়েছিলেন। আমার কাছে সেটা ছিল অবাক হবার মতো একটি ঘটনা। কম্পাসের কাঁটার আচরণ যে এমন সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে এ-ব্যাপারটাকে সাধারণ কোনো ঘটনার সঙ্গে আদৌ খাপ খাওয়ানো যায় না। ·· এই ঘটনা আমার ওপরে গভীর ও স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। সবকিছুর আড়ালে এমন কিছু আছে যা গভীরভাবে লুক্কায়িত। ছোটবেলা থেকে মানুষ চোখের সামনে যা-কিছু দেখে তাতে তার এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় না। সে তো দেখছে পড়ন্ত বস্তু, বাতাস ও বৃষ্টি ; দেখছে চন্দ্র, কিংবা এই ঘটনা যে চন্দ্র খসে পড়ে না ; দেখছে জীবন্ত ও অ-জীবন্ত বস্তুর পার্থক্য—কোনো কিছুতেই সে অবাক হয় না।

অল্প কিছুকাল পরে আলবার্টের জীবনে আরো একটি ঘটনার প্রভাব পড়ে। মায়ের উৎসাহে ছ'বছর বয়সে বেহালা শিখতে শুরু করে সে। গোড়ায় শুরু করেছিল অনেকটা চাপে পড়ে এবং অভ্যাস-বশে বজায় রেখেছিল। কিন্তু বছর সাতেক পরে মোৎসার্টের সঙ্গীত

বেহালায় তুলতে গিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে সঙ্গীতের সুরেও কী আশ্চর্য গাণিতিক কাঠামো। তারপর থেকে এই বেহালা ছিল তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী, কি সুখে কি দুঃখে। বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানীর পরিচয়-জ্ঞাপক চিহ্ন হয়ে উঠেছিল এই বেহালাটি। আইনস্টাইনের ছেলে হান্‌স নিজের বাবা সম্পর্কে বলেছেন, 'যখনই অনুভব করতেন সামনে রাস্তা নেই বা অবস্থা খুবই দুরূহ তিনি আশ্রয় নিতেন সঙ্গীতের মধ্যে এবং সাধারণত সকল অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারতেন।' আইনস্টাইন অসাধারণ বেহালা বাজাতেন তা নয়, কিন্তু অসাধারণ ছিল তাঁর মগ্নতা ও তাঁর আনন্দবোধ।

এমনিভাবে বালক আলবার্টের জীবনে হেরমান আইনস্টাইন এলেন তাঁর কম্পাস নিয়ে, পাউলিনে আইনস্টাইন এলেন তাঁর সঙ্গীত নিয়ে। তৃতীয় যিনি এসেছিলেন তিনি আলবার্টের কাকা ইয়াকব। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, তিনি না থাকলে হেরমান আইনস্টাইনের কারখানা ও ব্যবসা অনেক আগেই উঠে যেত। নিজের কাকা সম্পর্কে আইনস্টাইন একটি ঘটনাই অনেকের কাছে বলেছেন। কাকা ইয়াকব ভাইপোকে বীজগণিত শেখাতে গিয়ে বলতেন, 'বীজগণিত ভারি মজার বিজ্ঞান, বুঝলি তো। মনে কর আমরা সব শিকার করতে বেরিয়েছি। ছোট যে জন্তুটাকে আমরা শিকার করতে চাই তার নাম আমরা জানি না। কাজেই তার নাম দিলাম x। তারপরে জন্তুটা ধরা পড়তেই একেবারে আমাদের মুঠোর মধ্যে। তখন আমরা তার ঠিক-ঠিক নামটি দিয়ে দিলাম।' কাকার এই গল্প শুনে ভাইপো নিশ্চয়ই বীজগণিত শেখার উৎসাহ পেয়েছিল। তার চেয়েও বেশি, এই গল্প আলবার্টের মনে গেঁথে গিয়েছিল একেবারে। অনেক পরে গণিত-না-জানা লোকের কাছে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন যে-সব উপমা ব্যবহার করেছেন—লিফ্‌ট, ট্রেন, জাহাজ—তা যেন ইয়াকবের সেই গল্পই নতুন করে বলা, সেই জন্তু 'যার নাম আমরা জানি না।'

ক্যাথলিক স্কুলে পাঁচবছর পড়ার পরে দশবছর বয়সের আলবার্টকে ভর্তি করা হল লুইট্‌পোল্‌ড জিমন্যাসিয়ামে। এই স্কুলে পড়ানো হত ল্যাটিন ও গ্রীক, ইতিহাস ও ভূগোল, এবং সরল গণিত। এখানকার

নিয়মকানুনও অনেক কড়া ছিল।

দুই স্কুলেই ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত। ক্যাথলিক স্কুলে আলবার্ট ছিলেন একমাত্র ইহুদী ছাত্র। রীতি অনুযায়ী তাঁকেও ক্যাথলিকবাদে শিক্ষা নিতে হত। ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত আলবার্টের পরিবারে এ-নিয়ে কোনো কথা ওঠেনি। কিন্তু আইনস্টাইন পরিবারে একটি ইহুদী প্রথা মেনে চলা হত। তা হচ্ছে একটি গরীব ইহুদীকে সপ্তাহে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো। এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসতেন মাক্স টালমাই নামে একজন ইহুদী মেডিকেল ছাত্র, বয়সে আলবার্টের চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো। এই মাক্স টালমাই আলবার্টকে পড়তে দিতেন সাধারণের জন্য লেখা বিজ্ঞানের বই। ওদিকে জিমন্যাসিয়ামে ইহুদী ছাত্রদের পড়তে হত ওল্ড টেস্টামেণ্ট। তা পড়ে আলবার্ট কিছুকালের জন্য ঘোর বাইবেল-বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের বই পড়া শুরু করতেই অল্প কিছুকালের মধ্যে বিশ্বাসের সংকট দেখা দিল। অবিচুয়ারিতে আইনস্টাইন লিখছেন, 'সাধারণের জন্য লেখা বিজ্ঞানের এই পড়ে আমি এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করলাম যে বাইবেলের গল্পেঅনেক কিছুই সত্য হতে পারে না।'

তার ফল হল বড়ো ভয়ানক। চিন্তার রাজ্যে ওলোটপালোট ঘটে গেল। ধারণা হল যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রাষ্ট্র তরুণদের প্রতারিত করছে। এই ধারণা একবার হলে আর রক্ষে নেই। এই অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয় সমস্ত রকমের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সন্দেহ। আলবার্টেরও তাই হল. আইনস্টাইন সারা জীবন এই সন্দেহ পোষণ করে গিয়েছেন।

এই সময়ে আলবার্ট তার ইঞ্জিনিয়ার কাকার কাছে বীজগণিত ও জ্যামিতির পাঠ নিতে শুরু করেছিলেন। কাকা তাঁর নিজস্ব অনবদ্য ভঙ্গিতে পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি তাঁকে পড়ান। উপপাদ্যটি প্রমাণ করতে গিয়ে আলবার্টকে প্রচুর মেহনৎ করতে হয়। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির জটিল যুক্তিগত কাঠামোটি তখনো তিনি ধরতে পারেননি। তারপরে কাকার কাছ থেকে জ্যামিতির একটি পাঠ্যপুস্তক পান। অবিচুয়ারিতে আইনস্টাইন লিখছেন,

বারো বছর বয়সে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের দ্বিতীয় এক বিস্ময়ের অভিজ্ঞতা আমি লাভ করি। সেটি ছিল ইউক্লিডীয় সরল জ্যামিতি নিয়ে লেখা ছোট একটি বইয়ের মধ্যে। স্কুলের বছর শুরু হবার মুখে বইটি আমার হাতে এসে যায়। আমি দেখলাম কতকগুলো নিশ্চিত উক্তি করা হচ্ছে। যেমন, বলা হচ্ছে, ত্রিভুজের তিনটি লম্ব একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। ব্যাপারটা এমন নয় যে দেখে বোঝা যায়। কিন্তু এমন নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা চলে যে সন্দেহ মাত্র থাকে না। কী সহজ, কী নিশ্চিত। এ ব্যাপারটা আমার মনে যে ছাপ ফেলল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধকে যে বিনা প্রমাণে মেনে নিতে হয় সেটা তখন আর অস্বস্তিকর মনে হল না। কোনো অনুজ্ঞায় প্রমাণ আরোপ করতে পারাটাই যথেষ্ট ছিল। মনে পড়ে, পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি প্রমাণ করা গিয়েছিল ত্রিভুজের সমতুলতার ভিত্তিতে। তখন মনে হয়েছিল, সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় তার একটি সূক্ষ্মকোণের দ্বারা। যা স্বতঃসিদ্ধ নয় তারই জন্য প্রমাণ দরকার। জ্যামিতির আলোচনার বিষয়ের সঙ্গে মিল আছে ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করা বিষয়ের—'যাকে দেখা যায় ও স্পর্শ করা যায়'। এই ধারণা থেকেই দার্শনিক কাণ্ট তাঁর বিচারে সম্ভাবনা সম্পর্কিত সমস্যাকে দেখেছিলেন।*

আলবার্টকে কাণ্টের রচনাবলী পড়ার কথা বলেছিলেন মাক্‌স টালমাই। পরে তিনি লিখছেন, 'আলবার্ট তখনও শিশু, মাত্র

---

* ১৯৩৩ সালের ১০ই জুন তারিখে আইনস্টাইন অকসফোর্ডে হারবার্ট স্পেনসার বক্তৃতা দিয়েছিলেন, 'তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যার পদ্ধতি সম্পর্কে'। তিনি বলেছিলেন, 'পশ্চিমী বিজ্ঞানের লালনভূমি হিসেবে প্রাচীন গ্রীসকে আমরা শ্রদ্ধা করি। বিশ্ব এখানে সর্বপ্রথম দেখতে পেয়েছিল যুক্তিবদ্ধ ব্যবস্থার বিস্ময়। ধাপ থেকে ধাপে এমনই সঠিকতার সঙ্গে তার অগ্রগতি যে তার প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞা একেবারেই অকাট্য। আমি ইউক্লিডের জ্যামিতির কথা বলছি। যুক্তির এই বিজয় মানুষের মেধাকে দিয়েছে পরবর্তী সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আস্থা। ইউক্লিড যদি আপনার তরুণ বয়সের উৎসাহকে উদ্দীপ্ত করতে না পেরে থাকে তাহলে বৈজ্ঞানিক চিন্তাশীল হবার জন্য আপনার জন্ম হয়নি।'

তেরো বছর তার বয়স, তবুও মনে হয়েছিল—সাধারণ নশ্বর মানুষের কাছে যা দুর্বোধ্য কাণ্টের সেই রচনাবলী সে পরিষ্কার বুঝতে পারে।'

মাধ্যমিক স্কুল লুইট্‌পোল্‌ড জিমন্যাসিয়ামের শিক্ষকরা কিন্তু তা মনে করতেন না। তাঁদের কাছে আলবার্ট ছিলেন পিছিয়ে-পড়া ছেলে, বেয়াড়া প্রকৃতির ও উদ্ভট রকমের খামখেয়ালী। লেখাপড়ায় তাঁর কিছু হবার নয়। হেডমাস্টারমশাইকে আলবার্টের বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন ছেলেকে কোন্ লাইনে দেওয়া উচিত। হেডমাস্টার-মশাই বলেছিলেন, 'যে লাইনে খুশি দিতে পারেন। কিছুই যায় আসে না। কেননা, কোনো লাইনেই ও কিছু করতে পারবে না।'

আলবার্ট নিজেও ছিলেন খুবই অসুখী। স্কুলের কড়া শাসন আদপেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। জবরদস্তি পড়াশুনোর চাপে আতঙ্ক বোধ করতেন।

১৮৯৪ সালে হেরমান আইনস্টাইনের ব্যবসায়ে আবার মন্দা দেখা দেয়। তখন তিনি ম্যুনিখের ব্যবসা উঠিয়ে দিয়ে মেয়ে মায়াকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে যান ইতালির মিলানে। জিমন্যাসিয়ামের পড়া শেষ করার জন্য আলবার্ট ম্যুনিখেই থেকে যান।

কিন্তু জিমন্যাসিয়ামের লেখাপড়ায় আলবার্টের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। জিমন্যাসিয়ামকে ঘৃণা করতেন। আইনস্টাইন বলেছেন, 'প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা আমার কাছে ছিল সার্জেন্টের মতো, জিমন্যাসিয়ামের শিক্ষকরা লেফটেনেন্টের মতো।' আলবার্ট লেখাপড়া যেটুকু করতেন সবই নিজে নিজে। বিশেষ করে গণিতে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জিমন্যাসিয়ামের পাখি-পড়ার মতো লেখাপড়ায় তাঁর রীতিমতো বিতৃষ্ণা।

মাস ছয়েক মাত্র কেটেছিল। তারপরে আলবার্ট একটি কাণ্ড ঘটান। এক ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট যোগাড় করেন যে তাঁর স্নায়ুবৈকল্য ঘটেছে, অতএব তাঁর উচিত মিলানে বাবা-মার কাছে চলে যাওয়া। আর গণিতের শিক্ষকের কাছ থেকে এই মর্মে সার্টিফিকেট পেয়ে যান যে গণিতে তিনি যথেষ্ট অগ্রসর, অতএব জিমন্যাসিয়ামের ডিপ্লোমা ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য যেতে পারেন।

ভেবেছিলেন জিমন্যাসিয়াম থেকে ছাড়া পেতে কিছুটা বেগ পেতে হবে। হল উল্‌টোটা। তাঁর শিক্ষকই তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে তিনি স্কুল ছেড়ে চলে গেলেই ভালো হয়! কেন? না, আলবার্টের সঙ্গদোষে অন্য ছাত্ররাও শিক্ষককে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে চায় না।

জিমন্যাসিয়াম থেকে ছাড়া পেয়ে আলবার্ট সোজা হাজির হন মিলানে, বাবা-মার কাছে। তারপরে সেই পনেরো বছরের বালক এক অস্বাভাবিক কাজ করে বসেন—জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগ। একুশ বছর বয়স পর্যন্ত আলবার্ট আইনস্টাইন নাগরিকত্বহীন ছিলেন। তারপরে সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক হন। তখনকার দিনে কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক না হয়েও বছরের পর বছর নির্বিবাদে কাটানো চলত।

ইতালি দেখে আইনস্টাইন মুগ্ধ। প্রেমে পড়ে যান যখন দেখেন ইতালির প্রাচীন মন্দির ও সংগ্রহশালা, চিত্রালয় ও প্রাসাদ, ছবির মতো সুন্দর কুটির, আনন্দ-উৎফুল্ল ও অতিথি-বৎসল মানুষ। চারদিকে কত গান কত সুর, মানুষের কথায় কী উদ্দীপনা ও ঝংকার। মুক্তির নিশ্বাস ফেলেন আইনস্টাইন। জার্মানিতে ছিলেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধনের মধ্যে, ইতালিতে এসে সমস্ত অন্তর দিয়ে একটা স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করতে থাকেন। তবে শুধুই ঘুরে বেড়ানো নয়, খানিকটা সময় ব্যয় করতে থাকেন নিজে নিজে গণিত নিয়ে পড়াশুনোয়।

কিন্তু এমনিভাবে তো আর চিরকাল চলতে পারে না, ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবতে হয়। ওদিকে বাবার ব্যবসা আবার খারাপের দিকে যাচ্ছে। বাবা মনে করেন, আইনস্টাইন যদি ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার হন তো সবদিক থেকেই ভালো হয়। তখন স্থির হয় আইনস্টাইন জুরিখে গিয়ে সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হবেন। জার্মানির বাইরে মধ্য-ইউরোপে এইটিই ছিল তখনকার দিনে বিজ্ঞান শিক্ষার সবচেয়ে নাম-করা কেন্দ্র।

আইনস্টাইন তো জুরিখে এলেন, কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে না পারার জন্য পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হতে পারলেন না।

তবে গণিতে এতই ভালো নম্বর পেয়েছিলেন যে স্কুলের অধ্যক্ষ আইনস্টাইনকে পরামর্শ দিলেন সুইজারল্যাণ্ডের কোনো এক হাই-স্কুল থেকে ডিপ্লোমা নিতে এবং ভর্তি হবার জন্য আবার আবেদন করতে। আইনস্টাইন তাই করলেন, গেলেন আরাউ-এ, সেখানকার স্কুলে ভর্তি হলেন। এই স্কুলটি আইনস্টাইনের ভালো লেগেছিল, স্কুলটি চালিত হত প্রগতিশীল ধরনে, ছাত্রদের ছিল কাজ করার স্বাধীনতা ও ভালো ল্যাবরেটরি ব্যবহার করার সুযোগ।

আরাউ-এর স্কুল থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে আইনস্টাইন আবার আবেদন করলেন। এবারে বিনা পরীক্ষাতেই আইনস্টাইনকে পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি করে নেওয়া হল।

এই সময়ে আইনস্টাইন সিদ্ধান্ত করলেন, বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে পড়াশুনো আর নয়, এবারে পড়বেন পদার্থবিদ্যা। বিষয় কেন বদলালেন তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর অবিচুয়ারিতে।

> আমি দেখলাম গণিত অজস্র বিশেষ বিষয়ে বিভক্ত। এর যে কোনো একটি নিয়েই আমাদের ক্ষুদ্র আয়ুষ্কাল ব্যয় হয়ে যেতে পারে। ফলত, আমি দেখলাম আমার অবস্থা হয়েছে সেই বুরিদানের গাধার মতো, যে দুই আঁটি ঘাসের মধ্যে কোনটি খাবে স্থির করতে পারেনি। স্পষ্টতই তার কারণ এই যে গণিতের ক্ষেত্রে আমার অনুভূতি এত জোরালো নয় যে যা মূলগতরূপে গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রকৃতই ভিত্তিস্থানীয়, তাকে বাদবাকি মোটামুটি পরিহার্য বিদ্যা থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে নিতে পারি। ···একথা ঠিক যে পদার্থবিদ্যাও নানা পৃথক ক্ষেত্রে বিভক্ত। এর যে কোনো একটি নিয়েই ক্ষুদ্র কর্মকাল ব্যয় হতে পারে এবং তারপরেও গভীরতর জ্ঞানের স্পৃহা অচরিতার্থ থেকে যায়। এখানেও লঘুমাত্রায় সম্পর্কিত পরীক্ষামূলক তথ্য প্রচুর। তবে এক্ষেত্রে আমি শীঘ্রই শিখে নিলাম মূলাভিমুখীকে চিনে বার করতে এবং অন্য সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে ····

এই ষোলবছর বয়সেই আইনস্টাইন ছোট একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার বিষয়, চৌম্বক শক্তি। প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দেন তাঁর মামা সেজার কখ্-এর কাছে। বলা হয়ে থাকে, এই প্রবন্ধ

থেকেই আরো দশবছর পরের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সূচনা। এই প্রবন্ধের আলোচনায় আমরা পরে আসব।

পলিটেকনিকে প্রচুর পরিশ্রম করতেন আইনস্টাইন। কিন্তু সেটা ক্লাসের পড়ার বিষয় নিয়ে নয়। পড়ার বিষয়গুলো আইন-স্টাইনের কাছে মনে হত বড়োই মামুলি ও ক্লান্তিকর। খানিকটা ঔদ্ধত্য ও অনেকখানি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতেন শুধু সেইসব বিষয় নিয়ে যেগুলো তাঁর বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ। বেশির ভাগ সময় দিতেন বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্বের তত্ত্বের ওপরে, যে তত্ত্ব কয়েক বছর আগে জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল উপস্থিত করেছিলেন।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যে মান দেখা যাচ্ছে তাতে বিদ্যা যে অনেক আগে মারা পড়েনি সেটাই আশ্চর্যের।' পরে এক সময়ে আইনস্টাইনের মুখ থেকে এমন কথাও শোনা গিয়েছে।

তবুও কিন্তু দেখা গেল চতুর্থ বছরের শেষে ডিগ্রী পরীক্ষায় বসে তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। পরীক্ষার পড়া তৈরি করেছিলেন ক্লাসের বন্ধু মার্সেল গ্রস্‌মানের নোট ধার নিয়ে। গ্রসমান মনোযোগী ছাত্রের মতো সমস্ত ক্লাসের নোট নিতেন।

প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী পাওয়া তরুণ বুদ্ধিদীপ্ত এক যুবক ১৯০০ সালে নিশ্চয়ই আশা করতে পারতেন কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পেয়ে যাবেন এবং নিজের খুশিমতো কিছু গবেষণা করতে পারবেন। আইনস্টাইনের সহপাঠীরা সকলেই এমনি কোনো-না-কোনো কাজ পেয়ে গেলেন। পেলেন না শুধু আইনস্টাইন। বিদ্যালাভের জন্য আইনস্টাইন যে অধ্যাপকদের কাছে কোনোদিন দাঁড়াননি সেই অধ্যাপকরাও তাঁর জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হলেন।

পরের দু-বছর ধরে খুবই অনিশ্চিত অবস্থা। মাঝেমধ্যে সাময়িক পড়ানো বা গবেষণার কাজ পেতেন—তারপরে আবার সেই বেকার জীবন। তারই মধ্যে ১৯০০ সালে মৌলিক বিষয় নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের ভিত্তিতে থিসিস রচনা করে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেন।

শেষপর্যন্ত বেকার জীবন থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন তাঁর

সেই বন্ধু মার্সেল গ্রস্‌মান। গ্রস্‌মানের চেষ্টায় বার্ন্‌-এর পেটেণ্ট অফিসে একটি কাজ পেয়ে যান আইনস্টাইন। নতুন কাজে যোগ দেন ১৯০২ সালের ২৩শে জুন তারিখে। তার আগে ১৯০১ সালের ২১শে ফেব্রুআরি তারিখে তিনি সুইস নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি থেকে রেহাই পেয়েছিলেন ভেরিকোস ভেইন ও ফ্ল্যাটফুট থাকার জন্য।

এমনিভাবে তেইশ বছর বয়সে আলবার্ট আইনস্টাইন হয়ে উঠলেন সুইস সরকারী কর্মচারী (তৃতীয় শ্রেণী)।

বার্ন

বার্ন-এর পেটেণ্ট অফিসে সাতবছর কাজ করেছিলেন আইনস্টাইন। এই সময়ে অল্প কয়েকজনই তাঁকে চিনতেন। তাঁরা কেউ-ই তাঁর সম্পর্কে খুব একটা উঁচু ধারণা পোষণ করতেন না। কেনই বা করবেন। অতি সাধারণ চাকরি করেন তিনি। সুইস নাগরিক হয়েছেন। বার্ন-এ থাকেন। মন লাগিয়ে আপিসের কাজ করেন। কোনো দিক থেকেই অসাধারণ কিছু নয়। মোটামুটি ধরে নেওয়া চলত অসাফল্যের মূর্তিমান দৃষ্টান্ত তিনি। আইনস্টাইনকে দেখে তখন কল্পনা করা অসম্ভব ছিল তাঁর জীবনে কী নাটকীয় পরিবর্তন ঘটতে চলেছে।

পেটেণ্ট আপিসে একবছর চাকরি হবার পর আইনস্টাইন বিয়ে করেন। হাঙ্গেরি থেকে জুরিখ পলিটেকনিকে এসেছিলেন মিলেভা মারিৎশ, আইনস্টাইনের সঙ্গে পড়তেন (পদার্থবিদ্যার ক্লাসে একমাত্র তিনিই শেষ পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি), তাঁরই সঙ্গে বিয়ে হয়।

আইনস্টাইন কেন যে বিয়ে করেছিলেন তার কারণ স্পষ্ট নয়। বিজ্ঞান-জানা সহধর্মিণীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। তাই যদি হত তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রী এল্‌জা সম্পর্কে বলতেন না 'আমার এই স্ত্রী যে বিজ্ঞান জানেন না তাতে আমি খুশি, আমার প্রথম স্ত্রী বিজ্ঞান জানতেন।' বোধহয় ভেবেছিলেন ঘরে স্ত্রী থাকলে ঘর-সংসারের জন্য আর ভাবতে হয় না, তাহলে নিজে অনেক বেশি সময় পাবেন। তাই যদি ভেবে থাকেন তাহলে হতাশ হয়েছিলেন। ঘরসংসারের কাজ করার মানুষ মিলেভা ছিলেন না। ১৯১৪ সালে এই বিয়েতে বিচ্ছেদ ঘটে, শেষপর্যন্ত ১৯১৯ সালে বিয়ে নাকচ হয়ে যায়।

দুটি ছেলে হয়েছিল তাঁদের। ১৯০৪ সালে হান্‌স আলবার্ট, ১৯১০ সালে এডুয়ার্ড। হান্‌স আলবার্ট আইনস্টাইন এখন বার্ক্‌লে-তে হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক। এডুয়ার্ড আলবার্ট শিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছিলেন, অল্প কিছুকাল আগে মারা গিয়েছেন।

আইনস্টাইনের সংসারযাত্রার যে ছবি পাওয়া যায় তা খুবই দুঃখের। বিয়ের কয়েক বছর পরে একজন সহকর্মী গিয়েছিলেন আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি লিখছেন, 'একটু আগে জল ঢেলে মেঝে ধোয়া হয়েছে, ভিজে জামাকাপড় হলঘরে টাঙানো। এগুলো শুকোবার জন্য সদর দরজা খোলা রাখা হয়েছে। আমি আইনস্টাইনের ঘরে ঢুকলাম। তিনি একহাতে শান্তভাবে একটি দোলনা দোলাচ্ছেন। তাঁর মুখে অতি নিকৃষ্ট একটি চুরুট। অন্য হাতে একটি খোলা বই। উনুন থেকে উৎকট ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কি করে যে তিনি এই অবস্থা সহ্য করছেন!'

আইনস্টাইন সহ্য করতে পারতেন। বাইরের গণ্ডগোল তাঁর মনকে স্পর্শ করত না। যে-কোনো অবস্থায় যে-কোনো পরিবেশে তিনি তন্মনস্ক থাকতেন। এমনও হয়েছে, রাস্তার ধারে বা পুলের ওপরে দাঁড়িয়ে কারও জন্য অপেক্ষা করছেন। যাঁর আসার কথা তিনি এলেন একঘণ্টা দেরিতে। আইনস্টাইন কিন্তু টেরও পেতেন না, নিজের চিন্তায় এমনই মগ্ন হয়ে থাকতেন। বলতেন, 'যে-ধরনের কাজ আমি করি তা যদি ঘরে বসে করা চলে তাহলে বাইরে দাঁড়িয়েও

না করতে পারার কোনো কারণ নেই।' অবিচুয়ারিতে নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমি যে-ধরনের মানুষ, এমনি এক মানুষের সত্তায় মৌল হচ্ছে—সে কী চিন্তা করে এবং কেমনভাবে চিন্তা করে—একান্তভাবে তাই; সে কী করে এবং কী ভোগ করে—তা নয় অতএব অবিচুয়ারিকে সীমাবদ্ধ রাখা চলে কতকগুলো চিন্তা উপস্থিত করার মধ্যে—যে-সব চিন্তা আমার প্রয়াসে প্রভূত ভূমিকা পালন করেছে।'

বার্ন-এ আসার অল্প কিছুকাল পরেই আইনস্টাইন খবরের কাগজে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে তিনি পদার্থবিদ্যা পড়াতে পারেন, দক্ষিণা ঘণ্টায় তিন ফ্রাঁ। এই বিজ্ঞাপনের জবাবে দু-জন ছাত্র পেয়ে গেলেন—মরিস সোলোভিন ও কোনরাড হাবিষ্ট। সোলোভিন ছিলেন রুমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পদার্থবিদ্যায় আগ্রহী। হাবিষ্ট বার্ন-এ এসেছিলেন উচ্চতর গণিত পড়ার জন্য। তিনজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। নিজেদের তাঁরা বলতেন 'ওলিম্পিয়ান আকাদেমি'। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা শুধু আর পাঠ দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে থাকল না, হয়ে উঠল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা। তিনজনের দেখা-সাক্ষাৎ হত কাফেতে কিংবা আইনস্টাইনের বাড়িতে, কখনো কখনো বহুদূর পর্যন্ত হাঁটাপথে। এমনও হয়েছে, কোনো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে চলতে কখন রাত ভোর হয়ে গিয়েছে তিনজনের কেউ-ই টের পাননি। লেখাপড়ার জগৎ থেকে দূরে থেকেও এমনি-ভাবে আইনস্টাইন পদার্থবিদ্যার আলোচনায় ও চর্চায় মেতে থাকতে পেরেছিলেন।

তিনজনে একসঙ্গে পড়তেন স্পিনোজা ও হিউমের দার্শনিক রচনাবলী; মাখ, আভেনেরিয়াস ও পিয়ার্সনের নতুন গ্রন্থ; অ্যাম্পিয়ারের বিজ্ঞানের দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ; হেল্‌মহোল্‌ৎস-এর রচনা; রীমান-এর জ্যামিতি-বিষয়ক বিখ্যাত ভাষণ; ক্লিফোর্ডের গণিত; পোঁয়াকারের বিজ্ঞান ও অন্য বহু রচনা। পড়তেন সোফো-ক্লিসের 'আন্তিগোনে', ডিকেন্সের 'খ্রীষ্টমাস ক্যারল্‌স', সারভান্‌টিসের 'ডন কুইক্‌সোট' ও বিশ্বের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনা।

কতকগুলো বই তিনজনেরই আলাদা আলাদা ভাবে পড়া ছিল।

তবুও তাঁরা একসঙ্গে পড়তে ও তা নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসতেন। মিলেভা না আসা পর্যন্ত তিনবন্ধুর রাতের খাওয়া একসঙ্গেই চলত। সাধারণত খেতেন সসেজ, চীজ, ফল এবং মধু সহ চা। দুই ছাত্রকে নিয়ে শিক্ষকতা তেমন আর হত না, মাইনে বাবদ পেতেন সামান্যই। আইনস্টাইন ঠাট্টা করে বলতেন, এর চেয়ে তিনি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাতেন তাহলেও হয়তো আরো বেশি আয় হত।

অলিম্পিয়ান আকাদেমি তিনবছর টিকে ছিল, তখন এই তিন যুবকের চেয়ে সুখী আর কেউ ছিল না। তিনজনই সারা জীবন অলিম্পিয়ান আকাদেমির আনন্দপূর্ণ তিনটি বছরের কথা স্মরণ করেছেন।

১৯৫৩ সালে আইনস্টাইন সোলোভিনকে লিখছেন ঃ

অমর অলিম্পিয়ান আকাদেমি,

তোমার সংক্ষিপ্ত জীবনকালে স্বচ্ছতায় ও যুক্তিতে তোমার ছিল শিশুর মতো আনন্দ। তোমার সদস্যরা তোমাকে প্রতিষ্ঠা করেছিল তোমার গুরুভার ও জাঁকালো জ্যেষ্ঠা ভগিনীদের নিয়ে মজা করার জন্য। আমরা যে কতখানি যথার্থ ছিলাম তা বহু বছরের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তোমার তিন সদস্য আগের মতোই অবিচলিত। তারা কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একাকীত্বের মধ্যে তাদের উদ্ভাসিত করে রেখেছে তোমার বিশুদ্ধ ও উজ্জীবনী আলো। কেননা তাদের সঙ্গে সঙ্গে অতিবর্ধিত লেটুসের মতো তুমি তো বৃদ্ধ হওনি।

তোমার উদ্দেশেই আমাদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য—শেষ অতি-আলোকপ্রাপ্ত নিশ্বাস পর্যন্ত!

তোমার একমাত্র পত্রলেখক সদস্য,
আ. আ. প্রিন্সটন, ৩.৪.৫৩

অলিম্পিয়ান আকাদেমির সঙ্গে তার গুরুভার ও জাঁকালো জ্যেষ্ঠা ভগিনীদের এই তুলনার মধ্যে একটা বিষণ্ণতার সুর আছে। অলিম্পিয়ান আকাদেমির পরে সারাটা জীবন আইনস্টাইনকে মিশতে হয়েছে পণ্ডিতদের সঙ্গে, তাই চুয়াত্তর বছর বয়সে পৌঁছে মনে পড়ছে

বার্ন্-এর সেই জীবনের উৎকণ্ঠাহীন স্বাধীনতা, মানসম্মানের প্রতি তরুণসুলভ তাচ্ছিল্য, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, স্বচ্ছতায় ও যুক্তিতে শিশুর মতো আনন্দলাভের আবহাওয়া।

বার্ন্-এ আইনস্টাইনের জীবনকে তুলনা করা হয় উল্‌স্‌থোর্প-এ নিউটনের জীবনের সঙ্গে। ১৬৬৫-৬৭ সালের প্লেগ মহামারীর সময়ে নিউটনকে কেমব্রিজ ছেড়ে গ্রামে মায়ের কাছে চলে যেতে হয়েছিল। এই সময়েই নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন অবকলন গণিত (differential calculus), সমাকলন গণিত (integral calculus), মহাকর্ষের সূত্র ও সূর্যের আলোর সাতরঙের সাতটি রশ্মিতে ভেঙে পড়া। আর বার্ন্-এ থাকার সময়ে আইনস্টাইন উদ্ভাবন করেন ব্রাউনীয় বিচলনের তত্ত্ব, ফোটোন তত্ত্ব এবং বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। আইনস্টাইন নিজেই বলেছেন,

> পেটেন্টের বিবৃতি তৈরি করাটা আশীর্বাদস্বরূপ ছিল, এর ফলে আমি পদার্থবিদ্যা নিয়ে ভাববার সুযোগ পেয়েছিলাম। উপরন্তু, আমার মতো মানুষের পক্ষে হাতেকলমে কাজ করার জীবিকাই মুক্তি। অ্যাকাডেমিক কর্মে নিযুক্ত তরুণ যুবক বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের দিকে যেতে বাধ্য হয় এবং একমাত্র যদি চরিত্রের দৃঢ়তা থাকে তবেই সে ভাসা-ভাসা বিশ্লেষণের লোভ প্রতিরোধ করতে পারে।

কিছুকাল পরে তিনজন অলিম্পিয়ানের সঙ্গে যোগ দিলেন ইতালীয় ইঞ্জিনিয়ার মিকেলাঞ্জেলো বেসো। আইনস্টাইনের চেয়ে ছ'বছরের বড়ো এই ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র রোম থেকে জুরিখ পলিটেকনিকে পড়তে এসেছিলেন। পরে আইনস্টাইনের চেষ্টাতেই বার্ন্-এর পেটেন্ট আপিসে চাকরি পেয়ে যান। কাজের শেষে আইনস্টাইন ও বেসো একসঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরতেন।

বেসো ছিলেন নানা বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানী, প্রায় এক জীবন্ত বিশ্বকোষের মতো। আইনস্টাইন তাঁকে সঙ্গী হিসেবে বিশেষ মূল্য দিতেন, নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন তাঁর সঙ্গে। পরে বলেছেন, নতুন কোনো ভাবনাচিন্তা মাথায় এলে তাকে যাচাই করে নেবার জন্য বেসোর চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি সারা ইউরোপে পাওয়া যেত না।

আর বেসোরও ছিল নতুন ভাবনাচিন্তাকে অনুধাবন করার ও তাকে চূড়ান্ত রূপ দেবার অসামান্য ক্ষমতা। বেসো নিজেই বলেছেন, 'ঈগলপাখি আইনস্টাইন চড়ুইপাখি আমাকে বহন করে নিয়ে যেত অনেক অনেক উঁচুতে। সেখানে গিয়ে এই চড়ুইপাখি ডানা ঝটপট করে আরো খানিকটা উঁচুতে উঠতে পারত।'

এই বেসোকে আইনস্টাইন অমর করে গিয়েছেন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে: 'পরিশেষে আমি উল্লেখ করতে চাই যে এই প্রশ্নগুলোর বিশদীকরণে আমার বন্ধু ও সহযোগী এম বেসো ছিলেন আমার অনুগত সহকারী এবং কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাবের জন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী।'

মাত্র এইটুকুই। নইলে বার্ন-এর পেটেন্ট অফিসে যে-অবস্থার মধ্যে তিনি কাজ করতেন তা সমসাময়িক যে-কোনো বিজ্ঞানীর কাছে এক অসম্ভব অবস্থা বলে মনে হতে বাধ্য। না ছিল কোনো বই, না কোনো পত্রপত্রিকা, না কোনো পদার্থবিজ্ঞানীর সঙ্গে যোগাযোগ (আইনস্টাইন নিজেই বলেছেন, ত্রিশবছর বয়সের আগে তিনি কোনো পদার্থবিজ্ঞানী দেখেননি), না কোনো সিনিয়র সহযোগীর পরিচালনা, না কোনো উৎসাহ। পদার্থবিজ্ঞানে আইনস্টাইন ছিলেন আত্ম-নির্ভর, সহযোগী হিসেবে কাউকে পাননি, বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেছেন নিজে নিজে। যা কিছু বিচার-বিবেচনা সবই ছিল তাঁর নিজস্ব।

আইনস্টাইনের কৃতিত্ব যে কতখানি তা বুঝতে হলে উনিশ শতক শেষ হবার সময় পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থা নিয়ে আগে কিছু আলোচনা তোলা দরকার।

সনাতন পদার্থবিদ্যা

পদার্থবিদ্যার জন্ম হয়েছিল আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রীসে। তার সাজানো-গোছানো একটি রূপ প্রথম পাওয়া গিয়েছিল অ্যারিস্টটল-এর পদার্থবিদ্যায়। তখন দেবদেবীকে পর্যন্ত কল্পনা করা হয়েছিল মানুষের চেহারায় এবং মানুষের বাসস্থান এই পৃথিবীকে মনে করা হত এই বিশ্বের কেন্দ্র। পৃথিবী স্থির এবং সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ এই পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তাই পৃথিবীর কোনো গতিশীল বস্তুর স্বাভাবিক লক্ষ্য হয় পৃথিবীর কেন্দ্র, ফলে সেই গতি হয়ে থাকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে। বস্তুর গঠন অনুযায়ী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিন্নতা ঘটে আর তারই ওপরে নির্ভর করে বস্তুর গতি। যেমন, বস্তু 'মাটি' হলে তার একরকম গতি, 'বাতাস' হলে অন্যরকম। অতএব যে-বস্তুর ভর যতো বেশি সে-বস্তু ততো তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে, কেননা ভর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যাওয়ার ঝোঁকও বেড়ে যায়। সাধারণ বুদ্ধি থেকেও ব্যাপারটা তাই। একটা পাথর যতো তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে, একটা পালক ততো তাড়াতাড়ি নয়। গ্রীক পদার্থবিজ্ঞানের দুর্বলতা ছিল এই যে হাতেকলমে পরীক্ষা করে কোনো কিছু যাচাই করা হত না (গ্রীক সমাজব্যবস্থায় হাতে-কলমে পরীক্ষা করাটা ছিল কায়িক শ্রমের সামিল, অতএব হীন কাজ)। হাতেকলমে পরীক্ষা করলে জানা যেত, অনুরূপ অবস্থায় একটি পাথর ও একটি পালক একই সঙ্গে মাটিতে পড়ে। কিন্তু বাতাসের মধ্যে দিয়ে যদি পড়তে হয় তাহলে বাতাসের ঘর্ষণে পালকের গতি অনেকখানি কমে যায়। তাই বাতাসের মধ্যে দিয়ে পড়বার সময়ে পাথর তাড়াতাড়ি পড়ে, পালক সে তুলনায় অনেক আস্তে।

গ্রীকরা মনে করত, যে-বস্তুজগৎকে আমরা দেখি তার উপাদান হচ্ছে মাটি, বাতাস, আগুন ও জল। এই চারটি ছাড়াও তারা একটি সারভাগ বা 'নির্যাসের' কল্পনা করত, যা দিয়ে স্বর্গীয় বস্তুগুলো গঠিত। এই বিশেষ প্রকৃতির হওয়ার জন্যই স্বর্গীয় বস্তুগুলোর কক্ষ হত কেবলমাত্র নিখুঁত বৃত্তাকার ও বেগ নিত্য। অর্থাৎ, স্বর্গীয়

বস্তুমাত্রই সমবেগে চক্রগতিশীল।

কিন্তু বিভিন্ন গ্রহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল এই ধারণার সঙ্গে ঠিক যেন মিলছে না। পৃথিবী থেকে তাকিয়ে তারাগুলোকে 'স্থির' মনে হয় (আসলে স্থির নয়, কিন্তু তারাগুলো এতই দূরের যে তাদের গতি বোঝা যায় না)। এই স্থির তারাগুলোকে নিশানা হিসেবে ধরে গ্রহগুলোর গতি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় সেই গতি বড়োই জটিল, বড়োই এলোমেলো। এমনকি মাঝে মাঝে গ্রহের পশ্চাদ্‌গতিও লক্ষ করা যায়। অথচ সমবেগের চক্রগতির নীতি অবশ্যই বজায় থাকা চাই। অতএব গ্রহের গতিকে ব্যাখ্যা করতে হল চক্রের মধ্যে চক্র ইত্যাদি জটিল বিন্যাসের সাহায্য নিয়ে। এই ব্যাখ্যাকে বিশদ একটি রূপ দিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি। ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বের সম্পূর্ণ কাঠামোটি সবিস্তারে উপস্থিত করলেন তিনি তাঁর 'অ্যালম্যাজেস্ট' (শ্রেষ্ঠতম) বইয়ে। পনেরো-শো বছর ধরে টলেমির বিশ্বতত্ত্বই একমাত্র গ্রাহ্য ছিল।

জ্যোর্তিবিজ্ঞানে তারপরে বড়োরকমের অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন পোল্যাণ্ডের ধর্মযাজক জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাস। কোপারনিকাস আবিষ্কার করলেন, যদি ধরে নেওয়া হয় যে সূর্য স্থির আর গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তাহলে গ্রহগুলোর গতি অনেক সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। গ্রীকদের মতো কোপারনিকাসও বিশ্বাস করতেন যে গ্রহগুলোর গতি হওয়া চাই সমান বেগের ও চক্রাকার। কিন্তু সূর্য-কেন্দ্রিক একটি কাঠামো খাড়া করে তিনি জটিলতাগুলোকে অনেক কমিয়ে ফেলতে পারলেন।

তারপরে এলেন কেপলার, আরও পঞ্চাশবছর পরে। সমবেগসম্পন্ন চক্রবেগের ধারণা চিরকালের মতো দূর করলেন তিনি। মুরুব্বি হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহেকে। টাইকো ব্রাহের সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে কেপ্‌লার দেখালেন, মঙ্গলগ্রহের কক্ষ যদি উপবৃত্তাকার হয়, আর সূর্য যদি থাকে এই উপগ্রহের একটি ফোকাসে তাহলেই মঙ্গলগ্রহের গতি সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। গ্রহের কক্ষকে উপবৃত্তাকার ভাবতে পারাটাই ছিল বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার ইতিহাসে বিরাট এক

মুক্তিসূচক পদক্ষেপ। সেই পদক্ষেপটি সুনিশ্চিতভাবে ঘটালেন কেপ্‌লার। তবুও মনে রাখা দরকার যে কেপ্‌লারের এই ফললাভ মূলত পর্যবেক্ষণগত। এ থেকে কোনো কিছু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। যেমন, গ্রহগুলোর কক্ষ কেন উপবৃত্তাকার, কোনো একটি প্রক্ষিপ্ত বস্তুর কক্ষ কেন অন্যরকম, তার হেতু কেপ্‌লারের সূত্র থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। কেপ্‌লার সম্পর্কে এ কথাটি মনে রাখলে, একটু পরে আমরা যখন নিউটন নিয়ে আলোচনা তুলব, তখন বুঝতে পারব নিউটনের মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব কতখানি।

তারপরে যাঁর নাম করতে হয় তিনি গ্যালিলিও। বিজ্ঞানে গ্যালিলিওর অবদান প্রচুর, কিন্তু আমরা মাত্র দুটি বিষয় তুলে ধরব। একটি হচ্ছে তাঁর এই অনুমান যে বাতাসের ঘর্ষণজনিত বাধা না থাকলে সকল বস্তু একই ত্বরণ নিয়ে মাটিতে পড়ে (একটি বায়ুশূন্য নলের মধ্যে দিয়ে একটি পাথর ও একটি পালক মাটিতে পড়তে দিলে দেখা যাবে তারা একই ত্বরণ নিয়ে একই সময়ে মাটিতে পড়েছে। গ্যালিলিও ভালো বায়ুশূন্য অবস্থা পাননি তাই তিনি কথাটা প্রমাণ করার জন্য সরাসরি কোনো পরীক্ষাকার্য করতে পারেননি। গল্প আছে, তিনি নাকি পিসার হেলানো গম্বুজ থেকে একটি হালকা ও একটি ভারী গোলা মাটিতে ফেলেছিলেন। যদি ফেলেও থাকেন তাহলে সম্ভবত সেই দুটি গোলা একসঙ্গে মাটিতে পড়েনি)। গ্যালিলিওর অন্য যে-বিষয়টি আমরা তুলে ধরতে চাই তা হচ্ছে গতিশীল অবস্থার জাড্য (inertia)*। আরিস্টটলের পদার্থবিদ্যায় বলা হয়েছে, বস্তুকে গতিশীল রাখতে হলে অবিরাম বলপ্রয়োগ করে চলতে হয়। এই কথার সঙ্গে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার মিল আছে। আমরা দেখি, টান বা ঠেলা থাকলে তবেই মাটির ওপর দিয়ে কোনো বস্তু চলে। আবার এও দেখি, চলন্ত

*ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ইনার্শিয়া, বাংলা পরিভাষায় তার নাম জাড্য বা জড়ত্ব। বস্তু যদি স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে তাহলে সেই অবস্থা থেকে গতিশীল অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে বস্তুর প্রতিরোধ থাকে, কিংবা বস্তু যদি আগে থেকেই গতিশীল থাকে তাহলে তার বেগ বা দিক পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে বস্তুর প্রতিরোধ থাকে। এই প্রতিরোধকেই বলা হয় জাড্য বা জড়ত্ব। অর্থাৎ, বাধা না থাকলে বস্তু থাকে হয় স্থিতিশীল অবস্থায় আর নয়তো একমুখী অবিচল গতিশীল অবস্থায়।

বস্তুকে থামাতে হলে বা অন্যদিকে ফেরাতেহলে বলপ্রয়োগকরতে হয়। গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে গ্যালিলিও এমন একটি অবস্থা কল্পনা করলেন যেখানে ঘর্ষণজনিত বাধা নেই। অর্থাৎ বস্তুটি চলছে বরফের মতো অতি মসৃণ কোনো কিছুর ওপর দিয়ে। তাহলে দেখা যাবে, বস্তুটি অনন্তকাল ধরেই চলছে। তাকে থামাতে হলে বা ফেরাতে হলে বলপ্রয়োগ করা চাই। গ্যালিলিও বুঝতে পারলেন, গতির এই যে জাড্য তার ভূমিকা থেকে গিয়েছে আমাদের দেখার জগতের সকল গতির মধ্যেই। কথাটা বোঝাবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। একটি বস্তুকে উঁচু থেকে মাটিতে ফেলা হল। বস্তুটি মাটিতে পড়ে সিধে পথে। বস্তুটিকে মাটিতে ফেলার আগে ভূমির সমান্তরালে ধাক্কা দেওয়া হল। এবারে বস্তুটি মাটিতে পড়ে অধিবৃত্তাকার পথে। গ্যালিলিও বিশ্লেষণ করে দেখালেন, অধিবৃত্তাকার গতির রয়েছে দুটি উপাংশ (component)। একটি উপাংশে বলের ক্রিয়া সিধে নিচের দিকে। অপর উপাংশটি জাড্যের-সিধে নিচের দিকে কোনো বলের ক্রিয়া যদি না থাকে তাহলে ভূমির সমান্তরালে সিধে সরল রেখায় অনন্তকাল ধরে বস্তুর গতিশীলতা বজায় থাকে। বিশেষ করে তিনি একথাটি বুঝলেন যে বস্তুর স্থির অবস্থা ও সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল অবস্থা এদিক থেকে অভিন্ন যে কোনো অবস্থাতেই কার্যকর বলের ক্রিয়া নেই। বলের ক্রিয়া ঘটে গতির অবস্থায় পরিবর্তন ঘটাবার জন্য (এখনকার ভাষায় ত্বরণ ঘটাবার জন্য)।

গ্যালিলিও বললেন, বলবিদ্যার দিক থেকে একটি স্থির বস্তু ও একটি সমবেগে গতিশীল বস্তুর মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই।

বলবিদ্যার নিয়ম যদি একটি ব্যবস্থায় প্রযোজ্য হয় তাহলে সেই ব্যবস্থার আপেক্ষিকে সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল অন্য কোনো ব্যবস্থাতেও প্রযোজ্য। এই হচ্ছে গ্যালিলিওর আপেক্ষিতার নিয়ম (Galileo's relativity principle)।

দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে সুবিধে হবে। একটি জাহাজ স্থির, আরেকটি জাহাজ সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল এবং সমুদ্র এতই শান্ত যে জাহাজে বিন্দুমাত্র দুলুনি নেই। এখন দুটি ছেলে যদি বল খেলে

তাহলে স্থির জাহাজের ডেকেও যেমন খেলবে, চলন্ত জাহাজের ডেকে হুবহু তেমনটিই খেলবে। ছেলেদুটি কিছুতেই বলতে পারবে না তাদের খেলা চলেছে স্থির জাহাজে না চলন্ত জাহাজে। কোনো একটি জাহাজে কোনো রকম পরীক্ষাকার্য চালিয়ে বলা সম্ভব নয় সেই জাহাজটি স্থির না গতিশীল। বলবিদ্যার নিয়ম দুই ব্যবস্থাতেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

এমনিভাবে, গতি ও বলের সম্পর্কের বিশ্লেষণে আরিস্টটল যে ভুল করেছিলেন, গ্যালিলিও তার সংশোধন করলেন।

গ্যালিলিওর সময়েই দূরবীন আবিষ্কৃত হয়। ১৬০৯ সালে গ্যালিলিওই প্রথম একটি দূরবীন দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন। পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে তার সুনিশ্চিত প্রমাণ পান। তিনি নিঃসন্দেহ হন যে কোপারনিকাসের তত্ত্ব সঠিক। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক গির্জার পক্ষে একথা হজম করা শক্ত ছিল। গির্জার কর্তারা গ্যালিলিওর বিচার করলেন (২২ জুন ১৬৩৩) এবং তাঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিলেন যে তিনি ভুল কথা বলেছেন এবং তার-পরেও তাঁকে বন্দী করে রাখলেন। গ্যালিলিওর আগে কোপার-নিকাস (তাঁর তত্ত্বসম্বলিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৫৪৩ সালে) এবং কেপ্‌লার (গ্রহের গতি ও কক্ষ সম্পর্কিত তাঁর তিনটি সূত্র প্রকাশিত হয় ১৬০৯ থেকে ১৬১৯ সালের মধ্যে) গির্জার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছিলেন সম্ভবত এই কারণে যে তাঁদের কথায় তেমন আলোড়ন ওঠেনি। কিন্তু আরও অনেক আগে (১৬০০ সালে) ইতালীয় দার্শনিক জিওর্দানো ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, কেননা তিনি বলেছিলেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

গ্যালিলিওর মৃত্যু ১৬৪২ সালে। এই বছরেই নিউটনের জন্ম।

পদার্থবিজ্ঞানে নিউটন এক বিরাট পুরুষ। তাঁর গুরুত্ব যে কতখানি তা বলে শেষ করা যায় না। কেপ্‌লার ও গ্যালিলিওকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর 'প্রিন্‌সিপিয়া'* প্রকাশিত হয়

---

* গ্রন্থটির সম্পূর্ণ নাম *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, বৈজ্ঞানিক লেখার তৎকালীন ভাষা ল্যাটিনে লিখিত। 'প্রিন্‌সিপিয়া' নামে পরিচিত এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটিকে বাংলায় বলা যেতে পারে—'বিজ্ঞানের গাণিতিক তত্ত্ব'।

১৬৮৬ সালে। তখন থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত তাঁর বলবিদ্যার তত্ত্ব নিয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন ওঠেনি।

গ্যালিলিও বিশ্লেষণ করেছিলেন কতকগুলো সরল গতি। নিউটন সেই বিশ্লেষণকে একটা পরিমাপের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন ও একটা সাধারণ রূপ দিয়েছিলেন। কক্ষের গতি নিরূপণ করেছিলেন সমগ্রভাবে নয়, কক্ষের বিন্দু থেকে বিন্দুতে গতির ধরন-ধারন বিবেচনা করে। একই সঙ্গে অবকলন গতির সাহায্যে নির্ধারণ করেছিলেন কক্ষ-বরাবর দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের হার। তা থেকে ধারণা করতে পারলেন প্রথমত কক্ষের যে-কোনো বিন্দুতে বেগ সম্পর্কে, দ্বিতীয়ত কক্ষের যে-কোনো বিন্দুতে বেগের পরিবর্তনের হার সম্পর্কে। বেগের পরিবর্তনের হার মানেই ত্বরণ। কক্ষ পরিক্রমারত বস্তুটির ওপরে যে-কোনো বল ক্রিয়াশীল হোক না কেন, তার ফলে সৃষ্টি হয় এই ত্বরণ। এ থেকে নিউটন বল ও ত্বরণ সম্পর্কিত একটি সমীকরণে পৌঁছতে পারলেন।

তারপরে নিউটন খাড়া করলেন সেই গাণিতিক ভাষা যা দিয়ে মহাকর্ষের বল প্রকাশ করা চলে। বললেন, বিশ্বের প্রতিটি বস্তু অন্য প্রতিটি বস্তুকে আকর্ষণ করে। আকর্ষণের বল বাড়ে সেই দুই বস্তুর ভরের গুণফল অনুসারে, কমে সেই দুই বস্তুর দূরত্বের বর্গ অনুসারে। এই সূত্র থেকে বলের পরিমাপ করা যেতেপারে এবং সেটিকে বসানো যেতে পারে বলের সঙ্গে ত্বরণের সম্পর্কের সমীকরণে। নিউটন এই সমীকরণটির সমাধান করেছিলেন সমাকলন গণিতের সাহায্যে।

এই সমাধান থেকে নিউটন দেখালেন, একটি কণার মহাকর্ষগত প্রভাবে অপর একটি কণা যদি গতিশীল হয়—যেমন হয়ে থাকে সূর্যের মহাকর্ষগত প্রভাবে গ্রহ—তাহলে তার গতিপথের আকার দাঁড়ায় উপবৃত্ত বা অধিবৃত্ত বা পরাবৃত্তের মতো। সঠিকভাবে কোন আকারটি হবে তা নির্ভর করে শুরুর বেগের ওপরে (পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করার সময়েও একটি শুরুর বেগ দিতে হয় এবং সেই বেগের ওপরেই নির্ভর করে কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষের আকার কেমন হবে)।

এবারে, নিউটনীয় বলবিদ্যা থেকে দেশ ও কাল সম্পর্কে কী ধারণা করতে হয় তা দেখা দরকার।

দেশ বা স্পেস, কাল বা সময়, দেশ-কাল বলতে আমরা বুঝব স্পেস ও সময় (ভারত একটি দেশ এই অর্থে দেশ নয়)। মহাশূন্য বলতে যা বুঝি, যার মধ্যে যেন রাখা হয়েছে সকল গ্রহ, সকল তারা, সকল তারাজগৎ, সেই ব্যাপ্তি বা প্রসারকেই বলা হচ্ছে দেশ বা স্পেস। মহাশূন্য বললে মনে হতে পারে সেখানে কিছুই নেই। কথাটা ঠিক নয়। দুই গ্রহ বা দুই তারার মাঝখানে রয়েছে যে বিশাল ব্যবধান তা শূন্য নয় —সেখানেও আছে সামান্য পরিমাণ বস্তু ও প্রচুর পরিমাণ বিকিরণ। যাই হোক, স্পেস সম্পর্কে একটা ধারণা করার জন্য বলা যেতে পারে, মহাবিশ্বের সকল বস্তু সরিয়ে নিলে যা থাকে তাই হচ্ছে স্পেস। তাই বলে কথাটা এই নয় যে বস্তু থাকলে স্পেস থাকে না! বস্তু ও স্পেস —দুয়ে মিলে মহাবিশ্ব।

এই স্পেসকে ধরার চেষ্টা সেই প্রাচীন গ্রীক আমল থেকেই বিজ্ঞানীরা করে আসছেন। গ্রীকদের পরে নিউটন। নিউটনের পরে আইনস্টাইন। বিষয়টি তাই ভাল করে বোঝা দরকার।

প্রাচীন গ্রীক জ্যামিতিকাররা ব্যাপক অনুসন্ধান চলিয়েছিলেন পৃথিবীর উপরিতলের কাছের স্পেসে এবং সেই স্পেসকে মাপজোখের মধ্যে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ ও উপপাদ্যগুলিতে এই মাপজোখের একটি চেহারা পাওয়া যায়। গ্রীকদের এই অনুসন্ধান ছিল নিশ্চল ক্ষেত্রে বা জগতের স্থিতিবিশিষ্ট লক্ষণের মধ্যে। সচল ক্ষেত্রে বা জগতের গতিবিশিষ্ট লক্ষণ নিয়েও অনুসন্ধান ও মাপজোখ চলতে পারত। এ-কাজটি করেন নিউটন সতেরো শতকে। তিনি উপস্থিত করেছেন বস্তুর গতি সম্পর্কিত তত্ত্ব। গতিশীল বস্তু একটি পথ দিয়ে চলে, সেই পথটি থাকে স্পেসে, একটি কালে বা সময়ে। নিউটনের তত্ত্বে কতকগুলো সূত্রের মধ্যে স্পেস ও সময় যুক্ত হয়েছে।

স্পেসের যে মডেলটি নিউটন প্রস্তাব করেন তা হচ্ছে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বিশিষ্ট একটি পদার্থের। বস্তু চলে এই পদার্থের মধ্যে দিয়ে, অনেকটা

জলের মধ্যে সাঁতার কেটে চলা মাছের মতো। এই যদি স্পেস হয় তাহলে, সহজেই বোঝা যায়, এই স্পেসে প্রতিটি বস্তুর থাকে নিজস্ব অবস্থান ও বিন্যাস এবং দুই ঘটনার মধ্যে দূরত্ব হয় সুনির্দিষ্ট—এমনকি সেই দুই ঘটনা যদি বিভিন্ন সময়ে ঘটে, তবুও। যেমন, টেবিলের ওপরে একটি বই রাখা হল। তখন বইটির অস্তিত্ব প্রকাশ পেল স্পেসের মধ্যে বিশেষ খানিকটা জায়গা জুড়ে, বিশেষ একটা আকার নিয়ে। এমনটি যে হল সেটি এই বইটিরই নিজস্ব। আবার, ধরা যাক, কলকাতার শহীদ মিনারে একটি জনসভা হল। আর দুর্গাপুরের দেশবন্ধু ময়দানে একটি যাত্রানুষ্ঠান হল। দুটি পৃথক ঘটনা, ঘটেছে পৃথক পৃথক সময়ে—তবুও দুই ঘটনার মধ্যে দূরত্বে কোনো হবফের হবার নয়। কিংবা ধরা যাক, আমি যাচ্ছি কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে —কখনো কি এমন ঘটে যে কলকাতা কলকাতাতে নেই, বা, কৃষ্ণনগর যেখানে থাকার সেখান থেকে সরে গিয়েছে?

এই যে একই সময়ে হওয়া বা ঘটা, যাকে বলতে পারি এক-কালীনতা বা যুগপত্তা (simultaneity), তারই ওপরে নিউটন অনেকখানি নির্ভর করলেন সময় সম্পর্কে তাঁর ধারণা গড়ে তুলতে গিয়ে। এই মডেলে সময় সার্বিক (universal) ও পরম (absolute)। সময় যদি সার্বিক হয়, অর্থাৎ, সর্বত্রই একরকম হয়, তবেই এমন ধারণা করা চলে যে স্পেসের পৃথক পৃথক বিন্দুতে ঘটা সত্ত্বেও দুই বা ততোধিক ঘটনা একই সময়ে ঘটছে। যেমন, কলকাতার 'এই মুহূর্ত', সারা বিশ্বের 'এই মুহূর্ত' (যদিও স্থানীয় ঘড়িতে কলকাতায় যখন বেলা বারোটা, বার্লিনে তখন ভোর সাতটা)। তার মানে, ধরে নিতে হয়, নিউটনের ধারণায় স্পেস ও সময় সার্বিক ও পরম—একটি স্থির রঙ্গভূমি বা কাঠামো। নিহিত কোনো বস্তুর আচরণে এই স্পেসে ও সময়ে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

এবারে ধরা যাক, স্পেস ও সময়ের এই নিউটনীয় মডেলে স্পেসের মধ্যে দিয়ে কোনো বস্তু গতিশীল হয়েছে। সেই বস্তুর বেগ (velocity) কত? শুনে মনে হতে পারে প্রশ্নটা খুবই মামুলি। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় 'আপনি কত বেগে চলেছেন?' তাহলে এই প্রশ্নের একটা যুক্তিসঙ্গত জবাব নিশ্চয়ই আশা করা যেতে

পারে। আসলে কিন্তু তা নয়। ধরা যাক আমি আমার পড়ার ঘরে চেয়ারে বসে আছি। আমি ভাবছি আমার কোনো নড়াচড়া নেই, আমি স্থির। তাই কি? পৃথিবী নিজের অক্ষে পাক খাচ্ছে ও নিজের কক্ষে সূর্যের চারিদকে ঘুরছে। এই দুই গতি আমিও পেয়েছি। আরো আছে। সৌরমণ্ডল সমেত আমাদের সূর্য ছায়াপথ গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরছে। গোটা গ্যালাক্সিটি প্রচণ্ড বেগে অন্য সমস্ত গ্যালাক্সি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই সমস্ত গতি আমারও। তাহলে, যখন আমি ভাবছি আমি স্থির তখনো কিন্তু কত-সব গতি আমি লাভ করেছি। মহাবিশ্বে কোনো কিছুই স্থির নয়।

কিন্তু কই, এতগুলো গতি আমার মধ্যে রয়েছে তবুও আমি নিজে তো কিছু টের পাচ্ছি না। এখানেই প্রশ্ন ওঠে, কোন্ গতি টের পাওয়া যায়? বোয়িং বিমানের যাত্রীরা জানেন, মেঘের ওপরে উঠে বিমান যখন ঘণ্টায় আটশো কিলোমিটার বেগে চলেছে তখনো কিন্তু জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় না বিমানটি চলছে। কেননা আশেপাশে এমন কিছু নেই যা পিছনদিকে সরে যায়। আর বোয়িং বিমানে ঝাঁকুনি বা দুলুনি নেই, তাই সত্যিসত্যিই মনে হয় বিমানটি যেন শূন্যে স্থির। অন্য আরেক ধরনের অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকেরই হয়ে থাকবে। বিপরীতগামী দুই ট্রেন স্টেশনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। অন্য ট্রেনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক ট্রেনের এক যাত্রীর মনে হল তার ট্রেন আস্তে আস্তে স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে, ও হরি, স্টেশন ছেড়ে চলে গেল পাশের ট্রেন, তার ট্রেন যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে একটি কথা বেরিয়ে আসে। গতি তখনই বোঝা যায় যখন সেই গতি সমবেগের নয়। যেমন, বোয়িং বিমানের যাত্রী অনায়াসেই বিমানের গতি বুঝতে পারতেন যদি বিমানে ঝাঁকুনি থাকত বা বিমান টাল খেত বা বাঁক নিত, ইত্যাদি। ট্রেন যদি ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করে তাহলে ট্রেনের চলাটা ঠিকই বোঝা যায়। চলন্ত ট্রেনে আচমকা ব্রেক কষলেও একই রকম ঝাঁকুনি টের পেতে হয়। তাহলে কথাটা এইভাবে বলা যায়: সমবেগের

গতি (বেগ একই রকম ও একই দিকে) বোঝা যায় না ; কিন্তু গতি যদি হয় ত্বরণযুক্ত, অর্থাৎ গতির পরিবর্তন হচ্ছে (হয় বাড়ছে বা কমছে বা দিক বদলাচ্ছে) তাহলে সেই গতি সহজেই বোঝা যায়।

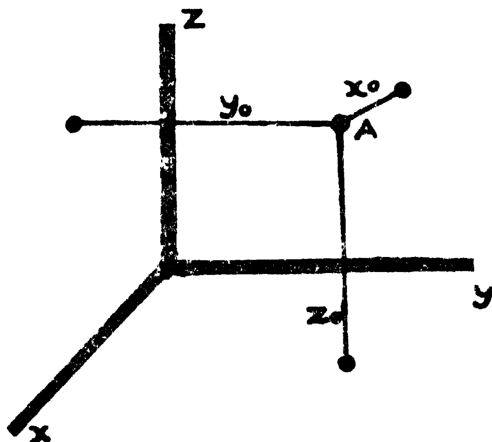
নিউটন তাই তাঁর গতির সূত্র এমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন যাতে নির্ভরতা থাকে গতিশীল বস্তুর বেগের ওপরে নয়, একমাত্র তার ত্বরণের ওপরে। এই কথার মধ্যে এই বক্তব্যটি থেকে যাচ্ছে : আলাদা আলাদা গতিতে ও সমবেগে যদি দুটি বস্তু চলে তাহলে কোনোরকম পরীক্ষাকার্য করে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় ব্যাপারটা কী—একটি চলছে ও অপরটি থেমে আছে, না দুই-ই চলছে। এক্ষেত্রে অর্থপূর্ণভাবে মাত্র এইটুকুই বলা চলে : দুই-ই পরস্পরের আপেক্ষিকে (relative) সমবেগে গতিশীল। গতিশীলতার অবস্থাকে সাধারণত একটি নির্দেশ-ফ্রেম (reference frame) হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ, আমরা ভেবে নিতে পারি, প্রত্যেক নির্দেশ-ফ্রেমের সঙ্গে একজন কাল্পনিক দর্শক যুক্ত। তাহলে নিউটনের সূত্র অনুসারে অবশ্যই বলতে হয়, নিশ্চল নির্দেশ-ফ্রেমের অস্তিত্ব নেই। নিউটনীয় বলবিদ্যায় সমবেগসম্পন্ন সকল গতিই আপেক্ষিক। আমরা যদি বলি, গাড়িটি ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে চলছে, তাহলে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে রাস্তার আপেক্ষিকে গাড়ির গতি ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার।

মনে করা যাক, বস্তুর গতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা এমন একটি নির্দেশ-ফ্রেম পেয়েছি যেখানে নিউটনের সূত্র খাটছে। এই নির্দেশ ফ্রেমকে বলা হয় জড়ত্বীয় তন্ত্র (inertial system)।

এখানে অন্য একটি বিষয় সম্পর্কে বলে নেওয়া দরকার। বিষয়টি হচ্ছে কার্টেজীয় স্থানাঙ্ক (Cartesian co-ordinates)। স্পেসে যদি একটি বিন্দুর অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে হয় তাহলে আমরা কী করি ? পরস্পরের লম্ব তিনটি সমতল কল্পনা করে নিই। সেই বিন্দু থেকে প্রত্যেকটি সমতলের ওপরে লম্ব টানি। তিনটি লম্বের দৈর্ঘ্য যদি জানা থাকে তাহলে সেই বিন্দুটি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এই হচ্ছে কার্টেজীয় নির্দেশতন্ত্র। তিনটি দৈর্ঘ্যের মাপ হচ্ছে তিনটি স্থানাঙ্ক। একটিকে বলা হয় x, আরেকটিকে y, অন্য আরেকটিকে z। এইভাবে

লেখা হয়: (x, y, z)। স্পেসের মধ্যে যে কোনো বিন্দুর হদিশ নেবার উপায় এই তিনটি স্থানাঙ্ক (x, y, z)। এই সঙ্গে সময়ের হদিশও অবশ্যই নিতে হয়, সেটি লেখা হয় t অক্ষর দিয়ে।

মনে করা যাক একটি নির্দেশতন্ত্রে স্থানাঙ্কগুলোর মাপ আমরা



কার্টেজীয় নির্দেশতন্ত্র। এই নির্দেশতন্ত্রের সাহায্যে স্পেসের যে-কোনো বিন্দুর অবস্থান নির্দিষ্ট করা যায়। এ জন্য কল্পনা করা চাই পরস্পরের লম্ব তিনটি সমতল, ছবিতে X Y Z। এই তিনটি সমতলের ওপরে A বিন্দু থেকে তিনটি লম্ব টানা হল—x_0, y_0 z_0। এই হচ্ছে তিনটি সমতল থেকে A বিন্দুর সবচেয়ে কাছের দূরত্ব। এগুলোকে বলা হয় A বিন্দুর স্থানাঙ্ক। তার মানে, তিনটি স্থানাঙ্ক যদি জানা থাকে তাহলে স্পেসের যে-কোনো বিন্দুর অবস্থান নির্দিষ্ট করা চলে। এ থেকে আরো বোঝা যাচ্ছে, স্পেস তিনি মাত্রার হয়ে থাকে।

জানি। এখন এমন কোনো নিয়ম যদি থাকে যার সাহায্যে সরল-রেখায় সমবেগে গতিশীল অপর একটি নির্দেশতন্ত্রে স্থানাঙ্কগুলো জানা যায় তাহলে তাকে বলা হয় গ্যালিলিও রূপান্তরণ (Galileo transformation)।

কথাটা বলবিদ্যার সমস্ত নিয়ম সম্পর্কে বলা চলে। বলবিদ্যার নিয়মগুলো যদি একটি নির্দেশতন্ত্রে খাটে তাহলে সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল অন্য নির্দেশতন্ত্রেও খাটবে। এই অন্য নির্দেশতন্ত্রটিও কি

একটি জড়ত্বীয় তন্ত্র ? অবশ্যই তাই।

তাহলে একটি সাধারণ নিয়ম পাওয়া যাচ্ছে। একটি জড়ত্বীয় তন্ত্র রয়েছে, বলা যাকে O। এখন এই O-এর আপেক্ষিকে সরল রেখায় সমবেগে গতিশীল একটি নির্দেশ-ফ্রেম যদি পাওয়া যায় (বলা যাক O´), তাহলে সেটিও জড়ত্বীয় তন্ত্র। অর্থাৎ O ও O´ দুই-ই জড়ত্বীয় তন্ত্র। বলবিদ্যার নিয়মগুলো দুই জড়ত্বীয় তন্ত্রেই খাটছে। একটি তন্ত্রে নির্দেশাঙ্কগুলো পাওয়া গেলে অন্য তন্ত্রেও পাওয়া সম্ভব। তার মানে, কথাটা এইভাবেও বলা চলে: গ্যালিলিও রূপান্তরণে বলবিদ্যার নিয়ম অপরিবর্তিত থাকে।

তাহলে O জড়ত্বীয় তন্ত্রে বলবিদ্যার যা নিয়ম, O´ জড়ত্বীয় তন্ত্রেও বলবিদ্যার সেই একই নিয়ম। শুধু এই একটি কেন, এমনি জড়ত্বীয় তন্ত্র হতে পারে অসংখ্য। সকল জড়ত্বীয় তন্ত্রে বলবিদ্যার একই নিয়ম। এই হচ্ছে গ্যালিলিওর আপেক্ষিকতার নিয়ম—নিউটনের বলবিদ্যার মৌল তত্ত্ব। কথাটা আমরা আগেও বলেছি, খানিকটা গণিতের ভাষায় আরো একবার বলে নেওয়া গেল। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার সময়ে, নির্দেশ-ফ্রেম (frame of reference), জড়ত্বীয় তন্ত্র (inertial system) ও গ্যালিলিও রূপান্তরণ (Galileo transformation), এই কথাগুলো ব্যবহার করতে হবে। কথাগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে সেই আলোচনা বোঝা যাবে না।

অন্যদিকে, নিউটনের তত্ত্বে ত্বরণযুক্ত গতি হচ্ছে অনপেক্ষ (absolute)। সমবেগের বেলায় আমরা দেখেছি, এমন কোনো পরীক্ষাকার্য করা সম্ভব নয়, যার সাহায্যে বলা চলে গতিশীলতা আছে কি নেই, শুধু বলা চলে আপেক্ষিক গতি আছে কি নেই। কিন্তু ত্বরণযুক্ত গতির বেলায় এমন পরীক্ষাকার্য করা চলে যার সাহায্যে ত্বরণযুক্ত গতির বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। তার জন্য বাইরের কোনো কিছুর ওপরে নির্ভর করতে হয় না—নির্দেশ-ফ্রেমের ভিতরেই পরীক্ষাকার্য করা চলে। প্রশ্ন যদি হয়, 'এই নির্দেশ-ফ্রেম কি ত্বরণযুক্ত (পরম স্পেসের মধ্যে দিয়ে)?' তাহলে তার জবাব

অবশ্যই দেওয়া চলে। সেই বোয়িং বিমানের যাত্রীর কথা আরেক বার ভাবা যাক। তার সামনে সমতল টেবিলের ওপরে একটি ডিম রয়েছে। বিমান যতোক্ষণ সমবেগে চলছে ততোক্ষণ এই ডিমের কোনো নড়নচড়ন নেই। কিন্তু বিমানের গতি যদি বাড়ে বা কমে, বিমান যদি কাৎ হয় বা দিক বদলায় তাহলে ডিমটি গড়িয়ে নিচে পড়বে ও ভাঙবে। ত্বরণ ডিম ভাঙে, সমবেগ ভাঙে না।

নিউটন বললেন, কারণ থাকলে তবেই গতি ত্বরণযুক্ত হয়। এই কারণকে তিনি বললেন বল (force)। একটি পাথর মাটিতে পড়ে, তার কারণ পৃথিবীর অভিকর্ষের বল পাথরকে মাটির দিকে ত্বরণযুক্ত করে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তার কারণ সূর্যের মহাকর্ষের বল পৃথিবীকে টানছে। সূর্যের মহাকর্ষের টান না থাকলে পৃথিবী সিধে সরল রেখায় সমবেগে ছুটত।

নিউটনের গতিবিষয়ক দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, কোনো বস্তুর ত্বরণ আর তার ওপরে ক্রিয়াশীল বল (বল থাকতেই হবে, নইলে ত্বরণ হয় না) সরাসরি সমানুপাতিক। তার মানে, বল ও ত্বরণের অনুপাতটি ধ্রুবক। এই ধ্রুবককে বলা হয় জড়ত্বীয় ভর (inertial mass)। সমীকরণের আকারে এইভাবে লেখা চলে :

বল = জড়ত্বীয় ভর × ত্বরণ

এই সমীকরণ থেকে বোঝা যায়, বল না থাকলে ত্বরণও নেই। বস্তুটি তখন সমবেগে চলতে থাকে। দ্বিতীয় সূত্রে একমাত্র বিবেচনার বিষয় গতির পরিবর্তন—অর্থাৎ, ত্বরণ। সমীকরণ থেকে আরো একটি বিষয় জানা যায়—ক্রিয়াশীল বল যদি একই থাকে তাহলে বস্তুর ভর যতো বেশি তাকে ত্বরণযুক্ত করা ততো শক্ত (যেমন, একটি সাইকেল ঠেলার চেয়ে একটি মোটরগাড়ি ঠেলা অনেক বেশি শক্ত)।

নিউটনের গতিবিষয়ক প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে. কোনো বল ক্রিয়াশীল না থাকলে স্থির বস্তু স্থির অবস্থায় থেকে যায়, সচল বস্তু সমবেগে সরলরেখায় চলতে থাকে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আপাতবিচারে মনে হয়, সচল বস্তুর সমবেগে সরলরেখায় চলতে থাকার কথা ঠিক নয়। মনে করা যাক, একটি অনুভূমিক (horizontal) রাস্তায় একটি মোটরগাড়ি ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার

বেগে চলছে। এই মোটরগাড়ি চালু রাখতে হলে একটি চালিকা-শক্তি চাই—এক্ষেত্রে একটি পেট্রোল-ইঞ্জিন। ইঞ্জিন বন্ধ হলে মোটরগাড়ির চলাও বন্ধ। এতে কি নিউটনের সূত্র অপ্রমাণিত হচ্ছে না? না। কারণ, ইঞ্জিন বন্ধ থাকলে মোটরগাড়ির চলা বন্ধ হচ্ছে রাস্তার সঙ্গে চাকার ঘর্ষণ থাকার জন্য, বাতাসের বাধা থাকার জন্য। এই দুটো না থাকলে বিনা ইঞ্জিনেই মোটরগাড়ি চলত। পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘুরেই চলেছে, থেমে যাচ্ছে না, তার কারণ পৃথিবীর চলাটা শূন্যস্থান দিয়ে—সেখানে কোনো ঘর্ষণ নেই বা বাধা নেই। মহাকাশে যে-সব ব্যোমযান পাঠানো হচ্ছে তাদের প্রারম্ভিক ঠেলাটা দেওয়া হয় রকেটের সাহায্যে, কিন্তু মহাশূন্যে পৌঁছবার পরে তারা চলতেই থাকে—ঘর্ষণ বা বাধা না থাকার জন্য তারা কখনো থামে না। নির্ধারিত মাত্রায় প্রারম্ভিক ঠেলা দেবার পরে ব্যোমযানকে চালু রাখার জন্য আর কখনো রকেট চালু করতে হয় না।

নিউটনের বলবিদ্যার তত্ত্বের একটি অসাধারণ সাফল্য ছিল এই যে মহাকর্ষের বলের ক্রিয়ায় সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলোর গতি নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা গিয়েছিল। পড়ন্ত বস্তু পর্যবেক্ষণ করে (গল্প আছে তিনি গাছ থেকে একটি আপেলফল মাটিতে পড়তে দেখেছিলেন) তিনি মহাকর্ষের তত্ত্ব উপস্থিত করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে, বিশ্বের সকল বস্তু পরস্পরকে মহাকর্ষীয় বলে আকর্ষণ করে।

মহাকর্ষের যে সূত্র নিউটন উপস্থিত করেন তা সমীকরণের আকারে এইভাবে লেখা যায় :

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

F হচ্ছে দুই বস্তুর মধ্যেকার বল, m_1 ও m_2 সেই দুই বস্তুর ভর, r সেই দুই বস্তুর দূরত্ব, আর G হচ্ছে নিউটনের মহাকর্ষীয় নিত্য-সংখ্যা।

এই বল সম্পর্কে নিউটন একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ ধারণা ব্যক্ত করলেন। বললেন, এই বলের ক্রিয়া তাৎক্ষণিক। অর্থাৎ, দুই বস্তুর মধ্যে শূন্যস্থানের ব্যবধান যাই হোক, সেই দুই বস্তুর মধ্যেকার বলের ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘটে থাকে। অর্থাৎ, দূরে থেকেও তাৎক্ষণিক

ক্রিয়া। যেমন, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলো-মিটার, আলো পৌঁছতে সময় লাগে আট-মিনিটেরও বেশি, কিন্তু সূর্যের মহাকর্ষে পৃথিবী সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা। সময়ের যে মডেল নিউটন খাড়া করেছেন সেখানে দূরে-দূরে থাকা দুই বিন্দুতেও 'এই মুহূর্ত' হয়ে থাকে 'একই মুহূর্ত'। অতএব তাৎক্ষণিকতাও হয়ে ওঠে সুনির্দিষ্ট ও গ্রাহ্য ধারণা।

মহাকর্ষের সূত্র ও গতির সূত্র একসঙ্গে যুক্ত করে নিউটন এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন যে সূর্যের চারদিকে গ্রহের পরিক্রমার পথটি উপবৃত্তাকার। এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ নির্ভুল, এবং এতে দেখা গেল এমনকি স্বর্গীয় বস্তুও পার্থিব পদার্থবিদ্যার নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য হয় এবং পার্থিব গবেষণাগারেই সেই নিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসের এই শিক্ষা বারে বারেই পাওয়া গিয়েছে। দেখা গিয়েছে, প্রাকৃতির নতুন নতুন নিয়ম এই পৃথিবীতেই আবিষ্কৃত হয় এবং মহাবিশ্বের দূরতম যে এলাকা আমরা দেখতে পাই সেখানেও নিয়মগুলো খাটে।

নিউটনীয় বলবিদ্যার সাফল্য ছিল অসাধারণ। কামানের গোলা থেকে গ্রহ পর্যন্ত সবকিছুর গতি এই বলবিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ধরে নিলেন এই তত্ত্ব হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় শেষ কথা ও চূড়ান্ত অগ্রগতি। কেননা, নিউটনীয় বলবিদ্যা অনুসারে, বল ও প্রাথমিক অবস্থা যদি জানা থাকে তাহলে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত কণার গতি হিসেব করা সম্ভব। তার মানে, অন্য ভাষায় বলা চলে, বর্তমান অবস্থা ও বল সম্পর্কে যদি জানা থাকে তাহলে বিশ্বের সমগ্র ভবিষ্যৎ ছকে দেওয়া যায়। ফরাসী গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী লাপ্‌লাস ১৮২৫ সালে লিখলেন, 'আমার তন্ত্রে ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই।' তিনি বলতে চাইলেন, যদি নির্দিষ্ট একটি মুহূর্তে আমরা জানতে পারি বিশ্বের প্রতিটি বস্তু কোথায় আছে তাহলে নিউটনের সূত্রের সাহায্য নিয়ে বিশ্বের সমগ্র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগে থেকেই বলে দিতে পারি।

বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র

এবার আমরা তাকাব বিদ্যুতের দিকে। ফুলকির আকারে বা বজ্রের আকারে বিদ্যুতের সঙ্গে মানুষের পরিচয় বহুকাল আগে থেকেই ছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ নিয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু হয় আঠারো শতকের শেষ দিকে যখন আলেক্সান্দ্রো ভোল্টা ভোল্টেইক সেল বা ব্যাটারি আবিষ্কার করেন। এই ব্যবস্থা থেকে বহুক্ষণ স্থায়ী বিদ্যুতের প্রবাহ পাওয়া যায়, সেই প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা চলে।

তারপরে ১৮২০ সালে ডেনমার্কের পদার্থবিজ্ঞানী হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওয়েরস্টেড আবিষ্কার করেন যে বিদ্যুতের প্রবাহ কম্পাসের চৌম্বক কাঁটাকে নড়িয়ে দিতে পারে। চুম্বকের সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্ক থাকতে পারে এটা আগে কেউ ভাবেনি। ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী অ্যাম্পিয়ার দেখলেন; একটি গোল চক্র দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে চৌম্বক বল উৎপন্ন হয়। তিনি বললেন, বস্তু চুম্বকত্ব লাভ করে বস্তুর মধ্যে সঞ্চরমান বৈদ্যুতিক প্রবাহ থেকে। তিনি আরও দেখলেন, বিদ্যুতের প্রবাহ আছে এমন দুটি তারের মধ্যে চৌম্বক ক্রিয়া ঘটে, যেমন ঘটে দুটি চুম্বকের মধ্যে।

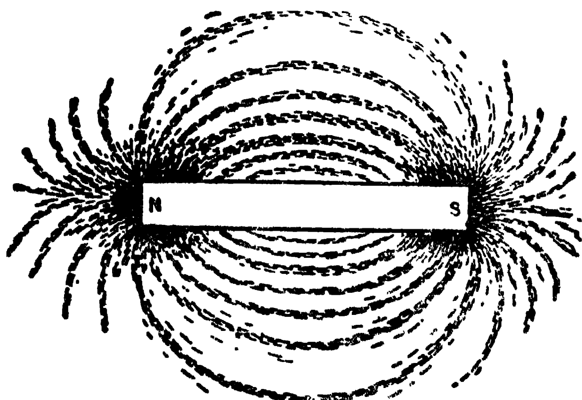
তার পরের নাম ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে।*

* মাইকেল ফ্যারাডে এক অসাধারণ বিজ্ঞানী। তাঁর বাবা ছিলেন কামার, অতি দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলায় লেখাপড়া যৎসামান্যই করতে পেরেছিলেন। বড়ো হয়ে একটা বইয়ের দোকানে পিয়নের চাকরি নেন। সেই সুযোগে দোকানে যতো বিজ্ঞানের বই আসত সবই পড়তেন। তারপরে একদিন তিনি একজন খদ্দেরের কাছ থেকে ব্রিটিশ রসায়নবিজ্ঞানী স্যার হাম্ফ্রে ডেভি-র বক্তৃতা শোনার টিকিট পেয়ে গেলেন। চারটি বক্তৃতা শুনলেন তিনি এবং এতই অনুপ্রাণিত হলেন যে স্থির করে ফেললেন কুলিগিরি করে হলেও অতঃপর শুধু বিজ্ঞানেরই সেবা করবেন। যা-হোক একটা কাজের জন্য স্যার হামফ্রে ডেভির কাছে আবেদন করলেন যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে সঙ্গে দিলেন স্যার ডেভির চারটি বক্তৃতার সারাংশ চিত্র সহ। ১৮১৩ সালে তিনি ল্যাবরেটরি সহকারী নিযুক্ত হলেন এবং প পর সম্পন্ন করলেন তাঁর বিখ্যাত সব পরীক্ষাকার্য।

আইনস্টাইনের পড়ার ঘরে এই বিজ্ঞানীর একটি প্রতিকৃতি ছিল। ফ্যারাডে আবিষ্কার করলেন বিদ্যুৎ-চৌম্বক আবেশ এবং উপস্থিত করলেন বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রের ধারণা। পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানে ফ্যারাডে ছিলেন বিরাট এক প্রতিভা।

বৈদ্যুতিক প্রবাহ যে চৌম্বক বল উৎপন্ন করে, এই ধারণা আগে থেকেই ছিল। ১৮৩১ সালে ফ্যারাডে দেখালেন, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় চুম্বক থেকেও বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হতে পারে। এই আশ্চর্য আবিষ্কারের পর থেকেই বিদ্যুৎ ও চুম্বকের সাদৃশ্য সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ থাকল না। আমরা এখন জানি, চৌম্বক ক্ষেত্রে যদি পরিবর্তন ঘটে চলে তাহলেই বিদ্যুতের প্রবাহ উৎপন্ন হয়। ডায়নামো এই নীতিতেই চলে। ডায়নামোতে তারের একটি কয়েল কয়লা বা জলের ক্ষমতায় চালিত হয়ে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘোরে আর তার ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রের ধারণাও আমরা ফ্যারাডের কাছ থেকেই



দণ্ড চুম্বকের ক্ষেত্র। N—চুম্বকের উত্তর মেরু। S—চুম্বকের দক্ষিণ মেরু। চুম্বকের চারধারে লোহার গুঁড়ো ছড়িয়ে আঙুলের টোকা দিলে চৌম্বক ক্ষেত্রের এই চেহারাটি পাওয়া যায়।

পেয়েছি। ফ্যারাডে বলেছিলেন 'বল-রেখা'। ফ্যারাডে দেখেছিলেন, একটি দণ্ড-চুম্বকের ওপরে একটা কাগজ রেখে সেই কাগজের ওপরে

যদি লোহাচুর ছড়িয়ে দেওয়া যায় আর তারপরে সেই কাগজের ওপরে আস্তে আস্তে টোকা মারা যায় (যাতে লোহাচুর নড়াচড়া করে) তাহলে দেখা যাবে, লোহাচুর দিয়ে চুম্বকের উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিশেষ একটি প্যাটার্নের রেখা ফুটে উঠেছে। এ-থেকে ফ্যারাডে ধরে নিলেন, চুম্বকটি থাকার জন্য চারদিকের দেশের মধ্যে একটি ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে এবং অনুমান করলেন, বিদ্যুতের বেলাতেও অনুরূপ ক্ষেত্র তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু এ নিয়ে একটি তত্ত্ব দাঁড় করাবার মতো গাণিতিক দক্ষতা ফ্যারাডের ছিল না। এ-কাজটি সম্পন্ন করলেন স্কটল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। ফ্যারাডের কাছে ম্যাক্সওয়েল যা ছিলেন তার তুলনা চলে কেপলারের কাছে নিউটন যা ছিলেন তার সঙ্গে। ম্যাক্সওয়েলের জন্ম ১৮৩১ সালে, যে-বছর ফ্যারাডে বিদ্যুৎচৌম্বক আবেশ আবিষ্কার করেন। গণিতে অতি ছোট বয়স থেকেই ম্যাক্সওয়েল ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভা।

পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় ম্যাক্সওয়েলের কিছু না কিছু কাজ আছে। এত উঁচুদরের কাজ যে আইনস্টাইন তাঁর সারা জীবনে বারবার বলেছেন, তাঁর নিজের চেয়ে ম্যাক্সওয়েলের অবদান বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ফ্যারাডের বল-রেখা বিশ্লেষণ করে ম্যাক্সওয়েল কতকগুলো সমীকরণ উপস্থিত করেন। সমীকরণগুলো এখন তাঁর নামেই পরিচিত। বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব নিয়ে যে-কোনো আধুনিক আলোচনা এই সমীকরণগুলো থেকে শুরু করতে হয়। আমরা দেখেছি, চৌম্বক ক্ষেত্রে যদি পরিবর্তন ঘটে তাহলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ আবিষ্ট হয়। তাহলে সমীকরণ এমন হওয়া চাই যা চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনকে আবিষ্ট বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। একটি ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটতে পারে যেমন দেশে, তেমনি কালে। অর্থাৎ, দেশের একটি বিশেষ বিন্দুতে সময়গত পরিবর্তন। কিংবা, একটি বিশেষ সময়ে দেশের বিন্দু থেকে বিন্দুতে পরিবর্তন। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণে দুই পরিবর্তনই প্রকাশ পেল—যেমন দেশগত, তেমনি কালগত। এবং ফ্যারাডের সমস্ত পর্যবেক্ষণ যথার্থভাবে ধরা পড়ল।

ধরা পড়ল আরো একটি নতুন বিষয়—শূন্যস্থানে বিদ্যুৎ-চৌম্বক

বিকিরণের সঞ্চরণ। ম্যাক্সওয়েল বললেন, বিদ্যুৎ-আবিষ্ট কোনো বস্তুর মধ্যে যদি কম্পন সৃষ্টি করা যায় তাহলে আধান (charge) ঘিরে তৈরি হওয়া বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তরঙ্গের আকারে আধান থেকে দূরে সঞ্চরিত হতে থাকে। এই তরঙ্গ শব্দের বা জলের তরঙ্গের মতো নয়—বিনা মাধ্যমেই চলে এবং সম্পূর্ণ শূন্যস্থান দিয়ে সঞ্চরিত হয়। ম্যাক্সওয়েল তাঁর সমীকরণ থেকে হিসেব করে দেখালেন, এই তরঙ্গের বেগ সেকেণ্ডে তিনলক্ষ কিলোমিটার—অর্থাৎ আলোর বেগের সমান। এই প্রথম একটি সূত্র পাওয়া গেল যা থেকে মনে করার কারণ ঘটল যে আলো হচ্ছে একটি বিদ্যুৎ-চৌম্বক ব্যাপার। আলো আমাদের কাছে অতি-পরিচিত—আলো আসছে সূর্য থেকে, তারা থেকে, বিশ্বের দূর দূর অংশ থেকে—বিনা মাধ্যমে। অথচ তরঙ্গগতি যা কিছু আমরা দেখি সবই সঞ্চরিত হয় পদার্থ দিয়ে গড়া একটা মাধ্যমের কম্পনের মধ্যে দিয়ে। আর ম্যাক্সওয়েলের এই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সঞ্চরিত হচ্ছে সম্পূর্ণ শূন্যস্থান দিয়ে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হল। কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের অকালমৃত্যুর ন-বছর পরে, ১৮৮৮ সালে, জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্ৎস এমন স্পন্দক আবিষ্কার করলেন যাতে ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, এমন গ্রাহক যাতে তা ধরা পড়ে। তিনি হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখালেন শূন্যস্থান দিয়ে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ প্রকৃতই সঞ্চরিত হয়। পরীক্ষাকার্যে তিনি আরও প্রমাণ করলেন, বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গের বেগ আলোর বেগের সমান।

কিন্তু সে-সময়ের পদার্থবিজ্ঞানীরা জানতেন শুধু নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানের যান্ত্রিক মডেল। তাঁরা মানতেই রাজী নন যে বিনা মাধ্যমে তরঙ্গ সঞ্চরিত হতে পারে। অতএব তাঁরা একটি মাধ্যম আবিষ্কার করলেন। সারা দেশে পরিব্যাপ্ত এই মাধ্যমটির নাম তাঁরা দিলেন 'ইথার' (ether)। ইথারের কাজ হল ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গ যাতে চলাচল করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনমতো স্পন্দিত হওয়া। ম্যাক্সওয়েল নিজেই বললেন (১৮৬৫), 'অতএব আলো ও উত্তাপের ব্যাপার থেকে আমাদের পক্ষে এমন বিশ্বাস করার কারণ আছে যে দেশকে পরিপূর্ণ করে ও বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে ইথারসদৃশ

একটি মাধ্যম। এই মাধ্যম গতিশীল হতে পারে, এক অংশ থেকে অন্য অংশে চালিত হতে পারে, স্থূল বস্তুতে সঞ্চলিত হয়ে তাকে উত্তপ্ত করতে পারে ও অন্য নানাভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারে।'

এবারে আমরা আইনস্টাইনের সেই ষোলবছর বয়সের লেখা প্রবন্ধের তাৎপর্য বুঝতে পারব। প্রবন্ধটি তিনি পাঠিয়েছিলেন তাঁর মামার কাছে। প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল হার্ৎস-এর প্রথম পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন হবার সাতবছর পরে।

আপেক্ষিকতার সূচনা

আইনস্টাইন নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমি যদি আলোর বেগে চলি তাহলে তার পরিণতি কী দাঁড়ায়? নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা অনুসারে একজন রক্তমাংসের মানুষের বেগ আলোর বেগের সমান হতে কোনো বাধা নেই। বলপ্রয়োগ করে তার বেগকে ক্রমেই বেশি বেশি মাত্রায় ত্বরণযুক্ত করা সম্ভব। ফলে তার বেগ বাড়তে বাড়তে আলোর বেগের মাত্রায় বা যে-কোনো মাত্রায় পৌছতে পারে।

আমি যদি আলোর বেগে চলি তাহলে আলো আমার কাছে স্থির মনে হবে। কথাটি পরিষ্কার করার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সমুদ্রের ওপর দিয়ে একটি জাহাজ চলছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের যা বেগ জাহাজেরও সেই একই বেগ। এমনি অবস্থায় জাহাজের ডেক থেকে তাকিয়ে একজন দর্শকের মনে হবে সমুদ্রের ঢেউগুলো নিশ্চল। দর্শকের মাথার ওপর শুধু আকাশ ছাড়া আর কিছু নেই। কাজেই অন্য কিছুর সঙ্গে বিচার করতেও পারছে না। অতএব সমুদ্রকে তার মনে হচ্ছে নিশ্চল জলরাশি। এটি শুধু তার ব্যক্তিগত ভাবনার বিষয় নয়, আসল ঘটনাও তাই। এখানে নির্দেশ-

ফ্রেমটি রয়েছে জাহাজের সঙ্গে যুক্ত এবং জাহাজ ঢেউয়ের গতিতে গতিশীল। এই নির্দেশ-ফ্রেমের বিচারে সমুদ্রের ঢেউ প্রকৃতই নিশ্চল।

বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের বেলাতেও কি একই ব্যাপাব দেখা যাবে? বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ বলতে বিশেষ করে আলোর কথাই ভাবা যাক। আলোর বেগ সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। কল্পনা করা যাক, জাহাজটিও একই গতিতে চলছে। তাহলে জাহাজের ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই দর্শকের মনে হবে আলোর বেগ শূন্য। তখন আলোর ব্যাপারে কতকগুলো অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা চোখে পড়বে তার। যেমন. জাহাজের পিছনদিক থেকে আলো ফেলা হল, কিন্তু সেই আলো জাহাজের সামনের দিকের পর্দায় পৌঁছতে পারল না। আগের দৃষ্টান্তে জাহাজকে ঘিরে সমুদ্র যেমন নিশ্চল ছিল, এক্ষেত্রে বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রও তেমনি নিশ্চল।

আমি যদি এই আলোর বেগে গতিশীল জাহাজের ডেকের দর্শক হই, অর্থাৎ আমি যদি আলোর বেগে চলি, তাহলে কী দেখব? দেখব নিশ্চল তরঙ্গ। আলো হচ্ছে বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের গতির ফল। এখন আর গতি নেই। তরঙ্গের চুড়ো চুড়ো-ই থেকে যাচ্ছে, তল তল-ই (তরঙ্গের যদি গতি থাকত তাহলে একই জায়গায় এই মুহূর্তে চুড়ো, পরের মুহূর্তে তল, এমনি বদলে বদলে যেত)। অর্থাৎ আমি যদি চুড়ো দেখি তো শুধু চুড়োই দেখে চলব, যদি তল দেখি তো শুধু তল-ই। তার মানে, আমি আর আলো দেখছি না। আলোর ব্যাপারে এই যদি অবস্থা হয় আর আমার কাছে যদি উপযুক্ত অপ্‌টিক্যাল যন্ত্রপাতি থাকে তাহলে অন্য-নিরপেক্ষভাবে (অর্থাৎ, বাইরের কোনো কিছুর ওপরে নির্ভর না করে) জাহাজের গতিও ধরে ফেলতে পারি। এমনটি হওয়া ম্যাক্‌সওয়েলের তত্ত্বের বিরোধী, কেননা ম্যাক্‌সওয়েলের তত্ত্বে বলা হয়েছে—আলো হচ্ছে বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের গতির ফল। এমনটি হওয়া আপেক্ষিকতার নিয়মেরও বিরোধী, যে নিয়মে বলা হয়েছে যে সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল কোনো বস্তুর ভিতরে থেকে কোনোরকম পরীক্ষাকার্যের দ্বারাই বলা সম্ভব নয় বস্তুটি স্থির না গতিশীল। তাহলে ধরে নিতে হয়—

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ ভুল, কিংবা, কোনো দর্শকের পক্ষে আলোর বেগে গতিশীল হওয়া সম্ভব নয়।

ষোল বছর বয়সেই আইনস্টাইন এই হেঁয়ালি নিয়ে ভেবেছিলেন। এবং তিনি লিখেছেন,

> যদি আমি c বেগে (আলোর বেগে) আলোর একটি রশ্মিকে অনুসরণ করি তাহলে এই রশ্মিকে আমার দেখা উচিত দেশ-বিস্তৃত স্পন্দনবিশিষ্ট নিশ্চল এক বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র হিসেবে। কিন্তু এ-ধরনের কোনো জিনিস নেই—অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখলেও নেই, ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ অনুসারেও নেই। একেবারে গোড়া থেকেই আমার কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা পরিষ্কার ছিল যে এমনি একজন দর্শকের কাছে সবকিছু ঘটতে হবে সেই একই নিয়ম অনুসারে যা পৃথিবীর আপেক্ষিকে স্থির কোনো দর্শকের পক্ষে খাটে। কেননা, নইলে সেই প্রথম দর্শক তো জেনে যেতে পারে বা নির্ধারণ করতে পারে যে সে রয়েছে সমবেগে দ্রুত গতিশীল অবস্থায়।

আইনস্টাইন দেখলেন, আলোর বেগে যে চলে সে আপেক্ষিকতার নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে। আপেক্ষিকতার নিয়ম নিয়ে আগে আমরা আলোচনা করেছি, আরো একবার করা যেতে পারে। বলের ক্রিয়া যদি না থাকে তাহলে কোনো বস্তু থাকতে পারে স্থির অবস্থায় কিংবা সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল অবস্থায়। বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র ত্বরণ উৎপাদন করার জন্য। বলবিদ্যায় দিক থেকে স্থির অবস্থা আর সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল অবস্থার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। অনপেক্ষ স্থির অবস্থা বা অনপেক্ষ সমবেগে গতিশীল অবস্থা বলে কিছু হতে পারে না। সমবেগে গতিশীল একটি ট্রেনের কামরায় (যার চারদিক বন্ধ) যদি বসে থাকি (ত্বরণ নেই অতএব ঝাঁকুনিও নেই) তাহলে কিছুতেই কামরার গতি টের পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা শুধু টের পেতে পারি আপেক্ষিক গতি—একজন দর্শকের সঙ্গে আরেকজন দর্শকের বিচার মাত্র। আমরা যখন কোনো কিছুকে স্থির বলি সেটা মাটির সঙ্গে বিচার করে। কিন্তু মাটিই কি স্থির? মোটেই নয়।

আইনস্টাইন লিখছেন,

দুজন পদার্থবিজ্ঞানীর কথা কল্পনা করা যাক। প্রত্যেকের আছে পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাকার্য চালাবার উপযোগী সম্ভাব্য সকল প্রকার যন্ত্রসজ্জিত একটি করে ল্যাবরেটরি। মনে করা যাক একটি ল্যাবরেটরি রয়েছে খোলা মাঠে, অপরটি কোনো এক দিকে সমবেগে গতিশীল ট্রেনের কামরার মধ্যে। আপেক্ষিকতার নিয়ম এই: নিশ্চল ল্যাবরেটরিতে একজন এবং সচল ল্যাবরেটরিতে অপর-জন, এই দুই পদার্থবিজ্ঞানী প্রকৃতির নিয়ম জানবার জন্য যদি তাঁদের সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, তাঁরা উভয়েই আবিষ্কার করবেন প্রকৃতির একই নিয়ম—অবশ্যই যদি ট্রেনটি সমবেগে গতিশীল থাকে এবং ট্রেনে কোনো ঝাঁকুনি না থাকে। আরো সাধারণ ভাষায় বলতে পারি: আপেক্ষিকতার নিয়ম অনুসারে প্রকৃতির নিয়ম নির্দেশতন্ত্রের স্থানান্তরণগত গতির ওপরে নির্ভর করে না।

ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গের বেলায় দেখা যাচ্ছে, আপেক্ষিকতার এই নিয়ম বজায় থাকছে না। আমি যখন স্থির (পৃথিবীর আপেক্ষিকে) তখন ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গকে দেখছি আলোর চেহারায়। আর আমি যখন আলোর বেগে গতিশীল তখন আর আলো দেখতেই পাচ্ছি না। এই অবস্থায় আমরা আমাদের অনপেক্ষ গতি নির্ধারণ করতে পারি। আপেক্ষিক নয়, অনপেক্ষ গতি। অথচ আপেক্ষিকতার নীতি অনুসারে অনপেক্ষ গতি বলে কিছু নেই। তার মানে, এক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে।

ব্যাপারটাকে বোঝাবার জন্য আইনস্টাইন একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বাল্‌ব থেকে আলো এসে একটি আয়নার ওপরে পড়ছে আর সেই আয়নায় মুখ দেখছে একজন মানুষ। এখন যদি সেই আয়না ও মানুষ আলোর বেগে চলতে শুরু করে—তাহলে? তাহলে আর বাল্‌ব-এর আলো কোনো সময়েই আয়নার নাগাল পায় না। তার মানে, বাল্‌ব থেকে আলো এসে আর কোনো সময়েই আয়নার ওপরে পড়ে না। তার মানে, মানুষটি আর কোনো সময়েই আয়নায় মুখ দেখতে পায় না। অতএব মানুষটি বলতে পারে সে আলোর বেগে চলছে। তার মানে আপেক্ষিকতার নিয়ম লঙ্ঘন।

এই গোলমেলে অবস্থার সমাধান করেছিলেন আইনস্টাইন আরো দশবছর পরে, তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে।

ইথারের সমস্যা

আইনস্টাইন যখন বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন সেই সময়ে বা তার কিছু আগে অন্য বিজ্ঞানীদের কাজেও গুরুতর সব সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। তবে আইনস্টাইন সম্পর্কে বলা চলে, বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে তিনি পৌঁছেছেন একা একা। তাঁর প্রবন্ধে অন্য কোনো পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে ঋণস্বীকার নেই, অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের উল্লেখ নেই। আইনস্টাইন যখন বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন তখন তিনি ছিলেন বার্ন-এর পেটেণ্ট অফিসের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মাত্র। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে শিক্ষণ বা গবেষণা সম্পর্কিত কোনো কাজ পাননি। পদার্থবিদ্যায় শিক্ষা পেয়েছেন জুরিখ পলিটেকনিকে। সেখানে এমনকি ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ পর্যন্ত পড়ানো হত না। তা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন নিজে নিজে পাঠ্য-পুস্তক পড়ে।

অন্য পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে এই সমস্ত সমস্যা কি-ভাবে দেখা দিয়েছিল? তখনো পর্যন্ত তাঁরা ভাবতেন, যে-কোনো ব্যাপারকে বুঝতে হলে তার একটি যান্ত্রিক মডেল খাড়া করা চাই। কাজেই ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁরা একটি যান্ত্রিক মডেল খাড়া করে নিলেন। শূন্যস্থান দিয়ে তো আর তরঙ্গ প্রবাহিত হতে পারে না। অতএব ইথারের কথা ভাবা হল। কম্পমান বৈদ্যুতিক চার্জ ইথারে আলোড়ন তোলে আর এই আলোড়ন তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়ে চলে—যেমন প্রবাহিত হয় শব্দের তরঙ্গ। কিন্তু ব্যাখ্যাটা এত সহজ ছিল না! শব্দের তরঙ্গ আর আলোর তরঙ্গ একধরনের নয়। সবচেয়ে বড়ো তফাৎ তরঙ্গের স্পন্দনে। আলোর তরঙ্গের স্পন্দনের তলটি তরঙ্গের যে-দিকে গতি তার খাড়াখাড়ি। শব্দের তরঙ্গ তৈরি হয় মাধ্যমের সংকোচনে ও প্রসারণে আর সেটি ঘটে থাকে লম্বালম্বি। হল্যাণ্ডের পদার্থবিজ্ঞানী এইচ এ লোরেন্‌ৎস দেখালেন, ইথারের মধ্যে আলোর তরঙ্গের সম্পূর্ণ

খাড়াখাড়ি স্পন্দন ঘটাতে হলে ইথার হওয়া চাই অশেষ মাত্রার নিরেট। অন্যদিকে সমস্ত স্থান ভরাট করে থাকা এই মাধ্যমটি এমন হওয়া চাই যার মধ্যে দিয়ে সমস্ত বস্তু বিনা বাধায় চলাচল করতে পারে। আইনস্টাইন তাঁর 'অবিচুয়ারিতে' লিখছেন,

> জগতের যান্ত্রিক চিত্রে যদি তরঙ্গরূপী আলো অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তাহলে গুরুতর রকমের সংশয় দেখা দিতে বাধ্য। আলোকে যদি ধরা হয় নমনীয় একটি মাধ্যমে (ইথার) স্পন্দনশীল গতি, তাহলে এই মাধ্যমটি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হাওয়া চাই; আলোর তরঙ্গের খাড়াখাড়ি স্পন্দন থাকার দরুন সেটি অনেকটা কঠিন বস্তুর মতো, এমন নয় যে সংকুচিত হতে পারে—যাতে লম্বালম্বি তরঙ্গের অস্তিত্ব না থাকে। এই অবস্থায় অবশিষ্ট বস্তুর পাশাপাশি এই ইথারের অস্তিত্ব অলীক হয়ে ওঠে, কেননা এই মাধ্যমটি 'গুরুভার' বস্তুতে কোনোরকম বাধা দেয় বলে মনে হয় না।

ইথারকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে আরও সমস্যা দেখা দিল। প্রশ্ন উঠল, ইথারের সঙ্গে বিচারে পৃথিবী কি স্থির, না, গতিশীল? উনিশ শতকের শেষদিকে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে দুই-ই অসম্ভব বলে মনে হতে লাগল—না স্থির, না গতিশীল।

প্রথমে ভাবা গিয়েছিল পৃথিবী ছুটছে আর সেইসঙ্গে ইথারকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার মানে, ইথারের সঙ্গে বিচারে পৃথিবী স্থির। কিন্তু এই ধারণা বাতিল করতে হল তারার অপেরণ (aberration) থাকার জন্য। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা দরকার।

একজন লোক ছাতা নিয়ে হাঁটছে, এমন সময়ে বৃষ্টি নামল। বাতাস নেই বলে বৃষ্টি পড়ছে সিধে খাড়াভাবে। কিন্তু লোকটি যেহেতু হাঁটছে তাই সেই সিধে-খাড়া বৃষ্টি আটকাবার জন্যও তাকে মাথার ওপরে ছাতা ধরতে হয় সামনের দিকে একটু হেলিয়ে। যতো বেশি জোরে হাঁটে ততো বেশি ছাতা হেলিয়ে ধরে। তারার আলোও পৃথিবীর ওপরে এসে পড়ছে বৃষ্টির মতো। কিন্তু পৃথিবী গতিশীল। অতএব, পৃথিবীর কোনো দূরবীক্ষণযন্ত্রে তারার আলো ধরতে হলে দূরবীক্ষণযন্ত্রের মুখ তারা-বরাবর না করে খানিকটা হেলিয়ে দিতে হয়। পৃথিবীর গতির দরুন তারার প্রতীয়মান অবস্থানের এই পরিবর্তনকে বলা হয় অপেরণ। গতিশীল পৃথিবী

যদি ইথারকেও সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে তাহলে পড়ন্ত বৃষ্টির বেলায় বাতাস থাকলে যা হত পড়ন্ত তারার আলোর বেলায় ইথারের ক্রিয়াও তাই নয়। এক্ষেত্রে দুয়ে কাটাকুটি হয়ে গিয়ে অপেরণ আর থাকে না। কিন্তু বাস্তব পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, অপেরণ থাকছেই। অতএব অবধারিত সিদ্ধান্ত করতে হয়, গতিশীল পৃথিবী ইথারকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে না।

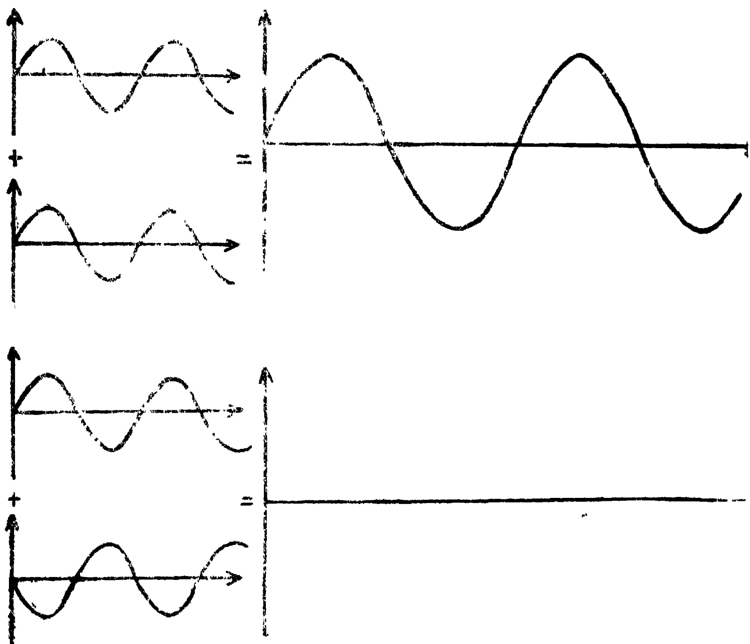
অতএব একটিই সিদ্ধান্ত করতে হয়—পৃথিবী গতিশীল কিন্তু ইথার স্থির। তাই যদি হয় তাহলে তো এই ইথারই হয়ে উঠতে পারে পরম-স্থির একটি নির্দেশ-কাঠামো, নিউটনের সূত্রের জন্য যার প্রয়োজন ছিল।

মাইকেলসনের পরীক্ষাকার্য

ব্যাপারটা সত্য কিনা তাই নিয়ে নিখুঁত এক পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করলেন উনিশ শতকের অন্য এক অসাধারণ বিজ্ঞানী আলবার্ট মাইকেলসন।* পরীক্ষাকার্য চালাবার জন্য তিনি নিজে একটি যন্ত্র তৈরি করে নিলেন—মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটার (Michelson Interferometer) বা ব্যতিচার-যন্ত্র। দুই বা ততোধিক তরঙ্গের

* আলবার্ট মাইকেলসনের জন্ম পোল্যাণ্ডে, ১৮৫২ সালে। মাইকেলসন পরিবার দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসে। আনাপোলিসের ন্যাভাল আকাদেমিতে আলবার্ট লেখাপড়া করেন। আলোর ধর্ম নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ১৮৭৮ সালে এবং সারাটা জীবন এই গবেষণাতেই কাটান। আলোক-বিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য জার্মানি ও ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। নিজের নতুন কৃৎকৌশল অবলম্বনে ১৮৮২ সালে অতি সঠিকভাবে নিরূপণ করেন আলোর বেগ—সেকেণ্ডে ২,৯৯,৮৫৩ কিলোমিটার। তিনিই ছিলেন আমেরিকার প্রথম নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী।

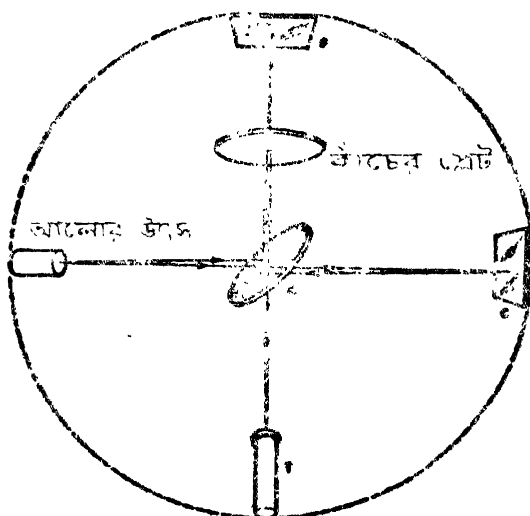
সংযোগ বা মিলনকে বলা হয় ব্যতিচার। যদি একটি তরঙ্গের চুড়ো অপর একটি তরঙ্গের তলের সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে কাটাকুটি হয়ে গিয়ে তরঙ্গ আর থাকে না। অন্যদিকে যদি একটি তরঙ্গের চুড়ো অপর একটি তরঙ্গের চুড়োর ওপরে এসে পড়ে তাহলে তরঙ্গ আরো



দুই বা ততোধিক তরঙ্গের সংযোগ বা মিলনকে বলা হয় ব্যতিচার। দুটি তরঙ্গ যদি একই দশার হয়, অর্থাৎ একটি তরঙ্গের চুড়ো অন্য তরঙ্গের চুড়োয় থাকে, তাহলে তরঙ্গ আরো বড়ো হয় (ওপরের চিত্র)। আর দশার দিক থেকে যদি অমিল হয়, অর্থাৎ একটি তরঙ্গের চুড়ো অন্য তরঙ্গের তলে থাকে, তাহলে তরঙ্গ আরো কমে যায় বা একেবারেই লোপ পায় (নিচের চিত্র)।

জোরালো হয়। তার মানে, আমরা বলতে পারি, দুই তরঙ্গের মিলনের ফলে যে তরঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য মূল দুই তরঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি দুটি অভিন্ন আকারের তরঙ্গের মধ্যে ব্যতিচার

ঘটে তাহলে তারা অবশ্যই চুড়োয় চুড়োয় মিলে যেতে পারে, কিংবা এমনও হতে পারে যে একটির চুড়ো অপরটির চুড়ো থেকে খানিকটা আগে বা পিছনে থেকে যাচ্ছে। শেষের ব্যাপারটি যদি ঘটে তাহলে প্রাপ্ত তরঙ্গের বিন্যাসে ঝালর (fringes) দেখতে পাওয়া যায়।



মাইকেল্‌সন-মর্‌লে পরীক্ষাকার্যের ব্যতিচার যন্ত্র। আলোর উৎস থেকে আলো এসে পড়ছে একটি আধা-প্রলেপ দেওয়া আয়নার (*A*) ওপরে। আলো দু-ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একভাগ যাচ্ছে C আয়নার দিকে, অন্যভাগ B আয়নার দিকে। A আয়না থেকে C ও B আয়নার দূরত্ব সমান। দুই আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে দুই আলো আবার ফিরে আসে A আয়নায়। সেখানে পুনর্মিলিত হয়ে চলে যায় দূরবীনের দিকে। যেহেতু ACT আলোর রশ্মিকে A আয়নার কাঁচের ভিতর দিয়ে তিনবার পার হতে হয় সেজন্য ABT রশ্মির অবস্থা অনুরূপ করার জন্য A ও B আয়নার মধ্যে একটি কাঁচের প্লেট রাখা হয়েছে। দুই আলোর ফিরে আসার সময় যদি ভিন্ন হয় তাহলে দূর-বীনের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে অবশ্যই ঝালর দেখতে পাওয়া উচিত। যন্ত্রটিকে নানাদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষাকার্য চালানো হয়।

মাইকেলসন ব্যতিচার-যন্ত্রটি এমনিতে খুবই সরল। এতে আছে সমকোণে যুক্ত দুটি সিধে ও সমানদৈর্ঘ্যের বাহু। প্রত্যেক বাহুর

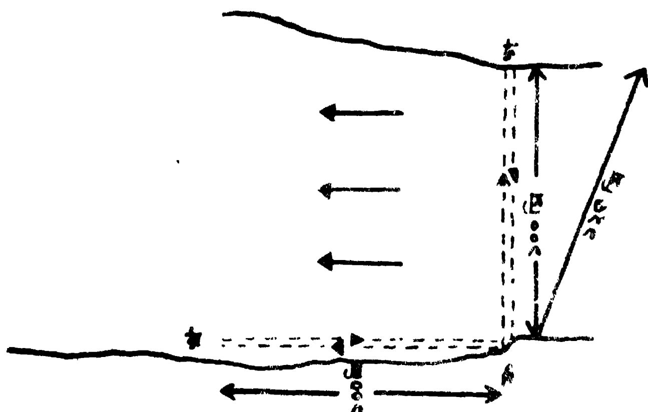
শেষে একটি করে আয়না। দুই বাহু যেখানে যুক্ত হয়েছে সেখানে আছে এমন একটি আধা-প্রলেপ দেওয়া আয়না যা দিয়ে অর্ধেক আলো সোজাসুজি বেরিয়ে যায় আর অর্ধেক আলো প্রতিফলিত হয়। সোজাসুজি বেরিয়ে যাওয়া আলোর পথ একটি বাহু দিয়ে। আর আয়নাটি এমন ভাবে বেঁকিয়ে বসানো যে প্রতিফলিত আলোর পথ দ্বিতীয় বাহু দিয়ে।

এই হচ্ছে ব্যতিচার যন্ত্রের ব্যবস্থা। একই আলো দুই বাহুর সংযোগ স্থলের আয়নায় দু-ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এক-এক ভাগ যাচ্ছে এক-এক বাহুতে। বাহুদুটির দৈর্ঘ্য সমান। অতএব বাহুর শেষের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে আবার একই সময়ে সংযোগ-স্থলে ফিরে আসার কথা। যদি না আসে তাহলে আলোয় আলোয় অমিল হয়ে ঝালর দেখা দেয়। এই ঝালর দেখে বুঝে নেওয়া যায় একই আলো একই দৈর্ঘ্যের দুই বাহুতে যাতায়াত করতে কম-বেশি সময় নিয়েছে।

আমরা পরীক্ষা করতে চাইছি বাস্তব অবস্থা এই কিনা যে ইথার স্থির ও পৃথিবী গতিশীল। ধরে নিলাম তাই—স্থির ইথারের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী চলেছে। এই অবস্থায় পৃথিবী থেকে মনে হবে ইথার যেন প্রবাহিত হয়ে চলেছে, নদীর জলের প্রবাহের মতো। এখন কথাটা এই—স্থির ইথারে আলোর যা বেগ, প্রবাহিত ইথারে আলোর সেই একই বেগ থাকা উচিত নয়। যেমন একজন সাঁতারু স্থির জলে যে-বেগে সাঁতার কাটে, প্রবহমান জলে স্রোতের পক্ষে হলে তার চেয়ে বেশি বেগে, বিপক্ষে হলে তার চেয়ে কম বেগে।

সাঁতারুর দৃষ্টান্ত থেকে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। একটি নদী, ১০০ মিটার চওড়া। নদীর স্রোতের বেগ মিনিটে ৩০ মিটার। দুই সাতারু রাম ও শ্যাম স্থির জলে সাঁতার কাটে মিনিটে ৫০ মিটার বেগে। নদীর বাম তীরে ক বিন্দু থেকে দুই সাঁতারু রওনা হচ্ছে। রাম যাচ্ছে প্রবাহের দিকে ১০০ মিটার দূরে খ বিন্দু পর্যন্ত এবং সেখান থেকে আবার ক বিন্দুতে ফিরে আসছে। শ্যাম যাচ্ছে বিপরীত দিকে ডানতীরের গ বিন্দু পর্যন্ত এবং সেখান থেকে আবার ক বিন্দুতে ফিরে আসছে। এখানে একটি কথা বলার আছে। শ্যাম

যদি সরাসরি গ বিন্দুর দিকে লক্ষ্য রেখে সাঁতার কাটে তাহলে নদীর স্রোতে খানিকটা ভেসে যাওয়ার দরুন সে আসলে গিয়ে পৌঁছত



আরো ওপরের একটি বিন্দুতে। সঠিকভাবে গ বিন্দুতে পৌঁছতে হলে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আরো নিচের একটি বিন্দুতে। মনে করা যাক এই বিন্দুটি ঘ। তাহলে আসলে সে সাঁতার কেটে পার হচ্ছে কঘ দূরত্ব, যদিও পৌঁছচ্ছে গ বিন্দুতে। ঘগ দূরত্ব তাকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে নদীর স্রোত। হিসেব করে দেখানো চলে কঘ দূরত্বের মাপ ১২৫ মিটার। এই দূরত্ব পার হতে তার সময় লাগে ২½ মিনিট। ফিরে আসতে আরো ২½ মিনিট। মোট ৫ মিনিট। নদীতে যদি স্রোত না থাকত তাহলে এপার ওপার করতে শ্যামের সময় লাগত ৪ মিনিট। এবারে দেখা যাক রামের কত সময় লাগে। রাম যাবার সময়ে স্রোতের পক্ষে যায়, ফলে তার বেগ মিনিটে ৮০ মিটার। ১০০ মিটার যেতে সময় লাগে ১¼ মিনিট। ফিরে আসবার সময়ে রাম স্রোতের বিপক্ষে, তখন তার বেগ মিনিটে ২০ মিটার, সময় লাগে ৫ মিনিট। অর্থাৎ, মোট সময় লাগে ৬¼ মিনিট। নদীতে স্রোত না থাকলে সময় লাগত ৪ মিনিট। স্রোত বা প্রবাহ আছে বলেই সময়ের হেরফের। শ্যাম রামের চেয়ে ১¼ মিনিট আগে পৌঁছে যাচ্ছে। অথচ দুজনের সাঁতার কাটার একই বেগ, একই দূরত্ব, স্থির জল হলে একই সময় নিত—হেরফের ঘটে যাচ্ছে প্রবাহ থাকার জন্য।

এমনি হেরফের ঘটা উচিত ব্যতিচারযন্ত্রের দুই বাহু দিয়ে আলোর যাতায়াতেও, যদি ইথারের প্রবাহ থাকে। যন্ত্রের একটি বাহু থাকে ইথারের প্রবাহ বরাবর, তাহলে অপর বাহুটি এই প্রবাহের আড়াআড়ি। দুই বাহু দিয়ে আলোর যাতায়াত ঠিক সেই দুই সাঁতারুর মতো। আড়াআড়ি বাহু দিয়ে যে-আলোর যাতায়াত তার সময় লাগার কথা বরাবর বাহু দিয়ে যাতায়াতকারী আলোর চেয়ে কম। অর্থাৎ, সংযোগস্থলে দুই আলো ফিরে আসছে দুই ভিন্ন সময়ে। তার মানেই অমিল। তার মানেই ঝালর। উল্টো দিক থেকে দেখলে, ব্যতিচারযন্ত্রে ঝালর দেখা মানেই প্রমাণ হওয়া যে ইথার প্রবাহশীল।

কিন্তু সমস্ত রকমে পরীক্ষাকার্য চালিয়েও ব্যতিচারযন্ত্রে ঝালর পাওয়া গেল না। নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল যে আলোর বেগ বরাবর-বাহুতেও যা, আড়াআড়ি-বাহুতেও তাই—দুদিকেই সমান। পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে যে-সব পরীক্ষাকার্য সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছে, মাইকেল্‌সন-মর্‌লে* নামে খ্যাত এই পরীক্ষাকার্যটি তার মধ্যে একটি। সম্পন্ন হয়েছিল ১৮৮৭ সালে।

এই পরীক্ষাকার্যের ফল বিজ্ঞানীমহলকে স্তম্ভিত করল। পরীক্ষাকার্য নিখুঁত, তার ফল অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এই ফল মেনে নিতে হলে সিদ্ধান্ত করতে হয় পৃথিবী স্থির। পৃথিবী যদি স্থির হয় তাহলে আর ইথারের কোনো প্রবাহ থাকে না— তাহলেই আলোর গতি সবদিকেই সমান হতে পারে। কিন্তু পৃথিবী তো আর স্থির নয়, পৃথিবীর গতিশীলতার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। প্রিন্‌সিপিয়ার দু'শো বছর পরে পৃথিবীর গতিশীলতা নিয়ে নতুন করে আর প্রশ্ন তোলা চলে না।

অন্যদিকে, আমরা আগেই দেখেছি, গতিশীল পৃথিবী ইথারকেও সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—তাও হতে পারে না।

* এডওয়ার্ড মরলে ছিলেন রসায়নবিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানী। আলবার্ট মাইকেলসনের সঙ্গে তিনি পরীক্ষাকার্যে সহযোগিতা করেছিলেন। পরীক্ষা-কার্যের ধারণা ও পরিকল্পনা অবশ্যই মাইকেলসনের। প্রাথমিক পর্যায়ে, ১৮৮১ সালে মাইকেলসন একাই পরীক্ষাকার্য চালান।

তাহলে মাইকেল্‌সন-মর্‌লের পরীক্ষাকার্যের ব্যাখ্যা কী?

অন্য বিজ্ঞানীরা যখন মাইকেলসন-মরলের পরীক্ষাকার্য নিয়ে ভাবিত ছিলেন তখন আইনস্টাইন কিন্তু এই পরীক্ষাকার্য সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমার নিজের বিকাশে মাইকেলসনের ফলের বিশেষ প্রভাব ছিল না। এমনকি আমার মনেও পড়ে না আমি যখন প্রথম বিষয়ে আমার প্রথম নিবন্ধ লিখেছিলাম তখন এই পরীক্ষাকার্যের বিষয়ে আদৌ জানতাম কিনা।' তিনি তখন কাজ করছিলেন বার্ন-এর পেটেণ্ট অফিসে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। পদার্থবিদ্যায় শিক্ষা ও গবেষণা কোন্ পথে চলছে তা জানতে পারতেন না – কেননা বার্নের পেটেণ্ট অফিসে বসে বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকা হাতে পাবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বিজ্ঞানীমহলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। তিনি ভাবিত ছিলেন তাঁর নিজের সমস্যা নিয়ে। সেই ষোলবছর বয়স থেকেই।

দশবছর ধরে ভাবনাচিন্তা করার পরে একটি তত্ত্ব উপস্থিত করলেন—যাকে বলা হয় বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। এই তত্ত্বের বক্তব্য খুবই সরল—সেই গ্যালিলীয় আপেক্ষিকতার নিয়ম। অর্থাৎ, দুই বস্তুর একটি যদি থাকে স্থিতিশীল অবস্থায়, অন্যটি সমবেগে গতিশীল অবস্থায়, তাহলে দুয়ের যে-কোনো একটির মধ্যে কোনোরকম পরীক্ষাকার্য চালিয়ে কিছুতেই দুয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ করা যাবে না। এই নীতি বস্তুজগতের ক্ষেত্রে সত্য, তা গ্যালিলিও ও নিউটনের সময় থেকেই জানা ছিল। গ্যালিলিওর এই আপেক্ষিকতার নিয়মের ওপরে দাঁড়িয়েই নিউটন তাঁর গতিবিজ্ঞানের সূত্র নির্মাণ করেছিলেন। আইনস্টাইন বললেন, গ্যালিলীয় আপেক্ষিকতার নিয়ম যেমন খাটে বস্তুর জগতে, তেমনি আলোর জগতে। জাগতিক নিয়ম স্থিতিশীল বস্তুর মধ্যেও যা, সমবেগে গতিশীল বস্তুর মধ্যেও তাই। দুয়ের যে-কোনো একটিতে কোনোরকম পরীক্ষাকার্য চালিয়ে স্থিতিশীল অবস্থা ও গতিশীল অবস্থা তফাৎ করা যাবে না। বড়ো জোর ধরা যাবে দুয়ের আপেক্ষিক গতি। তাও যে-কোনো একটি থেকে মনে হতে পারে, সে নিজে স্থির, গতিশীল কেবল অপরটি। আইনস্টাইন

বললেন, একই কথা বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কেও। বিষয়টি নিয়ে আমরা একটু পরেই বিশদভাবে আলোচনা তুলছি। আপাতত যদি এই কথাটুকু মেনে নেওয়া হয় যে গ্যালিলীয় আপেক্ষিকতার নিয়ম বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রেও সত্য, তাহলে কিন্তু মাইকেলসন-মর্‌লে পরীক্ষাকার্যে আর কোনো দুর্বোধ্যতা থাকে না।

সমাধানটি এতই সহজ যে হতাশ হতে হয়। আসলে কোনো দুর্বোধ্যতাই নেই। পৃথিবীকে ধরে নেওয়া চলে সমবেগে গতিশীল বস্তু। এই পৃথিবীর মধ্যে থেকে কোনোরকম পরীক্ষাকার্য চালিয়ে বোঝা যাবে না পৃথিবী গতিশীল কিনা। এই পরীক্ষাকার্য যান্ত্রিক হতে পারে, বিদ্যুৎচৌম্বক হতে পারে, কিন্তু কোনো পরীক্ষাকার্য থেকেই কোনোরকম ফল পাবার আশা করা চলে না। মাইকেল্‌সন-মর্‌লেও পাননি। সমবেগে গতিশীল পৃথিবী হচ্ছে জড়ত্বীয় তন্ত্র। জড়ত্বীয় তন্ত্রে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে শুধু ধরা যেতে পারে আপেক্ষিক গতি।

লোরেন্‌ৎস ফিৎস্‌জেরাল্‌ড সংকোচন

মাইকেল্‌সন-মর্‌লের পরীক্ষাকার্যের ফল দেখে বিজ্ঞানীমহল তো হতভম্ব। নিউটনের পরে দু-শো বছর ধরে সবকিছু ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল যান্ত্রিক মডেল খাড়া করে। এমনকি ম্যাক্‌সওয়েলের তরঙ্গকে ব্যাখ্যা করার জন্যও বিশ্বব্যাপী একটি মাধ্যমের অস্তিত্ব কল্পনা করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাইকেল্‌সন-মর্‌লের পরীক্ষাকার্যের ফল এই যান্ত্রিক মডেলের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়ানো গেল না।

তখন বিজ্ঞানীরা আরও বেশি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে যান্ত্রিক কাঠামোটি বজায় রাখতে চেষ্টা করলেন। মাইকেল্‌সন-মর্‌লে পরীক্ষাকার্যের ফল ব্যাখ্যা করার জন্য পদার্থবিজ্ঞানী ফিৎস্‌জেরালড

১৮৯২ সালে অসাধারণ একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন। বললেন, মাইকেলসন ব্যতিচার-যন্ত্রের যে বাহুটি পৃথিবীর গতির বরাবরে রয়েছে সেটি সংকুচিত হচ্ছে। এমন মাত্রায় সংকুচিত হচ্ছে যাতে বরাবর বাহুর আলো ফিরে যেতে যে সময় লাগছে তার সঙ্গে আড়াআড়ি বাহুর আলো ফিরে আসার সময়ের কোনো তফাৎ থাকছে না। তিনি হিসেব করে দেখালেন, সংকোচনের মাত্রা যদি এক মিটারের দশকোটি ভাগের একভাগ হয় তাহলেও মাইকেল্‌সন-মর্‌লের পরীক্ষাকার্যে যে ফল পাওয়া গিয়েছে, অর্থাৎ কোনো বৈষম্য না পাওয়ার ফল, তাই পাওয়া উচিত। পরে ১৮৯৫ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানী লোরেন্‌ৎসও এমনি সংকোচনের কথা তুলেই মাইকেল্‌সন-মর্‌লে পরীক্ষাকার্যে কোনো ফল না পাওয়ার ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। আসলে লোরেন্‌ৎস গবেষণা করেছিলেন বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের একটি তত্ত্ব গড়ে তোলার জন্য। ম্যাক্‌সওয়েল যে বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রের কথা বলে গিয়েছেন তাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য তাঁর এই গবেষণা। মূল যে ধারণার ওপরে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তা এই যে ম্যাক্‌সওয়েলের ক্ষেত্রের উৎস হচ্ছে বৈদ্যুতিক চার্জবিশিষ্ট বস্তু এবং বস্তুর কণিকার মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে এই ক্ষেত্রের অস্তিত্ব থাকে। অর্থাৎ তিনি বস্তু ও ক্ষেত্রকে পরিষ্কার পৃথক করে দেখালেন। চার্জবিশিষ্ট কণিকাদের পারস্পরিক ক্রিয়া হচ্ছে আসলে কণিকাদের নিজ-নিজ ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া। আইনস্টাইন তাঁর 'অবিচুয়ারিতে' লিখেছেন :

> তাঁর (লোরেন্‌ৎস) বক্তব্য এই যে নিয়মমতো একমাত্র শূন্য-স্থানেই ক্ষেত্র অস্তিত্বশীল হয়। বৈদ্যুতিক চার্জ থাকে কেবলমাত্র পরমাণু দিয়ে গড়া বস্তুতে। দুই বস্তু-কণিকার মধ্যে থাকে শূন্য-স্থান আর এই শূন্যস্থানে বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র।...কণিকার চার্জ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, অন্যদিকে এই ক্ষেত্র কণিকার চার্জের ওপরে ক্রিয়াশীল হয়। ফলে নিউটনের গতি-সূত্র অনুযায়ী কণিকাগুলো গতি লাভ করে। বর্তমান প্রজন্মের পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন, লোরেন্‌ৎস-এর লব্ধ একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিই সম্ভবপর। কিন্তু সেকালের পক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করাটাই ছিল এক বিস্ময়কর ও

দুঃসাহসী পদক্ষেপ, যেটি না ঘটলে পরবর্তী কালের অগ্রগতি অসম্ভব হত।

লোরেন্‌ৎস-এর সমস্ত ধারণা ইথারের অস্তিত্ব ধরে নিয়ে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত চার্জবিশিষ্ট কণিকার (যেমন, ইলেকট্রন) পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য লোরেন্‌ৎস-এর তত্ত্বের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। বস্তু সম্পর্কে লোরেন্‌ৎস ভাবতেন, বস্তু হচ্ছে অণু বা বিদ্যুৎ-চৌম্বক পদার্থ এবং এই পদার্থকে একসঙ্গে ধরে রেখেছে বিদ্যুৎচৌম্বক শক্তি। কাজেই এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে পদার্থ গতিশীল হলে এই সমস্ত শক্তি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে সংকোচন ঘটে থাকে। পরে একটি ভাষণে লোরেন্‌ৎস ব্যাপারটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন :

> আমরা যদি মনে রাখি কঠিন পদার্থের আকার নির্ভর করে অণুর মধ্যেকার বলের ওপরে তাহলে মাপ পরিবর্তিত হওয়ার ব্যাপারটি বুঝতে পারব। এবং সম্ভবত এই সমস্ত বল সঞ্চারিত হয় পরিব্যাপ্ত ইথার দিয়ে, যেমন এই ইথারের মধ্যে দিয়েই সঞ্চারিত হয় বিদ্যুৎচৌম্বক ক্রিয়া। এ থেকে এমন কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক, পদার্থ সম্মুখগতি প্রাপ্ত হলে বিদ্যুৎচৌম্বক শক্তির মতো আণবিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণও কিছুটা বদলে যেতে পারে এবং ফল-স্বরূপ তার মাপে অবশ্যই পরিবর্তন ঘটতে পারে।

লোরেন্‌ৎস-এর ব্যাখ্যা যাই হোক, গতিশীল বস্তুর সংকোচনের কথা তিনি বলেছেন। ফিৎজেরাল্‌ডও সংকোচনের কথা বলেছেন। পরে আমরা দেখব, আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বেও সংকোচনের কথা বলা হয়েছে—যদিও সেই বক্তব্যের তত্ত্বগত ভিত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সংকোচনকে বলা হয় লোরেন্‌ৎস-ফিৎস্‌জেরাল্‌ড সংকোচন।

যাই হোক, মাইকেল্‌সন-মর্‌লের পরীক্ষাকাযে কোনো ফল না পাওয়ার ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য লোরেন্‌ৎস-ফিৎস্‌জেরাল্‌ড সংকোচন ধর্তব্য বিষয় নয়। তার ব্যাখ্যা অন্য, সে-কথা আমরা আগে বলেছি। তা হচ্ছে, বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রেও আপেক্ষিকতার নিয়মকে সত্য বলে ধরে নেওয়া। বস্তুর ক্ষেত্রে যে নিয়ম খাটে আলোর

ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম খাটে কিনা, তাই প্রশ্ন। আইনস্টাইন বললেন, খাটে। খাটে বলেই মাইকেল্‌সন-মর্‌লে পরীক্ষাকার্যে কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

তাহলেই অন্য একটি প্রশ্ন ওঠে। নিউটনের গতি-সূত্র অনুসারে আমরা জানি, বলপ্রয়োগ করে চললে বস্তুর গতি বাড়ে। এবং বল-প্রয়োগ যদি চলতে থাকে তাহলে বস্তুর গতিও বেড়েই চলে। বাড়তে বাড়তে আলোর সমান বেগে পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব নয়, এমনকি আলোর বেগ ছাড়িয়ে যাওয়াও। অথচ আইনস্টাইন বিশ্লেষণ করে দেখালেন, কোনো কিছুর পক্ষেই আলোর সমান বেগ লাভ করা সম্ভব নয়। একজন দর্শক যদি আলোর সমান বেগে গতিশীল হয় তাহলে তার কাছে আলো আর আলো থাকে না। এ এক অসম্ভব পরিস্থিতি।

তাহলে কোনটা সত্যি ? নিউটনের বলবিদ্যা, না, বিদ্যুৎচৌম্বক তত্ত্বে আপেক্ষিকতার নিয়ম ? নিউটনের বলবিদ্যা স্বীকার করে নিলে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হয় যে একজন দর্শকের পক্ষে অবশ্যই আলোর বেগে গতিশীল হওয়া সম্ভব। অসাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বললেন, দুটি তত্ত্বকে একসঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়ানো চলে না, একটি নিশ্চয়ই ভুল। ভুল—নিউটনের বলবিদ্যা।

এ এক ভয়ংকর কথা। দু-শো বছরের বেশি সময় ধরে নিউটনের যে বলবিদ্যার সাহায্যে জগৎ-ব্যাপারের সবকিছু এমন চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল তাই কিনা ভুল ! এখানে কিছু বলার কথা আছে।

ভুল মানে সর্বক্ষেত্রে ভুল নয়। ক্রিয়াকাণ্ডের সীমাবদ্ধ একটি ক্ষেত্রে নিউটনের বলবিদ্যা সম্পূর্ণ সঠিক। নিউটনের বলবিদ্যা সৃষ্টি হয়েছিল আলোর বেগের চেয়ে অনেক কম বেগে গতিশীল বস্তুর গতি ব্যাখ্যা করার জন্য। এই বিশেষ ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আলোর বেগের চেয়ে অনেক কম বেগে গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে, নিউটনীয় বলবিদ্যার সূত্র দিয়ে হিসেব করা যাক বা বিশেষ আপেক্ষিকতার সূত্র দিয়ে—ফল প্রায় একই। অবশ্য নিয়মের দিক যদি ধরতে হয় তাহলে এই

বিশেষ ক্ষেত্রেও বিশেষ আপেক্ষিকতার সূত্রের হিসেবে কিছুটা সংশোধন থাকেই থাকে। কিন্তু তা এতই সামান্য যে অনায়াসে উপেক্ষা করা চলে। এ থেকেই বোঝা যায় নিউটনীয় বলবিদ্যার সূত্রের সাহায্যে হিসেব করে জ্যোতিষ্কের গতিবিধি কেন এমন চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। এ থেকে আরো বোঝা যায় কেন নিউটনের বলবিদ্যার পরে দু-শো বছরেরও বেশি সময় লেগেছে বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিষ্কৃত হতে। আরো বোঝা যায় সাধারণ বুদ্ধিতে কেন এই তত্ত্ব এত দুরূহ মনে হয়। কেননা, আপাত বিচারে, এই তত্ত্ব সাধারণ বুদ্ধির সমস্ত অভিজ্ঞতার বিরোধী। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা দরকার যে আলোর বেগের সমান বা প্রায়-সমান বেগে গতিশীল কোনো কিছুই সাধারণ বুদ্ধির আওতায় পড়ে না। তাহলেও অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আলোর প্রায় সমান বেগে ছুটন্ত কণিকার সন্ধান আমরা পেতে পারি মহাজাগতিক রশ্মিতে ও সাইক্লোট্রন যন্ত্রে। এক্ষেত্রে গতির হিসেব নিউটনীয় বলবিদ্যার সূত্র দিয়ে করা হলে ফল পাওয়া যায় অতি উদ্ভট--বাস্তব পরীক্ষাকার্যের ফলের সঙ্গে যা একেবারেই মেলে না।

আলোর বেগের নিত্যতা

কল্পনা করা যাক, কতকগুলো নির্দেশ-ফ্রেম পরস্পরের আপেক্ষিকে গতিশীল রয়েছে। এই বিভিন্ন নির্দেশ-ফ্রেমে আলোর বেগ কী হবে? এই প্রশ্ন নিয়ে আইনস্টাইন সেই ষোলবছর বয়স থেকেই ভেবেছেন।

আইনস্টাইন কল্পনা করলেন, ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ-ফ্রেমের

প্রত্যেকটিতেই যেন মাপনদণ্ড ও ঘড়ি লাগানো। অর্থাৎ প্রত্যেকটি নির্দেশ-ফ্রেম আলাদা আলাদাভাবে এক-একজন পর্যবেক্ষক। যে-কোনো নির্দিষ্ট সময়ে এই পর্যবেক্ষক মাপন-দণ্ড ও ঘড়ির সাহায্যে স্থানাঙ্ক নিরূপণ করতে পারে। অর্থাৎ, অবস্থান জানতে পারে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ব্যাখ্যায় এমনি এক পর্যবেক্ষকের কথা বারে বারে এসেছে। এই পর্যবেক্ষক রয়েছে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায়, অর্থাৎ তার নিজস্ব ফ্রেমের বাইরে অন্য কোনো ফ্রেম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। অনেকটা চারদিক বন্ধ রেলের কামরা বা জাহাজের পোর্টহোলের যাত্রীর মতো (গ্যালিলিও তাঁর আপেক্ষিকতার নিয়ম ব্যাখ্যা করার জন্য এমনি এক জাহাজের যাত্রীর দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন)।

আগের একটি দৃষ্টান্ত আর একবার ধরা যাক। সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ চলছে—সমুদ্রের ঢেউয়ের যা বেগ সেই একই বেগে। জাহাজের ডেকে দাঁড়ানো একজন পর্যবেক্ষকের মনে হবে ঢেউগুলো যেন স্থির। এক্ষেত্রে ঢেউয়ের গতি কথাটা তার কাছে অর্থহীন মনে হতে বাধ্য, কেননা জাহাজের সঙ্গে বিচারে ঢেউয়ের কোনো গতি নেই। এটা শুধু একজন পর্যবেক্ষকের মনে হওয়ার ব্যাপার নয়, যদি আমরা ধরে নিই নির্দেশ-ফ্রেম জাহাজের সঙ্গে যুক্ত তাহলে সেই নির্দেশ-ফ্রেমে সমুদ্রের ঢেউ অবশ্যই গতিহীন।

সমুদ্রের ঢেউ না হয়ে বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ যদি হয়—তাহলে? নির্দিষ্টভাবে বলা যাক, আলো যদি হয়—তাহলে? আলোর বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার। কল্পনা করা যাক জাহাজও এই একই বেগে গতিশীল। এ-অবস্থায় জাহাজের ডেকে দাঁড়ানো পর্যবেক্ষকের মনে হবে আলোর কোনো গতি নেই। বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রকে মনে হবে জাহাজকে ঘিরে থাকা নিশ্চল সমুদ্রের মতো। কিন্তু ঢেউ থাকার দরুন সমুদ্রপৃষ্ঠ যেমন অসমান, বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ থাকার দরুন স্থান বা স্পেসেও তেমনি বিভিন্নতা। কোথাও এই তরঙ্গের চুড়ো, কোথাও তল - যে যেখানে সে সেখানেই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো পরিবর্তন নেই।

এবারে একটা বিষয় ভাবা দরকার। জাহাজের বেগ বাড়াতে

বাড়াতে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছনো গেল যখন বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের কোনো গতি নেই, দেশ বা স্পেস বিশেষ আকার ধারণ করেছে। তখন, উপযুক্ত অপ্‌টিক্যাল যন্ত্রপাতি যদি সঙ্গে থাকে, এই অবস্থার সুযোগ নিয়েই জাহাজের অনপেক্ষ বা পরম বেগ নির্ধারণ করা সম্ভব। তখন সে অনায়াসেই বুঝে নিতে পারে জাহাজটি গতিহীন না গতিশীল।

যদি ধরে নেওয়া হয় এমন একটি অবস্থা সম্ভব (নিউটনের সূত্র অনুসারে অবশ্যই সম্ভব), তাহলে দুটো ব্যাপারে অসম্ভব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এক, ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের তত্ত্ব অনুসারে বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের গতির ফল হচ্ছে আলো। তাহলে গতিহীন বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের কথা ভাবতে হলে ম্যাক্‌সওয়েলের তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায়। দুই, কোনো নির্দেশ-ফ্রেমের মধ্যে থেকে কোনোভাবেই ধারণা করা সম্ভব নয় সেই নির্দেশ-ফ্রেম সিধে-পথে সমবেগে গতিশীল কিনা। এই হচ্ছে আপেক্ষিকতার নিয়ম। এক্ষেত্রে গতিশীলতা ধরা যাচ্ছে। তাহলে তো আপেক্ষিকতার নিয়মই বাতিল হয়ে যায়।

এ এক ভারি গোলমেলে অবস্থা। অথচ আইনস্টাইন গোড়া থেকেই জানতেন, পৃথিবীর আপেক্ষিকে একজন স্থির পর্যবেক্ষকের কাছে যে-নিয়মে সবকিছু ঘটা উচিত, একজন গতিশীল পর্যবেক্ষকের কাছেও তাই ঘটা উচিত। জগতের নিয়ম স্থির পর্যবেক্ষকের কাছেও যা, গতিশীল পর্যবেক্ষকের কাছেও তাই।

আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন, গতিশীল বৈদ্যুতিক ব্যাপারের জগতে বলবিদ্যার দুটি সনাতন নিয়মের সঙ্গে বিরোধ ঘটছে, তাই এই গোলমাল। একটি হচ্ছে বেগের সঙ্গে বেগের যোগ। অপরটি হচ্ছে আপেক্ষিকতার নিয়ম। বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক।

একটি ট্রেন পৃথিবীর আপেক্ষিকে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে ছুটছে। আর সেই ট্রেনের অলিন্দ দিয়ে একজন যাত্রী ট্রেনের আপেক্ষিকে ট্রেনের গতির দিকে ঘণ্টায় ৫ কিলোমিটার বেগে হাঁটছে। তাহলে পৃথিবীর আপেক্ষিকে এই যাত্রীর বেগ দাঁড়ায় ঘণ্টায় ৫০ + ৫ = ৫৫ কিলোমিটার। যাত্রীটি যদি ট্রেনের গতির বিপরীত দিকে হাঁটত তাহলে পৃথিবীর আপেক্ষিকে তার বেগ দাঁড়াত

ঘণ্টায় ৫০ – ৫ = ৪৫ কিলোমিটার।

সেই জাহাজের দৃষ্টান্তও তোলা চলে। তীরের আপেক্ষিকে সমুদ্রের ঢেউ ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বেগে গতিশীল। জাহাজও সেই একই বেগে একই দিকে গতিশীল। তাহলে জাহাজের আপেক্ষিকে ঢেউয়ের বেগ দাঁড়ায় ঘণ্টায় ৩০ – ৩০ = ০ কিলোমিটার। অর্থাৎ, জাহাজের কাছে ঢেউ নিশ্চল।

এই হচ্ছে বেগের সঙ্গে বেগের যোগ। বলবিদ্যার সনাতন নিয়ম অনুসারে আপেক্ষিক বেগ হিসেব করতে গেলে আমরা এইভাবেই সরল যোগ করে থাকি। আসলে আমরা যা করছি তা হচ্ছে একটি নির্দেশ-ফ্রেমের স্থানাঙ্ককে অপর একটি নির্দেশ-ফ্রেমের স্থানাঙ্কে পরিবর্তন। তা করতে গিয়ে ধরে নিচ্ছি যে দুটি ঘটনা একই সময়ে ঘটছে (একই সময়ে ঘটা বা যুগপত্তা, ইংরেজিতে simultaneity)। যেমন, ট্রেনের যাত্রীর নির্দেশ-ফ্রেম ছিল ছুটন্ত ট্রেন। তা থেকে পরিবর্তিত করে আমরা তার নির্দেশ-ফ্রেম করলাম পৃথিবী। দুটি বেগের সরল যোগফল করেই এ-কাজটি সম্পন্ন করা গেল। শুধু ধরে নিলাম যে ছুটন্ত ট্রেনের পর্যবেক্ষকের চোখে সেই যাত্রী ও পৃথিবীর পর্যবেক্ষকের চোখে সেই যাত্রী অভিন্ন। এ-ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় গ্যালিলীয় রূপান্তরণ (বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি)। গ্যালিলীয় রূপান্তরণে দুই বিন্দুর মধ্যে স্পেস বা স্থানগত দূরত্ব সকল নির্দেশ-ফ্রেমেই সমান। যেমন, কোনো একটি নির্দেশ-ফ্রেমে একটি রেখার দুই প্রান্ত-বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি জানা থাকে তাহলে তা থেকে বাহুর দৈর্ঘ্য বার করা যায়। এখন এই রেখাটিকে অন্য কোনো নির্দেশ-ফ্রেমে পরিবর্তিত করার পরে যদি সেখানেও দুই প্রান্ত-বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানা যায় তাহলে তা থেকে রেখার দৈর্ঘ্য বেরিয়ে আসে। এই দুই দৈর্ঘ্য সমান। যেমন, কলকাতার শহীদ মিনার ও দুর্গাপুরের দেশবন্ধু ময়দানের স্থানগত দূরত্ব পৃথিবীর নির্দেশ-ফ্রেমে যা, ছুটন্ত ট্রেনের নির্দেশ-ফ্রেমেও তাই, উড়ন্ত বিমানের নির্দেশ-ফ্রেমেও তাই। যে যেখানে সে সেখানেই। কলকাতা কলকাতাতেই, দুর্গাপুর দুর্গাপুরেই।

দ্বিতীয় নিয়মটি হচ্ছে আপেক্ষিকতার নিয়ম। সরলরেখায় সম-

বেগে গতিশীল একটি জাহাজের মধ্যে কোনোক্রমেই ধরা সম্ভব নয় জাহাজটি গতিশীল কিনা। এই নিয়ম কি আলোর ব্যাপারেও খাটে? জাহাজের পরম গতি কি আলোর ব্যাপার থেকে, বা গতিশীল বিদ্যুতের ব্যাপার থেকে নির্ধারণ করা যায় না? যাওয়া উচিত নয়। আমরা জানি, এমন কোনো উপায় নেই যা দিয়ে পরম গতি নির্ধারিত হতে পারে। কিন্তু কথাটা এই যে সকল নির্দেশ-ফ্রেমেই আলোর একটা বেগ থাকার কথা। আবার, বেগের সঙ্গে বেগ যোগ করার সনাতন নিয়ম যদি মেনে চলতে হয় তাহলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে আলোর বেগ নির্দেশ-ফ্রেম থেকে নির্দেশ-ফ্রেমে পরিবর্তিত হয়ে চলে। তার মানে, গণিতের ভাষায় কথাটা এই দাঁড়ায়—গ্যালিলীয় রূপান্তরণে আলোর বেগ অপরিবর্তনীয় নয়। তাই যদি হয় তাহলে তো আপেক্ষিকতার নিয়মই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। বা, বলতে হয়, আলোর ব্যাপারে আপেক্ষিকতার নিয়ম খাটছে না। এই হচ্ছে ব্যাপার। সনাতন পদার্থবিদ্যার যে দুটি নিয়মকে আমরা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো ধরে নিয়েছিলাম—বেগের সঙ্গে বেগ যোগকরণ ও আপেক্ষিকতার নিয়ম—দেখা যাচ্ছে, গতিশীল বিদ্যুতের জগতে এই দুই নিয়মের সম্পর্ক লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় বিশ্বের একটি নিয়মসিদ্ধ চিত্র যদি আঁকতে হয় তাহলে চিত্রটি হয়ে ওঠে প্রহেলিকাপূর্ণ ও 'উদ্ভট'—প্রচলিত ও স্বতঃপ্রতীয়মান সমস্ত ধারণার বিরোধী।

কোন্ চিত্রটি গ্রহণীয়? হাতেকলমে পরীক্ষাকার্য করে তা স্থির করা দরকার।

এই ঐতিহাসিক পরীক্ষাকার্যটি সম্পন্ন করলেন মাইকেল্‌সন ও মর্‌লে। জানা গেল পৃথিবীর বেগের দরুন আলোর বেগে কোনো হেরফের হয় না। আলোর বেগ নিত্য।

ব্যাপারটা এমন সময়ে ঘটল যখন বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছিলেন, সব কিছুই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে, নতুন করে আর কিছু জানার নেই। ফরাসী গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী লাপলাস তো আরো একশোবছর আগেই গর্ব করে বলেছিলেন, ঈশ্বরকে বাদ দিয়েই জগৎ-ব্যাপারের ব্যাখ্যা সম্ভব এবং নির্দিষ্ট একটি মুহূর্তে যদি বিশ্বের প্রতিটি

বস্তুর অবস্থান জানতে পারা যায় তাহলে নিউটনের সূত্রের সাহায্যে বিশ্বের গোটা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে। নিউটনের সূত্র প্রয়োগ করে নির্ভুলভাবে জানা যাচ্ছিল কি গ্রহ কি উপগ্রহ, কি গ্রহাণু কি ধূমকেতু, প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্কের চালচলন ও গতিবিধি। এবং ধারণায় আনা যাচ্ছিল জগতের বৃহত্তম বস্তু থেকে ক্ষুদ্রতম বস্তুর গতি। বিদ্যুৎচুম্বকত্ব নিয়ে ফ্যারাডের কাজ থেকে পাওয়া গিয়েছিল ডায়নামো ও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ। জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্‌সওয়েলের কাজ থেকে বিদ্যুতের সূত্র ও চুম্বকের ধর্ম এবং বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ। এমনিভাবে সমস্ত দিক থেকেই ধারণা হচ্ছিল যে জগৎ-ব্যাপারের প্রায় সবটাই মানুষ বুঝে ফেলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেণ্ট অফিসের অধিকর্তা এই বলে পদত্যাগপত্র পেশ করেন যে নতুন আর কিছু আবিষ্কার করার নেই। একজন রসায়নবিজ্ঞানী লেখেন, এখন থেকে বিশ্ব সম্পর্কে আর কোনো রহস্য থাকল না। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন মন্তব্য করেন, বিজ্ঞান অবশেষে এক নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গিয়েছে এবং সকল মৌল সমস্যার সমাধান করেছে, এখন যেটুকু কাজ বাকি তা হচ্ছে খুঁটিনাটির ব্যাপারগুলো ঠিক করে নেওয়া।

কিন্তু লর্ড কেলভিনকেও দুটি অনিরূপিত সমস্যার উল্লেখ করতে হয়—একটি বিকিরণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে উদ্ভূত অসুবিধা (এ-বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব), অপরটি আলোর গতি সম্পর্কিত মাইকেল্‌সন-মর্‌লের পরীক্ষাকার্যের ফল। লর্ড কেলভিন বললেন, এই দুটিকে বাদ দিলে বিজ্ঞানের আর ভয় করার কিছু নেই এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তত্ত্বগত ভিত্তির বড়ো রকমের কোনো পরিবর্তন থেকে বিজ্ঞান মুক্ত।

কিন্তু অনেক সময়ে যা ঘটে, আবহাওয়া ভালো থাকার ভবিষ্যদ্বাণী হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়—এক্ষেত্রেও তাই হল। লর্ড কেলভিন যে দুটি টুকরো মেঘের উল্লেখ করেছিলেন মাত্র, তা থেকেই ঘটে গেল বজ্রপাত। বিকিরণ তত্ত্বের অসুবিধা দূর করতে গিয়ে ১৯০০ সালে মাক্‌স প্লাঙ্ক কোয়ান্‌টাম-এর ধারণায় পৌঁছলেন এবং মাইকেল্‌সন-মর্‌লের পরীক্ষাকার্যের ফল চূর্ণ করে দিল বিশ্ব-সম্পর্কিত স্বতঃপ্রতীয়মান ধারণা।

আর এমনি সময়ে, ১৯০৫ সালে, বার্ন-এর পেটেণ্ট অফিসের একজন কর্মচারী এমন এক তত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হলেন যা বিজ্ঞানে আনল আমূল এক বিপ্লব।

এই কর্মচারীর নাম আলবার্ট আইনস্টাইন।

যুগপত্তা ও সময়ের আপেক্ষিকতা

১৯০৫ সালে বার্ন পেটেণ্ট অফিসের এক তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ঘোষণা করলেন, সমবেগের আপেক্ষিক গতিতে গতিশীল সকল বস্তুর বিচারে আলো সকল দিকে সমান বেগে ধাবিত হয়। কি সামনে, কি পাশে, কি আগু-পিছু—সকল দিকে।

কথাটা হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে, দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে সুবিধে হবে। একটি জাহাজ বেগে ছুটছে। জাহাজের ডেক থেকে দুজন সাঁতারু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপরে একই বেগে সাঁতার কেটে একজন চলল জাহাজের সামনের দিকে আর অপরজন জাহাজের পিছনের দিকে। সহজেই বোঝা যায় পিছনের দিকে যে যাচ্ছে সে পৌঁছে যাবে অনেক আগে। কিন্তু সামনের দিকে যে যাচ্ছে তার পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে, কেননা তাকে যেতে হচ্ছে জাহাজের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কিন্তু আলো সম্পর্কে নতুন যে নিয়মের কথা বলা হল সেটি যদি এখানে খাটানো যায় তাহলে বলতে হয়, দুই সাঁতারু একই সময়ে পৌঁছে যাচ্ছে। অর্থাৎ, জাহাজের আপেক্ষিকে দুই সাঁতারুর সমান বেগ। যদি সমান আপেক্ষিক বেগ না হত তাহলে তা থেকে জাহাজের গতির একটা হদিশ পাওয়া যেত। কিন্তু আপেক্ষিক বেগ সমান হওয়ার দরুন এই দুই সাঁতারুর সঙ্গে বিচার করে জাহাজের গতি বোঝা অসম্ভব। জাহাজের গতি একমাত্র ধরা যেতে পারে

তীরের দিকে তাকিয়ে। তীর পিছিয়ে যাচ্ছে, তাই দেখে আমরা বলি জাহাজ চলছে। এখানেও কথা আছে। যদি বলি, চলছে তীর জাহাজের আপেক্ষিকে, তাহলে ভুল বলা হয় না।

এই হচ্ছে আলোর আচরণ। আলোর প্রক্রিয়ায় বস্তুর মধ্যে এমন কিছু ঘটে না যা থেকে বোঝা যেতে পারে বস্তুটি গতিশীল কিনা। আপেক্ষিক গতিশীল বিভিন্ন বস্তুর বিচারে আলো সব জায়গায় সমান বেগে ধাবিত হয়। এ থেকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বের একটি মূল কথা এসে যাচ্ছে : পরস্পারের আপেক্ষিকে সমবেগে গতিশীল সকল নির্দেশতন্ত্রে আলোর বেগ সমান।

আমরা একটি নির্দেশতন্ত্র এঁটে নিতে পারি জাহাজের সঙ্গে। এই নির্দেশতন্ত্রে জাহাজের সমস্ত পদার্থ স্থির। নির্দেশতন্ত্র এঁটে নিতে পারি তীরের সঙ্গে। তখন জাহাজের সমস্ত পদার্থ জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে গতিশীল হয়ে ওঠে। নির্দেশতন্ত্র এঁটে নিতে পারি চন্দ্রের সঙ্গে, সূর্যের সঙ্গে, ধ্রুবতারার সঙ্গে। প্রত্যেকবারেই গতিশীল পদার্থের চিত্র ভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু নির্দেশতন্ত্র যতোই বদলানো যাক না কেন, পদার্থের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন হয় না। কোনো পদার্থ একটি নির্দেশতন্ত্রে হয়তো স্থির, অন্য নির্দেশতন্ত্রে গতিশীল। কিন্তু এই স্থিরতা বা গতিশীলতা, দুই-ই আপেক্ষিক। কোনো একটি নির্দেশতন্ত্রের সঙ্গে বিচার করলে তবেই এই কথাগুলোর সার্থকতা। বস্তুর গতি প্রকাশ করা হয় অন্য বস্তু থেকে সেই বস্তুর দূরত্বের পরিবর্তন দিয়ে। দূরত্ব একই থাকলে স্থিরতা। আভ্যন্তরিক ব্যাপারে কোনো পার্থক্য ঘটে না। পার্থক্য ঘটে না আলোর বেগে।

অতঃপর পরম নির্দেশ-ফ্রেম বলে আর কিছু থাকল না। প্রকৃত গতি ও প্রকৃত বেগ নির্ধারিত হতে পারে এমন কোনো পরম ব্যবস্থার ধারণাটুকু পর্যন্ত লোপ পেল। পৃথিবীকে মনে করা হত স্থির এবং পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত নির্দেশ-ফ্রেমটি ছিল পরম। কোপারনিকাস এই পরম নির্দেশ-ফ্রেমটি সরিয়ে নিয়ে গেলেন পৃথিবী থেকে সূর্যে। কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও প্রমাণ দিলেন, পৃথিবী থেকে দেখা ও পৃথিবীর নির্দেশ-ফ্রেমে হিসেব করা বস্তুর গতি

পরম নয়। এমনিভাবে আপেক্ষিকতার ধারণা ক্রমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আপেক্ষিকতা সম্পর্কে আইনস্টাইনের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে, সম্ভ্রান্ত জার্মান পত্রিকা 'আনালেন ডেয়ার ফিজিক'-এ। প্রবন্ধটির নাম 'গতিশীল বস্তুর বিদ্যুৎগতিবিদ্যা সম্পর্কে'। প্রবন্ধটির শুরুতে আছে সময়ের আপেক্ষিকতা নিয়ে আলোচনা।

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে সময় সম্পর্কে আমরা সকলেই এই ধারণা পোষণ করি যে সময় এক একটানা প্রবাহ, সময়কে ফেরানো যায় না। তবে আমাদের সুবিধের জন্য সময়কে আমরা ভাগ করে নিয়েছি। যা ঘটছে তাকে আমরা বলি 'বর্তমান', যা ঘটে গিয়েছে তাকে 'অতীত' (এই অতীত আমাদের স্মৃতিতে জমা হয়ে থাকে), যা ঘটবে তাকে 'ভবিষ্যৎ'। সময়ের এমনিধারা বিভাগ কোনো একজন মানুষের নয়, সব মানুষের। ফলে সময়কে একটা পরিমাপের মধ্যে আনা গিয়েছে। বা, অন্য ভাষায় বলা চলে, সময়কে যেন আবিষ্কার করা হয়েছে। তবে সময় সম্পর্কে একজন মানুষের ব্যক্তিগত ধারণা আমাদের আলোচনার পক্ষে জরুরী নয়। আমরা ধরব ঘড়ির সময়, যাকে বলা চলে বাস্তব সময়। তবে একথাও ঠিক যে সময় সম্পর্কে ব্যক্তিগত ধারণায় মানুষে মানুষে বিশেষ তফাৎ নেই, ফলে ঘড়ির প্রচলন হতে পেরেছে। ঘড়ি বলতে আমরা বুঝব এমন একটা ব্যাপার যা ফিরে ফিরে হয়ে চলেছে। যেমন, পেণ্ডুলামের দোলন, ব্যালান্স হুইলের মাত্রাবদ্ধ চলন, এমনকি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পর্যন্ত। ফিরে ফিরে হওয়ার ব্যাপারটা যতো নির্ভুলভাবে ঘটে ঘড়ির সময় ততো সঠিক।

১৯০৫ সালের প্রবন্ধে আইনস্টাইন প্রথম যে জরুরী মন্তব্যটি করেছেন তা এই যে যখনই কোনো ঘটনার বাস্তব সময় দেওয়া হয় তখনই তার মধ্যে এসে যায় দুটি ঘটনা যুগপৎ ঘটার ঘোষণা। খোদ ঘটনাটি একটি ঘটনা, আর অন্য ঘটনাটি হচ্ছে ঘড়ির ডায়ালের ওপরে

ঘড়ির কাঁটার বিশেষ অবস্থানে আসা। কথাটা আইনস্টাইন এইভাবে বলেছেন, "যেমন, আমি যখন বলি, 'ট্রেন এখানে সাতটার সময়ে পৌঁছয়' তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে আমার ঘড়ির ছোট কাঁটাটির ৭-চিহ্নিত স্থানে চলে আসা আর ট্রেনের পৌঁছনো একই সময়ে ঘটছে।"* তারপরেই আইনস্টাইন উল্লেখ করলেন যে কথাটার মধ্যে দুটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটা বা যুগপত্তা সম্পর্কে যে ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে তা খুব স্পষ্ট নয়।

আমরা যখন বলি দুটি ঘটনা একই সময়ে ঘটছে বা যুগপৎ ঘটছে তখন আমরা কী করি? আমরা ঘটনার দিকে লক্ষ রাখি ও ঘড়ির দিকে তাকাই, আর তারপরে মিলিয়ে দেখি ঠিক একই সময়ে ঘটনা দুটি ঘটছে কিনা। ঘড়ির কাঁটায় ঘটনাদুটির সময় যদি একই হয় তাহলে আমরা বলি ঘটনাদুটি যুগপৎ। এর চেয়ে বেশি কিছু দেখার বা করার বা ভাবার দরকার বোধ করি না। আসলে কিন্তু হিসাবটা এত সরল নয়। আমরা জানি আলোর বেগের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে (সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার), তার বেশি হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। একটি ঘটনা আমরা তখনই দেখতে পাই যখন সেই ঘটনাস্থল থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পৌঁছয়। ঘটনা দেখার পরেই আমরা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখি এবং স্থির করি কোন সময়ে ঘটনাটি ঘটেছে। অথচ ঘটনাস্থান থেকে চোখ পর্যন্ত দূরত্ব পার হয়ে আসতে হয়েছে আলোকে এবং এই দূরত্ব পার হতে আলোর অবশ্যই কিছুটা সময় (যতো সামান্যই হোক) লেগেছে। অর্থাৎ, আমরা যখন দেখছি তার আগেই ঘটনাটি

---

*পোল্যাণ্ডের পদার্থবিজ্ঞানী লিওপোল্ড ইনফেলড ত্রিশের দশকে কিছুকাল আইনস্টাইনের সহকারী হিসাবে কাজে করেছিলেন। 'কোয়েস্ট' নামে লেখা অসাধারণ আত্মজীবনীতে তিনি ব্যক্তি-মানুষ ও বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সুন্দর এক পরিচয় উপস্থিত করেছেন এবং আইনস্টাইন ও তাঁর যুগ্ম রচনায় 'ইভলিউসন অব ফিজিক্স' বইখানি লেখার কাহিনী বলেছেন। আইনস্টাইনের প্রবন্ধের এই লাইনটি সম্পর্কে লিওপোল্ড ইনফেল্ড মন্তব্য করেছেন, 'বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে এটি হচ্ছে সরলতম বাক্য, আমার গোচরে আজ পর্যন্ত যা এসেছে।'

ঘটে গিয়েছে আর সেই ঘটে যাওয়া ঘটনাটিই আমরা মেলাচ্ছি ঘড়ির সময়ের সঙ্গে। তবে আলোর বেগ এতই বেশি যে আমাদের এই পৃথিবীর জীবনে কোনো ঘটনাস্থান থেকে আমাদের চোখে আলো পৌঁছতে সময় লাগে অতি সামান্য। এতই সামান্য যে অনায়াসে উপেক্ষা করা চলে। কিন্তু একটি ঘটনা যদি ঘটে পৃথিবীতে আর অপর ঘটনা চাঁদে তাহলে কোন নিরিখে আমরা বলব যে ঘটনাদুটি যুগপৎ? কেননা রেডিও তরঙ্গ মারফৎ (যার বেগ আলোর বেগের সমান) চাঁদের খবর পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় লাগ ১·৩ সেকেণ্ডেরও বেশি। একটি উপায় এই হতে পার যে অনুরূপ (কাঁটায় কাঁটায় মেলানো) দুটি ঘড়ির একটি রাখা হল পৃথিবীতে অপরটি চাঁদে আর তারপরে এই দুই ঘড়ির সময় বিচার করে স্থির করা হল ঘটনা দুটি যুগপৎ কিনা।

তবুও সমস্যা থেকে যাচ্ছে। কাঁটায় কাঁটায় মেলানো ঘড়ি যে ঠিক তেমনটিই থাকবে তার নিশ্চয়তা কী? ধরে নেওয়া গেল কলকব্‌জা ও নির্মাণকৌশলের দিক থেকে দুটি ঘড়ি হুবহু একই রকমের। কিন্তু তবুও পদার্থবিজ্ঞানী তো আর শুধু চোখের দেখায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, তিনি চান হাতেকলমে পরীক্ষাকার্য করে যাচাই করে নিতে।

এই পরীক্ষাকার্যটি করার জন্য আইনস্টাইন আলোর বেগের নিত্যতার ব্যাপারটি কাজে লাগালেন। আলোর চলনে একটি অতি সরল নিয়ম আছে—শূন্যস্থান দিয়ে আলোর চলন সরলরেখায় ও নিত্য (constant) বেগে। দুটি ঘড়ি প্রকৃতই অনুরূপ কিনা তা যাচাই করার জন্য এই পরীক্ষাকার্যটি করা যেতে পারে। দুটি ঘড়ি দূরে দূরে রাখা হল। একটি মাপনদণ্ড দিয়ে দুই ঘড়ির মধ্যেকার দূরত্ব মাপা হল আর ঠিক মধ্যবিন্দুটি স্থির করা হল। দুই ঘড়ির কাছে দাঁড়ানো দুই পর্যবেক্ষককে বলা হল কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময়ে (বা অন্য কোনো সময়ে) দুজনে যেন আলোর সংকেত পাঠায়। দুই ঘড়ি থেকে আসা দুই আলোর সংকেত যদি ঠিক একই সময়ে মধ্যবিন্দুতে পৌঁছয় তাহলে প্রমাণ হচ্ছে ঘড়িদুটি অনুরূপ। এই উপায়ে আমরা

দেশের (স্পেসের) সকল স্থানকে ঘিরে অনুরূপ ঘড়ির এক জাল বিস্তার করতে পারি। আপেক্ষিকতার তত্ত্বে আইনস্টাইন তাই করেছিলেন।*

অনুরূপ ঘড়ির এই পরীক্ষাকার্যে জটিলতা কিছু নেই, গোঁড়া নিউটনপন্থী পদার্থবিজ্ঞানীও এটা মেনে নিতে পারেন। কিন্তু বিপ্লব শুরু হল তারপরে। আইনস্টাইন প্রশ্ন তুললেন, ঘড়ি দুটি যদি পরস্পরের বিচারে গতিশীল থাকে তাহলেও কি এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়? যদি যায় তো তার ফল কী? এখানে আইনস্টাইন এমন একটি কথা বললেন যা শুনলে চমকে উঠতে হয়। কিন্তু কথাটি যে যথার্থ তার প্রমাণ বহু পরীক্ষাকার্য থেকে পাওয়া গিয়েছে। কথাটি এই : একজন দর্শকের কাছে আলোর বেগ সবসময়েই সমান—সেই আলোর উৎস যদি দর্শকের বিচারে গতিশীল থাকে, তবুও। তবে আলোর উৎসের গতি অবশ্যই হওয়া চাই সমবেগের। কথাটি ভালো করে বোঝা দরকার, কেননা আইনস্টাইনের তত্ত্বের পক্ষে এই কথাটি, বা নিয়মটি, খুবই জরুরী।

মনে করা যাক একটি বাতি থেকে আলো বেরিয়ে আসছে। সেই আলোর বেগ আমরা নির্ধারণ করেছি। এখন যদি বাতিটা প্রচণ্ড বেগে গতিশীল হয়—দূরের দিকেই হোক বা কাছের দিকেই হোক—বাতি থেকে বেরিয়ে আসা আলোর বেগ একই থাকবে।

আলোর বেগের এই নিত্যতার প্রমাণ সরাসরি পরীক্ষাকার্য থেকেও পাওয়া যেতে পারে। চমৎকার একটি প্রমাণ, আকাশের যুগল-তারা থেকে আসা আলো। যুগল-তারা হচ্ছে জোট-বাঁধা এমন দুটি তারা যারা পরস্পর পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। একটি

---

*বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশিত হবার সময়ে এবং তারপরেও কয়েক বছর আইনস্টাইন ছিলেন বার্ন পেটেন্ট অফিসের অল্প মাইনের কর্মচারী (পুরো বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলেন অনেক পরে), বেশ কষ্ট করেই তাঁকে জীবননির্বাহ করতে হত। সে-সময়ে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার আপেক্ষিকতার তত্ত্বে দেশের (স্পেসের) প্রতিটি বিন্দুতে আমি একটি করে ঘড়ি বসিয়েছি, কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখতে পাচ্ছি আমার নিজের ঘরে একটি ঘড়ির ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে শক্ত।'

ডাম্বেলের দু-দিকের দুটি মুণ্ডি যদি হয় দুটি তারা আর এই ডাম্বেলটি যদি ঘুরতে থাকে তাহলে যুগল-তারার একটা অনুকরণ খাড়া হতে পারে। আমাদের এই পৃথিবী ও চন্দ্রকে অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলে থাকেন যুগল-গ্রহ। দূর থেকে তাকিয়ে দেখলে প্রকৃতই মনে হবে দুটি গ্রহ যেন পরস্পর পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। আকাশের যুগল-তারার কক্ষ কখনো কখনো এমন হয়ে ওঠা খুবই সম্ভব যে একটি তারার গতি পৃথিবীর দিকে, অপর তারার গতি পৃথিবী থেকে দূরের দিকে। অর্থাৎ, একটি তারা কাছে আসছে, অন্যটি দূরে সরে যাচ্ছে। পরীক্ষাকার্যে দেখা গিয়েছে, দুই তারার আলোর বেগ সমান।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আলোর বেগের নিত্যতা প্রমাণ করার জন্য এই পরীক্ষাকার্য ও অন্য আরো অনেক পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয়েছে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশিত হবার পরে। আইনস্টাইন তাঁর 'অনুভূতি' (intuition) ও মনের 'অবাধ সৃজনশীলতা' (free creativity) নিয়ে পূর্বেই ধারণা করতে পেরেছিলেন সঠিক ও সরল নিয়মটি কী। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ থেকেও আলোর বেগের নিত্যতার নিয়মটি পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু তার জন্য অস্বীকার করতে হত নিউটনীয় বলবিদ্যা। আরো অনেক কিছুই হতে পারত। সঠিক সমীকরণ নির্ধারণ করা ছিল 'অনুমানের' বিষয়। আইনস্টাইন নির্ভুল অনুমানটি করতে পেরেছিলেন। আইনস্টাইন বলতেন, কোনো একটি ব্যাপারের মধ্যে তত্ত্বগত সম্ভাবনা থাকে অপেক্ষাকৃত কম ও অপেক্ষাকৃত সরল। সম্পূর্ণ সাধারণ যুক্তির সাহায্যেই সঠিকটিকে বাছাই করা যেতে পারে। আইনস্টাইন তাঁর 'মনের সৃজনশীলতা' নিয়ে এ-কাজটি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন!

তাহলে আমরা এই নিয়মটি পাচ্ছি যে আলোর বেগ নিত্য—আলো যেখান থেকে বেরিয়ে আসছে সেই উৎস যদি গতিশীল থাকে, তবুও; আলো যেখানে এসে পৌঁছচ্ছে সেই গ্রাহক যদি গতিশীল থাকে, তবুও।

এই নিয়মটি হাতে নিয়ে এবারে আমরা আলোচনা করব ঘড়ির

সঙ্গে ঘড়ি মেলাবার সময়ে একটি ঘড়ি যদি গতিশীল থাকে তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়। এ-কাজটি করার জন্য আমাদের পদ্ধতি হবে এই : দু-দিকে দুটি স্থির ঘড়ি থাকবে, দুটি স্থির ঘড়ির মাঝখানে মধ্যবিন্দুতে থাকবে একজন স্থির দর্শক। আর থাকবে একজন গতিশীল দর্শক, সেও থাকবে ঠিক এই মধ্যবিন্দুতে ঠিক সেই সময়ে যখন দুই ঘড়ি থেকে আলোর সংকেত পাঠানো হচ্ছে। এখন আমরা দেখব, দুই ঘড়ির আলোর সংকেত দুই দর্শকের কাছে যুগপৎ কিনা। পদ্ধতিটা একটু বদলে নেওয়া হল, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে। একটি স্থির ঘড়ির সঙ্গে একটি গতিশীল ঘড়ি মেলাতে পারছি।

মধ্যবিন্দুতে থাকা স্থির দর্শকের কাছে দু-দিকের আলোর সংকেত অবশ্যই একই সময়ে পৌঁছচ্ছে। অর্থাৎ, মধ্যবিন্দুতে থাকা স্থির দর্শকের কাছে দুই আলোর সংকেত যুগপৎ। কিন্তু গতিশীল দর্শকের কাছে? এই গতিশীল দর্শক একটি আলোর সংকেতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও আর একটি আলোর সংকেত থেকে দূরে সরে আসছে। তার মানে একদিকের দূরত্ব কমছে ও আর এক দিকের বাড়ছে। আলোর বেগ দু-দিকেই সমান, অতএব যে-দিকে দূরত্ব কমছে সে-দিকে দর্শকের কাছে আলোর সংকেত পৌঁছবে কম সময়ে, যে-দিকে দূরত্ব বাড়ছে সে-দিকে আলোর সংকেত পৌঁছবে বেশি সময়ে। তার মানে, এই গতিশীল দর্শকের মনে হবে, যে-আলোর সংকেতের দিকে সে এগিয়ে যাচ্ছে সেটি আগে, যে-আলোর সংকেত থেকে সে দূরে সরে আসছে সেটি পরে। অর্থাৎ, গতিশীল দর্শকের কাছে দুই আলোর সংকেত যুগপৎ নয়।

এ থেকে কী প্রমাণ হচ্ছে? স্থির দর্শকের কাছে দুটি সংকেত যুগপৎ। বা, স্থির দর্শকের কাছে দুটি ঘড়ি অনুরূপ। গতিশীল দর্শকের কাছে দুটি সংকেত যুগপৎ নয়, আগে-পরে। গতিশীল দর্শকের কাছে দুটি ঘড়ি অনুরূপ নয়, সময়ের দিক থেকে আগে-পরে। তার মানে কী? গতিশীল ফ্রেমের 'সময়' স্থিতিশীল ফ্রেমের সময় থেকে ভিন্ন। এ-ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই। এমনটিই হয়ে থাকে, কেননা আলোর বেগ নিত্য। আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ঘড়ি স্থিতিশীল হোক বা গতিশীল

হোক তার সময় অভিন্ন। আইনস্টাইন বললেন, তা নয়। তারপরে স্থিতিশীল ঘড়ির সঙ্গে গতিশীল ঘড়ির সম্পর্কের চারটি গাণিতিক সূত্রে প্রকাশ করলেন।

বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের একটি প্রধান কথা, সময়ের আপেক্ষিকতা। এ-বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা তোলা যেতে পারে। গতিশীল ঘড়ি স্থিতিশীল ঘড়ির চেয়ে আস্তে চলে, এই কথাটি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব।

এজন্য প্রথমে আমরা একটি অতি সরল ধরনের ঘড়ি তৈরি করে নেব। তাতে থাকবে তুটি মাত্র আয়না, খানিকটা দূরে দূরে বসানো। আর এই তুই আয়নার মধ্যে আলোর একটি সংকেতকে আমরা এমন ভাবে চালিত করেছি যে আলোর সংকেতটি তুই আয়নার মধ্যে পর্যায়-ক্রমে প্রতিফলিত হয়ে হয়ে অনবরত এদিক-ওদিক করছে। আলোর বেগে কখনো হেরফের হয় না, অতএব তুই আয়নার মধ্যে আলোর সংকেতের আনাগোনার মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান থাকে। যেমন থাকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের দোলনে। তার মানে, তুই আয়না ও আলোর সংকেতের এই ব্যবস্থাকে আমরা বলতে পারি ঘড়ি। অতি চমৎকার ঘড়ি, কেননা তুই আয়নার দূরত্বকে বাড়িয়ে-কমিয়ে এই ঘড়ির স্পন্দনকে অভ্রান্ত সময়জ্ঞাপক করা চলে। এবার ধরা যাক, এই তুটি আয়নাকে আমরা একটি আধারের তুই বিপরীত দেয়ালে এঁটে নিয়েছি। আধারটির এমন ব্যবস্থা যে গতিশীল হতে পারে। আধারটিকে এমনভাবে স্থাপন করা হল যাতে আয়নাতুটির একটি থাকে নিচে, অপরটি ওপরে। এমনভাবে যাতে আয়না থেকে প্রতিফলিত আলো খাড়া পথে চলে। তারপরে আধারটিকে অনুভূমিক দিকে (অর্থাৎ খাড়া পথের সমকোণে) গতিশীল করা হল।

কল্পনা করা যাক, আমরা যেন একটি স্থির ফ্রেম থেকে অসাধারণ ঘড়িটি পর্যবেক্ষণ করছি।

ঘড়ি যতোক্ষণ স্থিতিশীল ছিল ততোক্ষণ নিচের আয়না থেকে প্রতিফলিত আলো খাড়া পথে ওপরের আয়নায় পৌঁছেছে, তারপরে ওপরের আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে একই পথে নিচে নেমেছে—এমনি চলেছে তো চলেছেই।

কিন্তু যেই-না আধারটি গতিশীল হল অমনি অন্য চেহারা। নিচের আয়নার প্রতিফলিত আলো-কে ওপরের আয়নায় পৌঁছবার জন্য বেঁকে যেতে হচ্ছে। কেননা, আধার গতিশীল, ওপরের আয়না এগিয়ে যাচ্ছে, আলোর বেগ নির্দিষ্ট। তেমনি বেঁকে যেতে হচ্ছে ওপরের আয়নার প্রতিফলিত আলো-কে নিচের আয়নায় পৌঁছবার জন্য—একই কারণে। সব মিলিয়ে চেহারাটি কী দাঁড়াল? একটি ত্রিভুজের চেহারা। আলোর সংকেত নিচের আয়না থেকে রওনা হয়ে ত্রিভুজের একটি বাহু ধরে ওপরের আয়নায় পৌঁছল। আবার ওপরের আয়না থেকে রওনা হয়ে ত্রিভুজের অপর একটি বাহু ধরে নিচের আয়নায় পৌঁছল। আধারটি যতোক্ষণ স্থিতিশীল ছিল ততোক্ষণ কিন্তু খাড়া ওঠানামা করেছে। সহজেই বোঝা যায় আধারটি গতি-শীল বলে আলোর সংকেতকে আরো বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হচ্ছে। আলোর বেগ নির্দিষ্ট অতএব বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে বেশি সময় লাগছে। তার মানে, আধার গতিশীল হলে আমাদের ঘড়ি আস্তে চলে।

এবারে, মাত্র পিথাগোরাসের উপপাদ্যটির সাহায্য নিয়ে এই দুই ঘড়ির (একটি স্থিতিশীল, অপরটি গতিশীল) মধ্যে একটা সম্পর্ক বার করা যেতে পারে। আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বে এই সম্পর্ককে একটা গাণিতিক সূত্রে প্রকাশ করেছেন। ঘড়ি কি-ভাবে নির্মিত হয়েছে তার ওপরে এই সূত্র কিছুমাত্র নির্ভরশীল নয়। যে-কোনো ঘড়ির বেলায় খাটে, আমাদের এই ঘড়ির বেলাতেও। সূত্রের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার আছে। গতিশীল ঘড়ির বেগ যদি আলোর বেগের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সূত্রটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। কথাটা আমাদের দৃষ্টান্তের ঘড়ির দিকে তাকিয়েও বুঝে নিতে পারি। আধারের বেগ যতোই বাড়ে ততোই আলোর সংকেতের আরো বেশি সময় লাগে নিচের আয়না থেকে ওপরের আয়নায় পৌঁছতে এবং আবার ফিরে আসতে। বেগ বাড়তে বাড়তে যদি আলোর বেগের সমান হয়ে যায়—তখন? নিচের আয়না থেকে রওনা হয়ে আলোর সংকেত কখনোই ওপরের আয়নায় পৌঁছতে পারে না (কেননা ওপরের আয়না আলোর বেগে গতিশীল)। তার

মানে ঘড়ি আস্তে হতে হতে একেবারে চূড়ান্ত-আস্তে—অর্থাৎ, বন্ধ। এই হচ্ছে সীমানা। আইনস্টাইনের তত্ত্বে আলোর বেগই চূড়ান্ত বেগ, বা সর্বোচ্চ বেগ। ষোলবছর বয়সে আইনস্টাইনের কাছে যা হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছিল, এই তার সমাধান। বিশ্বে সর্বোচ্চ বেগ হচ্ছে আলোর বেগ। এই বেগ অতিক্রম করার তো প্রশ্নই নেই। এমনকি, দেখা যাচ্ছে, আলোর বেগের সমান বেগে পৌঁছলেও আলো আর আলো থাকে না, ঘড়ি আর ঘড়ি থাকে না—অতএব তাও অসম্ভব।

এখানে আরো একটি বলার কথা আছে, এবং কথাটির ওপরে জোর দিতে চাই। দুই আয়না ও আলোর সংকেতের ঘড়ির দিকে আমরা তাকিয়েছিলাম নিজেরা একটি স্থির ফ্রেমের মধ্যে থেকে। কিন্তু এমন যদি হয় যে আমরাও রয়েছি সমবেগে গতিশীল একটি ঘড়ির মধ্যে—তাহলে ? সেই আপেক্ষিকতার নিয়ম আমাদের বেলায় নিশ্চয়ই খাটবে। অর্থাৎ, আমরা নিজেরা কিছুতেই ধরতে পারব না যে আমরা গতিশীল আছি। অন্য কোনা গতিশীল ফ্রেমের সঙ্গে বিচার করে শুধু টের পাব আমাদের আপেক্ষিক গতি। আমাদের নিজস্ব.ফ্রেমের মধ্যে এমন কিছু ঘটবে না বা এমন কিছু করতে পারব না যা থেকে আমাদের নিজস্ব গতি জানা যাবে। যদি বলি, আমরা যে ঘড়ির মধ্যে রয়েছি সেই ঘড়ি যদি আস্তে হয়ে যায় সেটাই আমাদের নিজস্ব গতির একটা হদিশ হয়ে ওঠে। তা হতে পারে না। অতএব আমাদের মনে হবে আমাদের ঘড়ি যথার্থ সময় দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের আপেক্ষিকে গতিশীল অন্য কোনো ফ্রেমের ঘড়ি দেখে মনে হবে সেটি আস্তে চলছে।

কথাগুলো যাচাই করার জন্য এখনই যদি আমরা রিস্টওয়াচ-পরা কোনো লোকের পাশ দিয়ে ছুটতে শুরু করি তাহলে কিন্তু ছেলেমানুষি করা হবে। ঘড়ির সময়ে হেরফের হওয়া নিয়ে এই যে এতোক্ষণ ধরে এতসব কথা বলা হল তার সত্যতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যাচাই করা অসম্ভব। বেগ যদি আলোর বেগের (সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার) তুলনীয় মাত্রায় পৌছয় তবেই এই সত্যতা ধরা পড়ে। আমরা আর কতটুকু বেগ অর্জন করতে পারি ? দ্রুতগামী

ট্রেনে ঘণ্টায় দেড়শো কিলোমিটার, বোয়িং বিমানে ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটার, উৎক্ষিপ্ত রকেটে ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটার। এত সামান্য বেগে ঘড়ির সময়ে প্রায় কিছুই হেরফের হবার নয়। আইনস্টাইনের সূত্র থেকে হিসেব করা গিয়েছে, বেগ যদি হয় আলোর বেগের অর্ধেক, অর্থাৎ সেকেণ্ডে দেড় লক্ষ কিলোমিটার, তাহলে ঘড়ির আস্তে হওয়ার মাত্রা ১৩ শতাংশ হতে পারে। এমনকি রকেটের যাত্রীর বেগও ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

বেগ ও ঘড়ির সময়ের হেরফের নিয়ে আইনস্টাইন তাঁর প্রবন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কল্পনা করেছেন, একই ধরনের দুটি ঘড়ির একটি আছে উত্তরমেরুতে, অপরটি বিষুবরেখায়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা আমরা জানি। এই আহ্নিক গতি থাকার দরুন কোনো বিন্দুর বেগ ঘণ্টায় ১৬০০ কিলোমিটার, সে-তুলনায় উত্তরমেরুর বিন্দু প্রায় নিশ্চল। তাই তিনি বলছেন, বেশি বেগে গতিশীল থাকার জন্য বিষুবরেখার ঘড়িটি উত্তরমেরুর ঘড়ির চেয়ে অতি সামান্য হারে আস্তে চলবে।

এ সব দৃষ্টান্ত শুনে মনে হতে পারে অনর্থক জল্পনাকল্পনা করা হচ্ছে। তাই আরো একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা শেষ করছি, যা থেকে বোঝা যাবে বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টান্তটি উচ্চ-শক্তি মৌলিক কণিকা পদার্থবিজ্ঞান থেকে। অধিকাংশ মৌলিক কণিকার প্রকৃতি অস্থির। তারা ক্ষয় হতে হতে শেষপর্যন্ত এক স্থির কণিকার রূপধারণ করে। কণিকাগুলোর আয়ু নির্ধারণ করা হয় 'অর্ধ-জীবন' দিয়ে—অর্থাৎ, অর্ধ-পরিমাণ ক্ষয় হতে যে-সময় লাগে সেই সময়। এই অর্ধ-জীবনের কালকে একধরনের ঘড়িও বলা চলে। এতএব, আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে, গতিশীল কণিকার অর্ধ-জীবন স্থিতিশীল কণিকার অর্ধ-জীবনের চেয়ে দীর্ঘতর হওয়া উচিত। আজকাল ত্বরণসৃষ্টিকারক যন্ত্রে কোটি কোটি গতিশীল কণিকা পাওয়া যায়। এই গতি আলোর গতির প্রায় কাছাকাছি। এমনি গতিশীল কণিকার অর্ধ-জীবনের পরিমাপ নেওয়া হয়েছে। সেই একই কণিকা স্থিতিশীল থাকলে তার অর্ধ-জীবন কত তাও নির্ধারিত হয়েছে। দেখা গিয়েছে গতিশীল কণিকার অর্ধ-জীবন স্থিতিশীল কণিকার

অর্ধ-জীবনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। আর এই হিসেবের ফলাফল আইনস্টাইনের তত্ত্বের হিসেবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়।

এসব কথা প্রথম শুনে হতভম্ভ হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার-স্যাপার এত জটিল, এত সূক্ষ্ম! তারপরে শুনতে শুনতে ভাবতে ভাবতে বোঝা যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালিত হচ্ছে যে নিয়মে তা কত সুন্দর আর কত সরল। কথাটা বোঝাবার জন্য আইনস্টাইন নিজে একটি কথা প্রায়ই বলতেন—ঈশ্বর অণীয়ান (সফিস্‌টিকেটেড), কিন্তু বিদ্বেষপরায়ণ নন (জার্মান ভাষায়, রাফিনীর্ট ইস্ট ডেয়ার হের গোট্‌, আবের বোশাফ্‌ট ইস্ট য়্যার নিখ্‌ট্‌)। আইনস্টাইন সারা জীবন ধরে তাঁর ধ্যানধারণাকে আরও সরলভাবে ও আরও সুন্দর করে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ-প্রসঙ্গে একটি কাহিনী বলা যেতে পারে।

১৯৪৩ সালে চতুর্থ যুদ্ধ ঋণের গ্রন্থ ও গ্রন্থকার কমিটি আইন-স্টাইনের কাছে একটি প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের পাণ্ডুলিপিটি নিলামে তুলে যুদ্ধ-তহবিলে প্রচুর টাকা তোলা হবে এবং তারপরে পাণ্ডুলিপিটি কংগ্রেসের লাইব্রেরিতে রেখে দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবে আইন-স্টাইনের আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু মুশকিল হল এই যে বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের পাণ্ডুলিপিটি সেই বার্ন-এ থাকতেই ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তখন আইনস্টাইন করলেন কি, তাঁর লেখা নতুন একটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি নিলামে তুললেন। সেটি ৫০ লক্ষ ডলারে বিক্রি হল। কিন্তু আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন ক্রেতা একটু হতাশ হয়েছেন। তখন তিনি স্থির করলেন 'আনালেন ডেয়ার ফিজিক' পত্রিকায় প্রকাশিত ৩০ পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি নিজের হাতে কপি করবেন ও সেই কপি নিলামে তুলবেন। সেটি বিক্রি হল ৬৫ লক্ষ ডলারে। প্রবন্ধটি কপি করার সময়ে আইনস্টাইনের সেক্রেটারি শ্রীমতী হেলেন ডুকাস পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিলেন আর আইনস্টাইন লিখছিলেন। লিখতে লিখতে এক জায়গায় মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, প্রকৃতই কি এই লেখা আছে? যখন শুনলেন, প্রকৃতই তাই, মন্তব্য করলেন, এখন তিনি বুঝতে পারছেন কথাটা আরো

সরলভাবে বলা যেতে পারত।

১৯০৫ সালের যে প্রবন্ধে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব উপস্থিত করেন সেটি ঠিক গবেষণামূলক প্রবন্ধের মতো করে লেখা নয়। আজকালকার দিনে কেউ যদি এমনিধারা প্রবন্ধ লেখেন তাহলে সেটি গ্রাহ্য হবে কিনা সন্দেহ। আইনস্টাইনের প্রবন্ধে সমীকরণ ছিল, কিন্তু নিতান্তই সাধারণভাবে। এমন কিছু ধারণা প্রকাশ করা হয়েছিল যার সঙ্গে অন্য বিজ্ঞানীদের গবেষণার পরোক্ষ মিল পাওয়া যেতে পারত—কিন্তু আইনস্টাইনের প্রবন্ধে অন্য কোনো পদার্থবিজ্ঞানীর কাজের উল্লেখ করা হয়নি। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হতে পারে সমকালীন বিজ্ঞানীদের কাজের সঙ্গে আইনস্টাইন আদৌ পরিচিত ছিলেন না। বার্ন পেটেন্ট অফিসের একজন কর্মচারীর পক্ষে তাই হয়তো স্বাভাবিক। তিনি নিজেই বলেছেন, তিরিশ বছর বয়স হবার আগে তিনি কোনো পদার্থবিজ্ঞানী দেখেননি। প্রবন্ধে মাত্র একজনেরই নাম উল্লেখিত—মিকেল্যাঞ্জেলো বেসো।*

*লিওপোল্ড ইন্‌ফেল্ড (পোলদেশীয় পদার্থবিজ্ঞানী) বেশ কিছুকাল আইনস্টাইনকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন ও আইনস্টাইনের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছেন। আইনস্টাইন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানী হিসাবে আইনস্টাইন ছিলেন নিঃসঙ্গ ও একাকী। এদিক থেকে অন্য বিজ্ঞানীদের থেকে তিনি আলাদা। ১৯০৫ সালে যখন তিনি বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশ করেন তখন বিজ্ঞানের জগতে তিনি অপরিচিত। কোনো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেননি, কোনো মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত নন—পেটেন্ট অফিসের কেরানি মাত্র। সত্যিকারের কোনো পদার্থ-বিজ্ঞানীকে চোখে পর্যন্ত দেখেননি। দৃষ্টান্ত হিসেবে আইনস্টাইন অসাধারণ। তাঁর এই বিচ্ছিন্নতা তাঁর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। ধরাবাঁধা পথে তাঁর চিন্তা ধাবিত হয়নি। এই একাকীত্ব, নিজের তৈরি করা সমস্যা নিয়ে এই স্বাধীন চিন্তা, এই ভিড়ের সঙ্গে না-চলা—এই ছিল তাঁর সৃষ্টির সবচেয়ে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। ১৯৩৩ সালে লণ্ডনের অ্যালবার্ট হলে শরণার্থী জার্মান বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে ভাষণ দিতে গিয়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন, লাইটহাউসের কীপারের কাজটি বিজ্ঞানীর পক্ষে বেশ উপযুক্ত, কেননা কাজটি সহজ এবং ফলে চিন্তা ও গবেষণা করার প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায়। মনের দিক থেকে আইনস্টাইন ছিলেন এমনি এক কীপার—ভিড়ের মধ্যে থেকেও একা।

অন্য বিজ্ঞানীদের কাজ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। আমরা বিশেষ করে তুলব 'সময়' সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তার বিষয়টি।

নিউটন ভাবতেন, সময় সর্বত্র একভাবে বয়ে চলেছে, বাইরের কোনো কিছুর সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। সময় পরম ও সত্য। তারই সঙ্গে রয়েছে ব্যবহারিক সময়, যার মাপ নেওয়া হয় গতির সাহায্যে। মাপ নেবার উপায়টি হচ্ছে ঘড়ি, এবং মাপের মাত্রাগুলোকে বলা হয়ে থাকে ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর ইত্যাদি। নিউটন এই দুই সময়ের মধ্যে পার্থক্য টানতে চেয়েছিলেন—ব্যবহারিক সময় ও পরম সময়। ব্যবহারিক সময়ের মাপ পাওয়া যায় ঘড়ি থেকে আর পরম সময় মুখ্যত রয়েছে ঈশ্বরের চেতনায়। কিন্তু একই সময়ে জার্মানির মহান পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ লাইব্‌নিৎস অন্য কথাও বলেছিলেন। তাঁর মতে, পরম সময় ও পরম দেশের বা স্পেসের ধারণা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অর্থহীন। স্পেস হচ্ছে বস্তুর পারস্পরিক বিন্যাস বা সম্পর্ক। নিউটনের মতে, স্পেস ও সময় ঈশ্বর-ব্যতিরেকে নয়, ঈশ্বরই তার কারণ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব থেকেই তার আশু ও প্রয়োজনীয় পরিণতি।

স্পেস ও সময় সম্পর্কে নিউটনের এই ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা পরবর্তী দু-শো বছরে কেউ মনে রাখেনি। এই সময়ে নিউটনের তত্ত্বের সাহায্যে এমন এক যান্ত্রিক কাঠামো খাড়া করা গিয়েছিল যা থেকে গোটা বিশ্বব্যাপারের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল। সময়ের পরমতা ও সত্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেবার কোনো কারণ ঘটেনি।

মুশকিল বাধল যখন ম্যাক্‌সওয়েলের তত্ত্বের বাস্তব প্রমাণ উপস্থিত করলেন হার্ৎস এবং দেখালেন যে শূন্যস্থান দিয়ে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। যান্ত্রিক কাঠামো থেকে এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। তরঙ্গের প্রবাহের জন্য অবশ্যই একটি মাধ্যম চাই। এই চাহিদা থেকেই জন্ম নিল বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত ইথার।

তারপরে আমরা দেখেছি মাইকেল্‌সন-মর্‌লে পরীক্ষাকার্যে ইথারের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর গতির কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। অথচ পরীক্ষাকার্যটি এমনভাবে সম্পন্ন হয়েছিল যে প্রমাণ অবশ্যই

পাওয়া উচিত ছিল। ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য ফিৎসজেরাল্ড ও লোরেন্ৎস আলাদা আলাদাভাবে প্রস্তাব করলেন, গতিশীল বস্তু সংকুচিত হয়। সংকোচনের মাত্রা খুবই কম—বস্তুর বেগের বর্গকে আলোর বেগ দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় সেই মাত্রার। আমাদের পৃথিবীতে সংকোচনের যে-সব মাত্রা দেখি সেখানে সংকোচনের মাত্রা দাঁড়ায় কোটিভাগের একভাগের মতো।

তবে লোরেন্ৎসের কাছে সংকোচনের পরিমাণটা বড়ো কথা ছিল না। তিনি চাইছিলেন বস্তুজগতের একটা কিছু মডেলের মধ্যে এই সংকোচনকে ব্যাখ্যা করতে। চাইছিলেন তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ আঁরি পোঁয়াকারেও (১৮৫৪-১৯১২)।

লোরেন্ৎস এই সংকোচনকে ব্যাখ্যা করলেন বস্তুর বিদ্যুৎচৌম্বক মডেলের ভিত্তিতে। বস্তু হচ্ছে বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকা—ইলেকট্রন। বস্তু গতিশীল হলে এই কণিকাগুলো পরস্পর ক্রিয়াশীল হয় ও সংকোচন ঘটায়। সংকোচনের মাত্রার হদিশ দিয়ে ১৯০৪ সালে তিনি একটি সূত্র উপস্থিত করলেন। তারপরে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরে এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ বোঝা গেল। লোরেন্ৎসকে আইনস্টাইন মনে করতেন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী।

আর পোঁয়াকারে যা বলেছিলেন তা গাণিতিক ভাষায় আপেক্ষিকতারই তত্ত্ব। তিনি কেন যে আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি আবিষ্কার করতে পারলেন না তা ভেবে অনেকে অবাক হয়েছেন। কেননা, ১৯০৪ সালে (আইনস্টাইনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার একবছর আগে) একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে আপেক্ষিকতার নিয়মের মূল কয়েকটি কথা সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। তাঁর কথায়—

> আপেক্ষিতার সূত্র অনুসারে ভৌতিক ব্যাপারের নিয়ম একজন স্থির দর্শকের কাছে যা আর একজন গতিশীল দর্শকের কাছেও তাই। কাজেই এমনি একটি গতিতে আমরাও চালিত কিনা তা জানার কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই

আপেক্ষিকতার সূত্রের দৃষ্টান্ত হিসেবে পোঁয়াকারে তারপরে বিশেষ করে মাইকেলসনের কাজের উল্লেখ করছেন। তারপরে বলছেন, আপেক্ষিকতার সূত্র অবশ্যই ব্যাখ্যা করা দরকার। লোরেন্ৎস তাই করছেন এবং ব্যাখ্যা হিসেবেই সংকোচনের কথা বলেছেন। সময় সম্পর্কে লোরেন্ৎস-এর বক্তব্যের উল্লেখ করে পোঁয়াকারে বলছেন, এই বক্তব্য বুঝতে হলে দুটি ঘটনার একই সময়ে ঘটা বা যুগপত্তার বিশ্লেষণ দরকার। উল্লেখ করছেন, বস্তুর বেগ যদি আলোর বেগের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে লোরেন্ৎস সংকোচনের মাত্রা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে ওঠে। অথচ নিউটনীয় বলবিদ্যা অনুসারে বস্তুর বেগ আলোর বেগের চেয়েও বেশি হতে কোনো বাধা নেই। অতএব নতুন বলবিদ্যা সৃষ্টি করা দরকার, যেখানে বস্তুর বেগ কিছুতেই আলোর বেগে পোঁছতে পারে না।

এতখানি ও এতদূর বলার পরেও পোঁয়াকারে কিন্তু নতুন বলবিদ্যা সৃষ্টি করার দিকে যেতে পারেননি। সে-কাজটি করেন আইনস্টাইন। নতুন বলবিদ্যাকে বেশ শক্তভাবেই দাঁড় করান।

গোড়াতেই পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায় ইথার। ১৯০৫ সালের প্রবন্ধে ইথারের উল্লেখ মাত্র একবার। বিখ্যাত বাক্যটি রয়েছে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে—'আলোক-পরিবাহী ইথারের প্রয়োজন বাহুল্য প্রমাণিত হবে।' অর্থাৎ, আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে দাঁড় করবার জন্য ইথারকে ধরে নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। তেমনি প্রয়োজন নেই পরম স্থির স্পেসের কল্পনাও।

ধরে নিলেন দুটি সত্য : আপেক্ষিকতার সূত্র ও আলোর বেগের নিত্যতা। এই দুটি সত্য বা স্বতঃসিদ্ধের ওপরেই দাঁড় করালেন আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে।

আবার বলছি, বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের জন্য আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে ১. আপেক্ষিকতার সূত্র ও ২. আলোর বেগের নিত্যতা। এই দুটির সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না—নানা পরীক্ষাকার্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি, আরো একবার করা যেতে পারে। নিউটনীয় বলবিদ্যাকে সঠিক বলে ধরে নিলে

মানতেই হয় যে, যে-কোনো ফ্রেমের পক্ষে আলোর বেগে গতিশীল হওয়া সম্ভব। তাই যদি হয় তখন কিন্তু এই ফ্রেমের একজন পর্যবেক্ষকের কাছে আলো আর আলো থাকে না। অথচ আপেক্ষিকতার সূত্র অনুযায়ী আমাদের মানতেই হয় যে একজন পর্যবেক্ষকের কাছে জাগতিক নিয়ম স্থিতিশীল অবস্থাতেও যা, সমবেগে গতিশীল অবস্থাতেও তাই। অর্থাৎ এই বিশেষ পর্যবেক্ষকের কাছে আলোর চেহারা স্থিতিশীল অবস্থায় যা, আলোর বেগে গতিশীল অবস্থাতেও তাই হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। অতএব নিউটনীয় বলবিদ্যা ভুল।

নিউটনীয় বলবিদ্যার একটি প্রধান নিয়ম বেগের সঙ্গে বেগ যোগকরণ। সেই ছুটন্ত ট্রেন ও ট্রেনের অলিন্দ দিয়ে ট্রেনের গতির দিকে হেঁটে চলা যাত্রীর দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যেতে পারে। মাটিতে আঁটা ফ্রেমের পর্যবেক্ষকের কাছে এই যাত্রীর বেগ ট্রেনের বেগ ও যাত্রীর হাঁটার বেগের যোগফলের সমান। কিন্তু এমন যদি হয় যে একটি আলোর রশ্মি ছুটছে আর আলোর বেগের অর্ধেক বেগে একই দিকে ফ্রেমটি গতিশীল। তাহলে বেগের যোগকরণের নিয়ম অনুসারে ফ্রেমের পর্যবেক্ষকের কাছে আলোর রশ্মির বেগ অর্ধেক হয়ে যাওয়া উচিত। তা হয় না। ফ্রেম স্থিতিশীল হোক বা গতিশীল হোক, আলোর বেগ একই থাকে, আলোর বেগ নিত্য।

আইনস্টাইন দেখিয়েছেন, নিউটনীয় বলবিদ্যার এই বেগের সঙ্গে বেগ যোগকরণের নিয়মটি দাঁড়িয়ে আছে যুগপত্তা সম্পর্কে আমাদের ধারণার ওপরে। আমরা যখন বলি দুটি ঘটনা একই সময়ে ঘটছে তখন আর ফ্রেমের বিচার করি না। ধরে নিই যে, যে-কোনো ফ্রেমে এই দুটি ঘটনা যুগপৎ। ধরে নেবার কারণ, সময় আমাদের কাছে পরম। একই সময় একই ভাবে সব জায়গা দিয়ে বয়ে চলেছে। দুটি ঘটনা একটি ফ্রেমে যদি যুগপৎ হয়ে থাকে তো দুটি ফ্রেমেও তাই। নিউটনীয় বলবিদ্যায় সময় পরম। অথচ আইনস্টাইন দেখিয়েছেন, দুটি ঘটনা একটি ফ্রেমে যুগপৎ হতে পারে কিন্তু দুটি ফ্রেমে নাও হতে পারে। বিশেষ করে একটি ফ্রেম যদি স্থিতিশীল হয়, আরেকটি গতিশীল, তাহলে প্রথম ফ্রেমের যুগপৎ ঘটনা দ্বিতীয় ফ্রেমে

কোনোক্রমেই যুগপৎ নয়। অর্থাৎ সময়কে পরম হিসেবে ধরা চলে না। নিউটনীয় বলবিদ্যা এখানেও হার মানছে।

একই বিষয় নিয়ে দু-বার আলোচনা হল, তাতে ক্ষতি নেই। বিষয়টি যদি বুঝতে পারা গিয়ে থাকে তাহলে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি সহজেই বোঝা যাবে।

বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে যদি এক লাইনে সরলভাবে উপস্থিত করতে হয় তাহলে এমনিভাবে বলা চলে: জগতের নিয়ম সমবেগে গতিশীল সকল তন্ত্রে একই রকম। কথাটার মধ্যে গ্যালিলীয় আপেক্ষিকতার নিয়মও এসে যাচ্ছে। আমরা জানি গ্যালিলীয় আপেক্ষিকতার নিয়ম ধরা হয়েছিল কেবল বস্তু জগতের ক্ষেত্রে. বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র সেখানে বিবেচিত হয়নি। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার নিয়মকে বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রেও বিবেচনা করে দেখলেন। তা থেকেই বিবৃত করলেন একটি মৌল বিধি: প্রকৃতির সকল ব্যাপারে, প্রকৃতির সকল নিয়ম পরস্পরের আপেক্ষিকে সমবেগে গতিশীল সকল তন্ত্রে একই রকম হয়ে থাকে।

ওপর-ওপর দেখলে কথাটার মধ্যে চমকপ্রদ কিছু নেই। বিজ্ঞানী বলতে চাইছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক অভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়ম ক্রিয়াশীল। আরো বলতে চাইছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরম ও স্থির নির্দেশ-ফ্রেম বলে কিছু নেই। মহাবিশ্ব এক অস্থির স্থান। মহাবিশ্বের সবকিছুই—নক্ষত্র হোক, নীহারিকা হোক, হোক তারাজগৎ বা গ্যালাক্সি—সবই অবিরাম গতিশীল। কিন্তু এই গতি আমরা শুধু ধরতে পারি

পরস্পরের সঙ্গে বিচার করে। মহাশূন্যে না আছে কোনো দিক, না কোনো সীমানা—এদিক থেকে গতির হদিশ পাবার কোনো নিরিখ পাওয়া যাচ্ছে না। গতি ধরা চলে একমাত্র অন্য কোনো গতিশীল বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখার পরে। সেটা আপেক্ষিক গতি। তাহলে কি মহাকাশে কোনো গতিশীল বস্তুর প্রকৃত বেগ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়? জবাবে বলতে হয়—না। যদি প্রশ্ন ওঠে, আলোকে যদি মাপনদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়—তাহলে? সেটা সম্ভব নয় এই কারণে যে আলোর বেগ সকল অবস্থায় অপরিবর্তনীয়—আলো যেখানে পৌঁছচ্ছে সেই প্রাপক যদি গতিশীল থাকে, তবুও; আলো যেখান থেকে নির্গত হচ্ছে সেই উৎস যদি গতিশীল থাকে, তবুও। বিশ্বজগতে এমন কোনো পরম মানদণ্ড নেই যার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে। এমনকি স্থির স্পেস বা পরম স্পেস বলেও কিছু নেই। আইনস্টাইনের দু-শো বছর আগে লাইব্‌নিৎস যে-কথা বলেছিলেন সেই ভাষায় বলা চলে স্পেস হচ্ছে 'পরস্পরের মধ্যে বস্তুর বিন্যাস বা সম্পর্ক'। বস্তু না থাকলে স্পেস কিছুই নয়।

একই সঙ্গে আইনস্টাইন বাতিল করলেন পরম সময়ের ধারণাও। সময় সম্পর্কে আমরা ভেবে থাকি সারা বিশ্বে একই সময় একই ভাবে চলে আসছে—অনন্ত অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে এক অমোঘ ও অবিচল প্রবাহ। এই ভাবনা কাটানো আমাদের পক্ষে খুবই শক্ত। এই ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারি না বলেই আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আমাদের কাছে দুরূহ মনে হয়।

কিন্তু আসলে সময়ের ধারণা হচ্ছে রঙের ধারণার মতো—অবলোকনের একটা ধরন। চোখের দেখার বাছবিচার না থাকলে যেমন রঙ হয় না, তেমনি ঘটনার দ্বারা চিহ্নিত না হলে সময় হয় না। সময় হচ্ছে ঘটনাবলীর সম্ভাব্য একটা বিন্যাস মাত্র। সময়ের সঙ্গে ঘটনার এই যে সম্পর্ক, বা বলা চলে সময়ের এই যে বিষয়ী-নির্ভরতা, তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন বলছেন,

> একজন ব্যক্তি-মানুষের অভিজ্ঞতা দেখে আমাদের মনে হয় তা যেন কতকগুলো ঘটনার পারম্পর্যে সাজানো। সেখানে আলাদা আলাদা যে-সব ঘটনা আমরা মনে রাখি সেগুলো যেন 'পূর্ববর্তী' ও

'পরবর্তী' ইত্যাদি নিরিখের বিচারে বিন্যস্ত। অতএব ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে থেকে যায় একটি ব্যক্তিগত সময়, বা বিষয়ী-নির্ভর সময়। যদি শুধু এইটুকুই ধরি তাহলে এই সময়কে মাপা যায় না। আমি অবশ্যই প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে সংখ্যা যুক্ত করতে পারি—এমনভাবে যেন পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সংখ্যার চেয়ে পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সংখ্যা বৃহত্তর হয়। এই সংযোগকে আমি নির্দিষ্ট করতে পারি একটি ঘড়ির সাহায্যে, যেখানে তুলনা করা হয় ঘড়ির দ্বারা উপস্থাপিত ঘটনাবলীর বিন্যাসের সঙ্গে ঘটনাবলীর পারম্পর্য। ঘড়ি বলতে আমরা এমন কিছু বুঝি যা থেকে ঘটনাবলীর পারম্পর্য পাওয়া যায় এবং যা গণনা করা যায়।

আমাদের অভিজ্ঞতাকে আমরা অবশ্যই ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি। তখন সময় হয়ে ওঠে ঘড়ি-নির্ভর বা বিষয়-নির্ভর। তখনো কিন্তু এই সময় পরম সময় নয়, কেননা বিশ্বের সর্বত্র সমান ভাবে এই সময় খাটে না। পৃথিবীতে আমরা যে ঘড়ি ব্যবহার করি তার মাপ সৌরমণ্ডলের সঙ্গে বাঁধা। যাকে আমরা বলি ঘণ্টা তা হচ্ছে পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনে পনেরো ডিগ্রী অতিক্রমণের সময়। যাকে আমরা বলি বছর তা হচ্ছে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর সম্পূর্ণ একটি পরিক্রমার সময়। বুধগ্রহে বছরের মাপ ৮৮ দিন, কেননা এই হচ্ছে সূর্যের চারদিকে বুধগ্রহের সম্পূর্ণ একটি পরিক্রমার সময়। বুধগ্রহে দিনের মাপও তার বছরের মাপের প্রায় সমান। কাজেই বুধগ্রহের একজন বাসিন্দার কাছে সময়ের ধারণা ভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু সৌরমণ্ডলের বাইরে যদি চলে যাই—তখন? তখন পৃথিবীর ঘড়ির মাপে সময়ের হিসেব করাটা অর্থহীন। সেখানে সময়ের মাপ নেবার জন্য নতুন একটা নির্দেশ-ফ্রেম দরকার। নির্দেশ-ফ্রেম ছাড়া সময়ের নির্দিষ্ট মাপ থাকবে, এমন তো হতেই পারে না।

নির্দেশ-তন্ত্র না ধরে তেমনি বলা চলে না যে কোনো দুটি ঘটনা একই সময়ে ঘটছে বা যুগপৎ। 'এখন' বা 'এই মুহূর্তে' বলেও কিছু হতে পারে না। এমন হতে পারে যে কলকাতা থেকে আমি বার্লিনের কোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি। দুই শহরে স্থানীয়

ঘড়ির সময় যদিও আলাদা কিন্তু বলতে পারি যে আমরা 'একই সময়ে' কথা বলছি। এটা সম্ভব হল এই কারণে যে আমরা একই গ্রহের বাসিন্দা, আমাদের সময় একই নির্দেশ-তন্ত্রে বাঁধা। কিন্তু ব্যাপারটা অনেক বেশি জটিল হয়ে ওঠে যদি 'এই মুহূর্তে' আমরা জানতে চেষ্টা করি, ধরা যাক, ধ্রুবতারায় কী ঘটছে। ধ্রুবতারা রয়েছে পৃথিবী থেকে ৪০০ আলো-বছর* দূরে। তার মানে, ধ্রুবতারার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় নেয় ৪০০ বছর। আমরা যদি 'এই মুহূর্তে' ধ্রুবতারায় কোনো রেডিও-বার্তা পাঠাই তাহলে সেই বার্তা ধ্রুবতারায় পৌঁছতে সময় নেবে ৪০০ বছর। সেখান থেকে ফিরে আসতে আরো ৪০০ বছর। ধ্রুবতারার দিকে তাকিয়ে আমরা যখন ভাবি 'এখন' বা 'এই মুহূর্তে' ধ্রুবতারাকে আমরা দেখছি তখন আমরা আসলে দেখছি চারশো বছর আগে ধ্রুবতারা থেকে রওনা হওয়া আলো। অর্থাৎ, আমাদের চোখে 'এই মুহূর্তের' ধ্রুবতারা চারশো বছর আগেকার। ঠিক এই মুহূর্তে ধ্রুবতারার অস্তিত্ব আছে কিনা তা আমরা জানতে পারব আরো চারশো বছর পরে।

আমাদের 'এখন' গোটা বিশ্বের 'এখন' হতে পারে না। দুই পৃথক নির্দেশতন্ত্রে দুটি ঘটনা একই সময়ে বা যুগপৎ ঘটছে—একথা বলা অর্থহীন। আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে অকাট্য যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহ এই কথাটি উপস্থিত করেছেন।

আমরা যখন বলি 'এখানে' বা 'এখন' বা 'এইটি', তখন আমি যে একজন ব্যক্তি তার সঙ্গে সম্পর্কটাই প্রধান হয়ে ওঠে। যাকে বলা হয় বিষয়ীনির্ভর। বিজ্ঞানীর বলাটা হওয়া চাই বিষয়নির্ভর। সেজন্য ঘটনার সঙ্গে নির্দেশতন্ত্রের সম্পর্কটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। বস্তু তো নানাভাবে গতিশীল হতে পারে। সেই গতিশীল বস্তুকে অনুধাবন করতে হলে অনেক সময়েই এক নির্দেশতন্ত্র থেকে অন্য নির্দেশতন্ত্রে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে (গ্যালিলীয় রূপান্তরণ নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি)। সবচেয়ে সরল রূপান্তরণের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ছুটন্ত ট্রেন ও ট্রেনের অলিন্দ দিয়ে ট্রেনের

*আলোর বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ৩,০০,০০০, কিলোমিটার। এই বেগে আলো যদি এক বছর ধরে চলে তাহলে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বকে বলা হয় আলোকবর্ষ বা আলো-বছর।

গতির দিকে হেঁটে যাওয়া একজন যাত্রী। ট্রেনের বেগ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার, যাত্রীর বেগ ঘণ্টায় ৫ কিলোমিটার। নির্দেশতন্ত্র যদি হয় ছুটন্ত ট্রেন তাহলে যাত্রীর বেগ ঘণ্টায় ৫ কিলোমিটার। নির্দেশ-তন্ত্র যদি হয় মাটি তাহলে যাত্রীর বেগ ঘণ্টায় ৫০+৫=৫৫ কিলো-মিটার। বেগের সঙ্গে বেগ যোগ করা হচ্ছে।

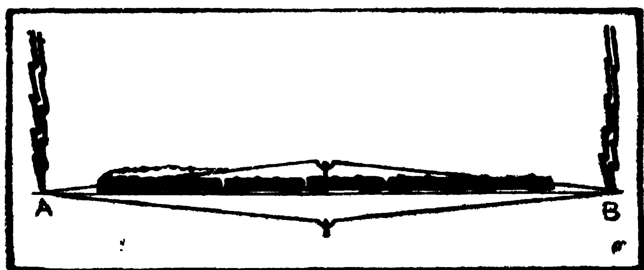
অন্য ধরনের একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। একটি লেভেল-ক্রসিং-এ বিপদসংকেতের ঘন্টি বাজছে এবং শব্দের তরঙ্গ সেকেণ্ডে ৩৬০ মিটার বেগে চারিদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। লেভেল-ক্রসিং-এর দিকে একটি ট্রেন ছুটে আসছে—সেকেণ্ডে ২০ মিটার বেগে। ট্রেন যতো-ক্ষণ ঘন্টির দিকে এগিয়ে আসছে ততোক্ষণ ট্রেনের আপেক্ষিকে শব্দের বেগ হয়ে ওঠে সেকেণ্ডে ৩৬০+২০=৩৮০ মিটার। আর ট্রেন যখন ঘন্টি ছাড়িয়ে দূরে যেতে থাকে তখন থেকে শব্দের বেগ দাঁড়ায় সেকেণ্ডে ৩৪০ মিটার। বেগের সঙ্গে বেগের সরল যোগ করা হচ্ছে। গ্যালিলিওর সময় থেকেই আপেক্ষিক বেগ নির্ধারণ করার এইটেই উপায়। কিন্তু মুশকিল বাধে এই নিয়ম যদি আলোর বেলাতেও মেনে চলতে হয়।

মুশকিল যে কি-রকম তা পরিষ্কার করার জন্য আইনস্টাইন একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এবারেও সেই লেভেল-ক্রসিং। তবে বিপদের সংকেত হিসেবে ঘন্টি বাজছে না, আলোর ঝলক উঠছে। আলোর বেগ সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার (ইংরেজি c অক্ষর দিয়ে আলোর বেগ নির্দেশিত হয়)। এই বেগে আলোর ফলক ছুটছে ট্রেনের দিকে। ট্রেন ছুটে আসছে আলোর ফলকের দিকে। মনে করা যাক ট্রেনের বেগ সেকেণ্ডে v কিলোমিটার। তাহলে বেগের সঙ্গে বেগ যোগ করার সনাতন নিয়ম অনুসারে আলোর ফলকের আপেক্ষিক বেগ হওয়া উচিত সেকেণ্ডে $c+v$ কিলোমিটার। কিন্তু তা হয় না। মাইকেল্‌সন-মর্‌লে পরীক্ষাকার্য থেকে আমরা জানি, আলোর বেগ সবসময়ে সব দিকে একই থেকে যায়। এ-প্রসঙ্গে সেই যুগল-তারার দৃষ্টান্ত আর একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া চলে। একই সময়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসা তারার আলো এবং পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাওয়া তারার আলো।

আলোর বেগ নিত্য। ট্রেনের বেগ যাই হোক না কেন সেই ট্রেনের একজন দর্শকের কাছে সেই আলোর বেগ সবসময়ে একই থেকে যায়। এমনও যদি হয় ট্রেনটি সেকেণ্ডে দু-লক্ষ কিলোমিটার বেগে ছুটছে তখনো কিন্তু সেই ট্রেনের দর্শকের কাছে আলোর বেগ সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার।

এ-এক প্রকাণ্ড হেঁয়ালি। দুটি ব্যাপার ধরে নেওয়া হচ্ছে—১. আলোর বেগের নিত্যতা, ২. বেগের সঙ্গে বেগ যোগকরণ (দুয়ে দুয়ে যেমন চার)। আইনস্টাইন সিদ্ধান্ত করলেন প্রথম ব্যাপারটি বিশ্ব-জগতের এক অমোঘ নিয়ম। কিন্তু দ্বিতীয়টি নয়। দ্বিতীয়টির বেলায় এক নির্দেশ-তন্ত্র থেকে অপর নির্দেশ-তন্ত্রে রূপান্তরণের একটা নতুন নিয়ম বার করা দরকার। এমন নিয়ম—যার সাহায্যে গতিশীল তন্ত্রের সম্পর্ক বিবৃত হতে পারে। এমনভাবে—যার মধ্যে আলো সম্পর্কে জানা তথ্য স্বীকৃতি লাভ করে।

বেগের সঙ্গে বেগ যোগ করার সনাতন নিয়মের মধ্যে যে খুঁত আছে তা স্পষ্ট করার জন্য আইনস্টাইন আরো একটি দৃষ্টান্ত



একই সময়ে দুটি বাজ পড়েছে—একটি A বিন্দুতে, অপরটি B বিন্দুতে। A ও B বিন্দুর ঠিক মাঝখানে একজন দর্শক মাটিতে দাঁড়িয়ে। অপর দর্শক চলন্ত ট্রেনের ছাদে, আর বাজদুটি যখন পড়ছে সে তখন প্রথম দর্শকের ঠিক বরাবর। ট্রেনের গতি A বিন্দুর দিকে। প্রথম দর্শকের কাছে দুই বাজের দুটি ঝলক যুগপৎ, দ্বিতীয় দর্শকের কাছে নয়।

দিয়েছেন। এবারেও সিধে রেলপথ দিয়ে একটি ট্রেন ছুটছে আর একজন পর্যবেক্ষক রেললাইনের ধারে মাটিতে দাঁড়িয়ে। এমন সময়ে

রেলপথের ওপরে দুই পৃথক বিন্দুতে ঠিক একই সময়ে দুটি বাজ পড়ল। খানিকটা অন্যভাবে এই দৃষ্টান্তগুলি নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। আমরা জানি, পর্যবেক্ষক যদি বাজ পড়ার দুটি বিন্দু থেকে সমদূরত্বে থাকে অর্থাৎ ঠিক মাঝখানটিতে থাকে, তাহলে সে ঠিক একই সময়ে বাজের দুটি ঝলক দেখবে। কিন্তু ছুটন্ত ট্রেনের ছাদের ওপরে বসে থাকা দ্বিতীয় একজন পর্যবেক্ষক যদি ঠিক সেই সময়ে প্রথম পর্যবেক্ষকের বরাবর থাকে তাহলেও সে কিন্তু দুটি ঝলক একসঙ্গে দেখতে পায় না।

তার মানে, কথাটা দাঁড়াচ্ছে, বাজের ঝলক স্থির পর্যবেক্ষকের কাছে যুগপৎ, কিন্তু গতিশীল পর্যবেক্ষকের কাছে যুগপৎ নয়।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যুগপত্তাও আপেক্ষিক। আমি যখন বলি 'এখন' বা 'এই মুহূর্ত', সেটা আমারই ব্যাপার—গোটা বিশ্বের নয়। আইনস্টাইন বলছেন, প্রত্যেক নির্দেশতন্ত্রের আছে নিজস্ব বিশেষ সময়। সময়ের ঘোষণায় যতোক্ষণ-না সংশ্লিষ্ট নির্দেশতন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারা যাচ্ছে, ততোক্ষণ সেই ঘটনার সময় সম্পর্কিত বিবৃতি অর্থহীন হয়ে পড়ে। আসলে গণ্ডগোলটা ছিল বেগের সঙ্গে বেগ যোগ করার সেই সনাতন নিয়মেই। সেখানে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ঘটনার স্থায়িত্বকাল নির্দেশতন্ত্রের গতির ওপরে নির্ভরশীল নয়। কথাটা বোঝার জন্য সেই চলন্ত জাহাজ ও চলন্ত যাত্রীর দৃষ্টান্তটি আর একবার ধরা যাক।

সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ চলছে আর সেই জাহাজের ডেকের ওপরে একজন যাত্রী ঘণ্টায় ৩ কিলোমিটার বেগে হাঁটছে। জাহাজের ডেকের ওপরে যদি একটি ঘড়ি রাখা থাকে তাহলে সেই ঘড়ির এক ঘণ্টায় যাত্রী দূরত্ব পার হয় ৩ কিলোমিটার। আর সমুদ্রের ওপরে যদি একটি ঘড়ি রাখা থাকে তাহলে সেই ঘড়ির একঘণ্টাতেও কি যাত্রী একই দূরত্ব পার হয়? সনাতন নিয়ম অনুসারে, হ্যাঁ। আইনস্টাইন বললেন, না। এক্ষেত্রে জাহাজের ডেক হচ্ছে গতিশীল নির্দেশতন্ত্র আর সমুদ্র স্থিতিশীল নির্দেশতন্ত্র। গতিশীল নির্দেশতন্ত্রে দূরত্ব কখনো স্থিতিশীল নির্দেশতন্ত্রের দূরত্বের সমান হতে পারে না। কেননা, সময়ের মতো দূরত্বও একটা আপেক্ষিক ধারণা। নির্দেশ-

তন্ত্রের গতির সঙ্গে সম্পর্কহীন দূরত্ব বলে কিছু থাকতে পারে না।

আইনস্টাইন বললেন, বিশ্বের সকল নির্দেশতন্ত্রে খাটে এমন-ভাবে যদি জাগতিক ব্যাপারকে উপস্থিত করতে হয় তাহলে অবশ্য ধরে নিতে হয় সময় ও দূরত্ব পরিবর্তনশীল। হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী লোরেন্‌ৎস তাঁর সমীকরণে তাই ধরে নিয়েছেন। তাঁর সমীকরণে প্রকাশ পেয়েছে দূরত্ব ও সময়ের সম্পর্ক--গতিশীল নির্দেশতন্ত্র থেকে পাওয়া দূরত্ব ও সময়ের সঙ্গে ও স্থিতিশীল নির্দেশতন্ত্র থেকে পাওয়া দূরত্ব ও সময়ের। এক নির্দেশতন্ত্র থেকে অপর নির্দেশতন্ত্রে নিয়ে যাওয়াকে আগে আমরা বলেছি গ্যালিলীয় রূপান্তরণ। সেখানে বেগের সঙ্গে বেগ যোগ করার সরল নিয়ম চলত। কিন্তু এবারে সময় ও দূরত্ব দুই-ই আপেক্ষিক। এই অবস্থায় এক নির্দেশতন্ত্র থেকে অপর নির্দেশতন্ত্রে নিয়ে যাওয়াকে বলা হচ্ছে লোরেন্‌ৎস রূপান্তরণ।*

* লাইনের ওপর দিয়ে ছুটন্ত ট্রেনকে ধরা যাক একটি গতিশীল নির্দেশ-তন্ত্র। আর লাইনের ধারে মাটি হচ্ছে স্থিতিশীল নির্দেশতন্ত্র। প্রথমটিকে বলা যাক K′, দ্বিতীয়টিকে K। এখন, যে-কোনো ঘটনাকে যে-কোনো নির্দেশতন্ত্রের স্থান-কালের মধ্যে অবশ্যই ধরা চলে। সেজন্য তিনটি স্থানাঙ্ক (x, y, z,) ও সময় (t) জানা দরকার। মনে রাখা দরকার, একই ঘটনাকে এখানে দুই নির্দেশতন্ত্রে দেখা হচ্ছে। K নির্দেশতন্ত্রের বেলায় ধরা যাক স্থানাঙ্ক হচ্ছে x, y, z এবং সময় t। K′ নির্দেশতন্ত্রের বেলায় x′, y′, z′ এবং t′। তাহলে লোরেন্‌ৎস রূপান্তরণের সমীকরণ অনুযায়ী আমরা পাই

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

(v হচ্ছে গতিশীল নির্দেশতন্ত্রের বেগ, এবং c হচ্ছে আলোর বেগ)

$$y' = y$$
$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

লক্ষ্য করার বিষয় c-এর তুলনায় v যদি খুবই ছোট হয় তাহলে ; বা $\frac{v}{c^2}$ নগণ্য হয়ে যায়। তখন :

লোরেন্ৎস রূপান্তরণের ব্যাপারটা ওপরের দৃষ্টান্তের দুটি ঘড়ি থেকে খানিকটা ধারণা করা চলে। একটি ঘড়ি আমরা রেখেছিলাম জাহাজের ডেকে, অপরটি সমুদ্রে। প্রথমটি গতিশীল, দ্বিতীয়টি স্থিতিশীল। আমরা আগে আলোচনা করেছি, গতিশীল ঘড়ি ও স্থিতিশীল ঘড়ি কখনো অনুরূপ হয় না, স্থিতিশীল দর্শকের কাছে গতিশীল ঘড়ি স্থিতিশীল ঘড়ির চেয়ে আস্তে চলে। এ-থেকেই লোরেন্ৎস সংকোচনে আসা যায়। লোরেন্ৎস এই সংকোচনের কথা বলেছিলেন মাইকেল্সন-মর্লে পরীক্ষাকার্যের সমস্যা ব্যাখ্যা করার জন্য। অথচ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে এটা কোনো সমস্যাই নয়—মাইকেল্সন-মর্লে পরীক্ষার ফল যা হওয়া উচিত ঠিক তাই হয়েছে। তবুও লোরেন্ৎস সংকোচন থেকে যাচ্ছে এবং আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বে তাকে সাধারণ একটি রূপ দিয়েছেন।

অতএব আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মূল কথাটি এইভাবে বলতে হয়: লোরেন্ৎস রূপান্তরণের দ্বারা সম্পর্কিত হলে সকল নির্দেশতন্ত্রে প্রকৃতির নিয়ম একই রকম থেকে যায়।

এই সমস্ত কথা আইনস্টাইন তাঁর প্রবন্ধে অতি সরল ও সাধারণ যুক্তিসহকারে উপস্থিত করলেন। সেখানে কোনোরকম জটিল আঁকজোক ছিল না, গবেষণামূলক প্রবন্ধের তৎকালীন রীতি অনুযায়ী যা থাকা উচিত ছিল। তাই গোড়ার দিকে অনেকে বুঝতেই পারেননি আইনস্টাইন কী করতে চাইছেন। আইনস্টাইন আবিষ্কার করলেন বস্তুজগৎ সম্পর্কে কিছু নতুন ও অসাধারণ সত্য। আর প্রবর্তন করলেন বস্তুজগতের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার এক নতুন পথ।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম দেশ ও কাল সম্পর্কে, অর্থাৎ স্পেস ও সময় সম্পর্কে আইনস্টাইন সম্পূর্ণ নতুন

$$x' = x - vt$$
$$y' = y$$
$$z' = z$$
$$t' = t$$

আলোর বেগের নিত্যতা যদি না ধরি, সময় ও দূরত্বের আপেক্ষিকতা যদি না ধরি, তাহলেও শেষের চারটি সমীকরণ পাওয়া যায়।

ধারণা উপস্থিত করছেন। আইনস্টাইনের অসাধারণ ও নতুন আবিষ্কার এই স্পেস ও সময় নিয়েই। বিষয়টি বেশ স্পষ্টভাবেই তুলে ধরা চলে।

স্পেসকে আমরা মাপের মধ্যে আনি কি করে? মাপনদণ্ডের সাহায্যে। সময়কে আমরা মাপের মধ্যে আনি কি করে? ঘড়ির সাহায্যে। কাজেই সময় ও স্পেস সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে প্রকাশ কবতে গিয়ে আইনস্টাইন ঘড়ি ও মাপনদণ্ডের অভাবনীয় কতকগুলো প্রকৃতির কথা উল্লেখ করলেন।

যেমন, ঘড়ি যদি গতিশীল নির্দেশতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে তার চলার ছন্দ স্থিতিশীল ঘড়ির চেয়ে ভিন্ন হয়।

যেমন, একটি মাপনদণ্ড যদি গতিশীল নির্দেশতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে সেই নির্দেশতন্ত্রের বেগ অনুযায়ী মাপনদণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়।

ঘড়ি ও মাপনদণ্ডের এই অদ্ভুত পরিবর্তনগুলো কিন্তু কোনো-ক্রমেই নির্ভর করে না ঘড়ি কি-ভাবে তৈরি হয়েছে তার ওপরে, কিংবা মাপনদণ্ড কি-দিয়ে তৈরি হয়েছে তার ওপরে। ঘড়ি হতে পারে পেণ্ডুলাম ঘড়ি বা স্প্রিং-এর ঘড়ি বা এমনকি বালুর ঘড়ি। মাপনদণ্ড হতে পারে কাঠের রুলার বা ধাতুর স্কেল ও কাপড়ের ফিতে। তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা, ঘড়ির ও মাপনদণ্ডের যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় সেগুলো যান্ত্রিক নয়। ঘড়ি ও মাপনদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে একজন পর্যবেক্ষকও যদি একই নির্দেশতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে সে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করে না। কিন্তু পর্যবেক্ষক যদি স্থিতি-শীল হয় (অর্থাৎ, গতিশীল নির্দেশতন্ত্রের আপেক্ষিকে স্থিতিশীল) তাহলে সে দেখবে তার নিজের স্থিতিশীল ঘড়ির বিচারে গতিশীল ঘড়ি আস্তে হয়ে গিয়েছে, তার নিজের স্থিতিশীল মাপনদণ্ডের বিচারে গতিশীল মাপনদণ্ড সংকুচিত হয়ে গিয়েছে।

আমরা আগেই জেনেছি, ঘড়ি ও মাপনদণ্ড এমন অসাধারণ কাণ্ড করে থাকে এই কারণে যে আলোর বেগ নিত্য। পর্যবেক্ষক যে নির্দেশতন্ত্রেই থাকুক, সে স্থিতিশীল হোক বা গতিশীল হোক, আলোর বেগ তার কাছে সবসময়ে একই রকম। পর্যবেক্ষকের বেগ

যতো বাড়ে তার ঘড়ি ততো আস্তে হয়, তার মাপনদণ্ড ততো সংকুচিত হয়। কতখানি আস্তে বা কতখানি সংকুচিত, সেই মাপটি ধরা পড়ে আপেক্ষিকে স্থিতিশীল একজন পর্যবেক্ষকের কাছে। এবং তার নিয়মটি পাওয়া যায় লোরেন্‌ৎস রূপান্তরণ থেকে। হিসেব করে দেখা হয়েছে, একটি মাপনদণ্ড যদি আলোর বেগের ৯০ শতাংশ বেগে গতিশীল থাকে তাহলে সংকোচনের মাপ হয় তার দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক। বেগ আরো বাড়লে, অর্থাৎ আলোর বেগের ৯০ শতাংশেরও বেশি হতে থাকলে, সংকোচন আরো দ্রুত হয়। মাপনদণ্ডের বেগ আলোর বেগের সমান হওয়া যদি সম্ভব হয় তাহলে সংকোচন হতে হতে মাপনদণ্ড একেবারে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। একই ব্যাপার ঘড়ি সম্পর্কেও। বেগ যতো বাড়ে ঘড়ি ততো আস্তে হয়। বেগ বাড়তে বাড়তে যদি আলোর বেগে পৌঁছয় তাহলে ঘড়িও আস্তে হতে হতে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তার মানে, কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। এতে প্রকাশ পাচ্ছে প্রকৃতির সেই মৌলিক নিয়ম: বিশ্বে আলোর বেগ হচ্ছে সর্বোচ্চ বেগ ও সীমানা-নির্ধারক বেগ।

সাধারণ বুদ্ধি থেকে এসব কথা মেনে নেওয়া বেশ শক্ত। কেননা সনাতন পদার্থবিদ্যা থেকে আমরা শিখেছি—পদার্থের মাপ স্থিতিশীল অবস্থাতে যা গতিশীল অবস্থাতেও তাই, গতির জন্য পদার্থের কোনো সংকোচন ঘটে না। ঘড়ি সম্পর্কেও একই কথা। সনাতন পদার্থবিদ্যা থেকে আমরা শিখেছি—স্থিতিশীল হোক বা গতিশীল হোক, ঘড়ি সবসময়ে একই ছন্দে চলে। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেও তাই মনে হয়। আইনস্টাইন বলছেন, এমনটি যে আমরা ভাবি তার কারণ ছোটবেলা থেকে কতগুলো বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে আমরা বড়ো হয়ে উঠি। আমাদের কাছে যা স্ব-প্রতীয়মান তাই সত্য। বড়ো হবার পরে এই সমস্ত বদ্ধমূল ধারণা হটিয়ে দিয়ে তবে নতুন ধারণা লাভ করতে হয়। আইনস্টাইন কখনো বিনা প্রমাণে কোনো কিছু মেনে নেননি। যা চোখে দেখা যাচ্ছে তাই তাঁর কাছে সত্য ছিল না। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যের আরো কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিলেন।

ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে আমরা ভাবতেই পারি না যে গতিশীল ঘড়ি আস্তে হতে পারে, গতিশীল দণ্ড সংকুচিত হতে পারে। না হওয়াটাই আমাদের কাছে স্বাভাবিক। আইনস্টাইন প্রশ্ন করছেন—কেন আমরা ভাবতে পারি না যে গতিশীল ঘড়ির আস্তে হওয়াটাই স্বাভাবিক? গতিশীল দণ্ডের সংকুচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক? তার কারণ এই যে গতিশীলতার বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি মাত্রায় না পৌঁছলে আস্তে হওয়া বা সংকুচিত হওয়া লক্ষণীয় হয় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন বেগের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। মহাকাশগামী একটা রকেট সেকেণ্ডে ১১ কিলোমিটার বেগে ছুট দেয়। এই বেগও আলোর বেগের কাছে (সেকেণ্ডে তিনলক্ষ কিলোমিটার) অতি সামান্য। এমনি একটি রকেটের ঘড়ি এমন মাত্রায় আস্তে হয় না বা দণ্ড এমন মাত্রায় সংকুচিত হয় না যা মাপা যেতে পারে। লোরেন্‌ৎস রূপান্তরণের সমীকরণ থেকেও দেখা যায়, সাধারণ মাত্রার বেগে দৈর্ঘ্য ও সময়ের পরিবর্তন প্রায় কিছুই নয়। কাজেই, আমাদের এই সাধারণ অভিজ্ঞতার জগতে—যেখানে বেগের মাত্রা আলোর বেগের চেয়ে অনেক অনেক কম—সনাতন পদার্থবিদ্যার নিয়ম পুরোপুরি খাটে। তার মানে, আপেক্ষিকতা সনাতন পদার্থবিদ্যাকে নাকচ করে না—সনাতন পদার্থবিদ্যার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে একটা সীমানা টেনে দেয় মাত্র।

আমাদের অবলোকন এই সীমানার মধ্যে থেকে। যতোটুকু আমরা দেখি তাই সত্য বলে ধরে নিই। অথচ আমাদের এই দেখার জগতে বেগ এতই মন্থর যে বিপুল বেগের সঙ্গে ঘটিত ব্যাপারগুলো আমরা কল্পনাও করতে পারি না। একথা ঠিক যে বিপুল বেগের কোনো জগৎ আমাদের চোখের দেখায় নেই। তাই বলে সেটা ব্যতিক্রমও নয়। আছে পরমাণু-জগৎ, যেখানে কণিকাগুলো বিপুল বেগে ধাবিত। আছে নাক্ষত্র জগৎ যেখানে দেশ ও কাল বিশালতায় মণ্ডিত। বিজ্ঞানীরা সেখানে গবেষণা করছেন এবং প্রমাণ পাচ্ছেন বিপুল বেগের ও বিশাল দেশকালের জগৎকে অনুধাবন করার জন্য নিউটনীয় সূত্র যথেষ্ট নয়। সেজন্য চাই আপেক্ষিকতার তত্ত্ব দিয়ে বিচার। বিজ্ঞানীরা সেই বিচার করছেন এবং প্রমাণ পাচ্ছেন যে

আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলো যথার্থ।

আর্থার এডিংটন তাঁর 'স্পেস টাইম অ্যাণ্ড গ্র্যাভিটেশন' বইয়ে গতি-বরাবর দৈর্ঘ্যের সংকোচন ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সেগুলো এইরকম।

পাঠক মনে করুন তিনি সেকেণ্ডে ২,৫৭,৬০০ কিলোমিটার বেগে (আলোর বেগ সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার) খাড়া উঁচুদিকে ধাবিত হচ্ছেন। এই বেগের বেলায় সংকোচন ঘটবে ঠিক অর্ধমাত্রার। তার মানে, খাড়াভাবে থাকলে প্রতিটি বস্তু সংকুচিত হবে গোড়ায় যা ছিল তার অর্ধেকে।

আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন, মনে করুন আপনি ২ মিটার লম্বা (তখনো আপনি খাড়া দিকে সেকেণ্ডে ২,৫৭,৬০০ কিলোমিটার বেগে ধাবিত হচ্ছেন)। এবারে খাড়া উঠে দাঁড়ান। আপনার দৈর্ঘ্য এবারে গতি বরাবর, অতএব আপনি সংকুচিত হয়ে ১ মিটার হয়ে গিয়েছেন। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা আসুন, প্রমাণ দিচ্ছি। এক-মিটার লম্বা একটি মাপন-দণ্ড নিন। দণ্ডটিকে খাড়া করে ধরুন। তাহলে দণ্ডটি নিশ্চয়ই সংকুচিত হয়ে আধ-মিটার হয়ে গিয়েছে। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন খাড়া হয়ে, এবারে সংকুচিত হয়ে আধ-মিটার হওয়া দণ্ড দিয়ে নিজেকে মাপুন। তখন দেখবেন আপনার দৈর্ঘ্য দুই আধ-মিটার বা এক-মিটার। আপনি নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করে বলে উঠবেন, কই, আমি যখন দণ্ডটিকে ঘুরিয়ে খাড়া করছি তখন তো দেখি না দণ্ডটি লম্বায় অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে? দেখবেন কি করে? আসলে আপনি তো দেখছেন আপনার চোখের রেটিনায় দণ্ডটির একটি প্রতিচ্ছবি মাত্র। খাড়া হয়ে থাকা অবস্থায় আপনার রেটিনাও সংকুচিত হয়ে গিয়েছে, ফলে দু-মিটার দৈর্ঘ্যকে আগে আপনি যতোখানি দেখতেন, এক-মিটার দৈর্ঘ্যকে এখন ততোখানি দেখছেন। কাজেই যতোভাবে পরীক্ষা করতে যান, ফল কিছু অন্যথা হবার নয়। সবকিছু একই রকম বদলে যাচ্ছে—তাই মনে হচ্ছে কিছুই বদলায়নি।

দৈর্ঘ্যের ওপরে গতির ক্রিয়ায় অদ্ভুত একটি পাল্টা-পাল্টি ব্যাপার ঘটে থাকে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটাকে সবচেয়ে ভালো বোঝা যাবে। মনে করা যাক একজন বৈমানিক তার বিমানে সেকেণ্ডে ২,৫৭,০০০ কিলোমিটার বেগে ধাবিত হচ্ছে।

তার বিমানটি এমন যে নড়াচড়া করতে তার কোনো অসুবিধে নেই এবং তার শরীরের দৈর্ঘ্য রয়েছে গতি-বরাবর। এবারে আমরা যদি তার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব প্রস্থে ও বেধে স্বাভাবিক কিন্তু দৈর্ঘ্যে মাত্র এক-মিটার একটি মনুষ্যমূর্তি। বৈমানিক কিন্তু নিজে টের পাচ্ছে না তার চেহারা এমন বদখৎ। আয়নায় তাকিয়ে নিজের চেহারাকে সে স্বাভাবিক-ই দেখে (রেটিনার সংকোচনের দরুন)। কিন্তু নিচের দিকে তাকিয়ে যদি সে আমাদের দেখে তাহলে তার চোখে পড়বে অদ্ভুত এক জাতের মানুষ। মানুষগুলো যেন চিঁড়ে-চ্যাপ্‌টা হয়ে গিয়েছে। একজনের কাঁধ থেকে কাঁধের মাপ ২৫ সেন্টিমিটারের বেশি কিছুতেই নয়, তার সমকোণে দাঁড়ানো অপর একজনের বাড়বৃদ্ধি শুধুই দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে, বেধে নয়। মানুষগুলো ঘুরে দাঁড়ালেই তাদের চেহারা বদলে যাচ্ছে। এ যেন অদ্ভুত এক আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখা—কোনো মানুষই স্বাভাবিক চেহারার নয়।

এমন কাণ্ডকারখানা এমনকি ডীন সুইফ্‌টও কল্পনা করতে পারতেন না। গালিভার মনে করত লিলিপুটরা বামনের জাতি, লিলিপুটরা মনে করত গালিভার একটা দৈত্য। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন যদি হত যে গালিভারের মনে হত লিলিপুটরা বামন আর লিলিপুটদের মনে হত গালিভার বামন—তাহলে? না, এমনকি 'গালিভারের ভ্রমণ'-এর মতো কাল্পনিক কাহিনীতেও এমন ঘটনা চালানো যেত না। অথচ বিজ্ঞানে চলে যাচ্ছে।

এবারে আরো একটু বাড়িয়ে ভাবা যেতে পারে। বিমানের বেগ বাড়তে বাড়তে আলোর বেগের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। গতি-বরাবর দৈর্ঘ্যও ছোট থেকে আরো ছোট হচ্ছে। শেষকালে বিমানের বেগ আলোর বেগে পৌঁছে যেতে দৈর্ঘ্য সংকুচিত হতে হতে হয়ে গেল শূন্য। বৈমানিক ও তার সঙ্গের সমস্ত জিনিস তখন আর তিন-মাত্রার থাকল না (কেননা দৈর্ঘ্য নেই), হয়ে উঠল দুই-মাত্রার। জীবনের প্রক্রিয়া সেই দুই-মাত্রায় কেমনভাবে চলতে পারে সেটুকু ভাবারও কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, কিছুই তখন আর চলছে না। সময়ের চলাও সম্পূর্ণ বন্ধ। তবে মনে রাখা দরকার, এই বিবরণ পৃথিবীর একজন দর্শকের চোখ দিয়ে দেখে। বৈমানিক নিজে কিন্তু টের পায় না অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে। সে বুঝতে পারছে না যে সে নিশ্চল। সে শুধু অপেক্ষা

করছে পরের মুহূর্তটির জন্য। কিন্তু পরের মুহূর্তটি আর আসছে না।

এই যদি অবস্থা হয় তাহলে তো দূরের তারার দিকে পাড়ি দেবারও একটা উপায় মিলতে পারে। মনে করা যাক, একশো-বছরের মতো খাবার-দাবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আলোর বেগে যাত্রা শুরু হল। যাত্রা শেষ হবার কথা স্বাতীনক্ষত্রে। পৃথিবীর সময়ের হিসেবে একশোবছর পার হবার পর স্বাতীনক্ষত্রে পৌঁছনো গেল। কিন্তু আশ্চর্য, পৃথিবীর সময়ের হিসেবে একশোবছর পার হওয়া সত্ত্বেও আলোর বেগে চলা যাত্রীর বয়স কিন্তু একটুও বাড়েনি। তাব যে এই সময়ে খিদে পাওয়া উচিত ছিল, এই বোধও তার নেই। যতোক্ষণ সে আলোর বেগে গতিশীল ততোক্ষণ সে অমর, ততোক্ষণ তার যৌবন অনন্ত। যদি কোনো উপায়ে তার গতি ঘুরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে। কী দেখবে সে পৃথিবীতে ফিরে এসে? পৃথিবীতে কয়েক-শো বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার নিজের বয়স একটি দিনও বাড়েনি।

শক্তি ও ভরের সমতুলতা

আমরা দেখলাম, সময় আপেক্ষিক, দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব আপেক্ষিক। বাকি থাকে ভর। অনুমান করা চলে ভরও আপেক্ষিক। এই অনুমান যথার্থ। ভর প্রকৃতই আপেক্ষিক। গতির অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ভর পরিবর্তিত হয়।

এখানে ভর সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। কাকে বলব ভর (mass), আর কাকে বলব ভার (weight) তা আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। পদার্থের মধ্যে

বস্তুর পরিমাণকেই ভর বলে ধরে নিই। ভর আর ভার প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে ভর হচ্ছে বস্তুর এক মৌলিক ধর্ম। তা হচ্ছে গতির পরিবর্তনকে প্রতিরোধ। একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে কথাটা পরিষ্কার করা যাক।

একটি সাইকেল ও একটি লরি—দুয়ের ওপরেই বল (force) প্রয়োগ করা হল। সাইকেলকে নড়াতে যতোটা বল দরকার, লরিকে নড়াতে তার চেয়ে অনেক বেশি বল দরকার। কারণ, সাইকেলের ভর কম, লরির ভর বেশি। আগে নিউটন নিয়ে আলোচনার সময়ে আমরা বলেছিলাম বস্তুর ওপরে বলপ্রয়োগ করলে ত্বরণ সৃষ্টি হয়। সূত্রটি এই: বল=ভর×ত্বরণ। এ-থেকে বোঝা যায় ত্বরণ দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই হচ্ছে ভর। এই ভরকে বলা হয় জড়ত্বীয় ভর (inertial mass)। আরও এক ধরনের ভর আছে, মহাকর্ষীয় ভর (gravitational mass), তার আলোচনা আমরা পরে তুলব।

তাহলে আমরা দেখলাম, ভর যার বেশি গতির পরিবর্তনে প্রতিরোধ তার বেশি। বিজ্ঞানীদের কাছে এই প্রতিরোধটাই ভরের মাপ। সনাতন পদার্থবিজ্ঞানে ভরের কোনো পরিবর্তন নেই। আমাদের দৃষ্টান্তের লরিটি নিশ্চল হয়ে থাকুক, বা ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলুক, বা ঘণ্টায় ৮০,০০০ কিলোমিটার বেগে মহাকাশে ধাবিত হোক—তার ভর, সনাতন পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে, সবসময়ে একই থেকে যায়।

কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বে বলা হল, গতিশীল বস্তুর ভর কোনোক্রমেই স্থির নয়—একজন দর্শকের আপেক্ষিকে বস্তুর বেগ যতো বাড়ে তার ভরও ততো বাড়ে। সনাতন পদার্থবিজ্ঞানে এই ঘটনা জানা যায়নি তার কারণ আমাদের এই দেখা-শোনার জগতে বস্তুর বেগ অতি সামান্য এবং তার ফলে ভরের বৃদ্ধিও এতই সামান্য যে ধরা পড়ে না। বা, ধরতে হলে যতো সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দরকার তা বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। গতিশীল বস্তুর ভর যে বৃদ্ধি পায় তা লক্ষণীয়ভাবে ধরা পড়ে সেই বস্তুর বেগ যদি হয় আলোর বেগের

কাছাকাছি। *

একজন পদার্থবিজ্ঞানী যখন বলেন বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর ভর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তিনি বলতে চান: বস্তুর বেগ যদি ক্রমেই বাড়তে থাকে, তাহলে দেখা যাবে একই মাত্রার বলপ্রয়োগ করে বস্তুটিকে ত্বরণযুক্ত করা ক্রমেই আরও শক্ত হয়ে উঠছে। বস্তুটি যদি আলোর বেগে পৌঁছতে পারে তাহলে আর কিছুতেই বস্তুটিকে ত্বরণ-যুক্ত করা যাবে না।

বেগ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভর-বৃদ্ধির ব্যাপারটাকে আইনস্টাইন একটি সমীকরণে প্রকাশ করলেন। আমরাও সমীকরণটি উপস্থিত করছি, সামান্য বীজগণিত যাঁরা জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। সমীকরণটি এই:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

এই সমীকরণে m মানে গতিশীল বস্তুর ভর, v মানে গতিশীল বস্তুর বেগ, m_0 মানে স্থিতিশীল অবস্থায় সেই বস্তুর ভর, c মানে আলোর বেগ। এই সমীকরণ থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, বস্তুর বেগ বা v যদি সামান্য হয় (আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার জগতে সব বস্তুর বেগই তাই) তাহলে m ও m_0 সমান হয়ে যায় (তার মানে, গতিশীল বস্তু ও স্থিতিশীল বস্তুর একই ভর)। কিন্তু v যদি c-এর সমান হয় (অর্থাৎ, বস্তুর বেগ যদি আলোর বেগের

*আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে আমরা জানি, গতিশীল বস্তুর দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়। এ-থেকে মনে হতে পারে, গতিশীল বস্তু মাপে ছোট হচ্ছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ভর বাড়ছে—এ কেমন করে সম্ভব? ভর বৃদ্ধি পাওয়া মানে গতির পরিবর্তনে প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাওয়া। মাপে ছোট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এ-ব্যাপারটি ঘটতে পারে। ধরা যাক একটি দণ্ড এমন বেগে গতিশীল যে তার দৈর্ঘ্য অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। তখন তার ভর দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে, ঘনত্ব চার-গুণ। কক্ষপথে পৃথিবীর বেগ (সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার) আলোর বেগের (সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার) দশহাজার-ভাগের একভাগ। এই বেগের দরুন গতির দিকে পৃথিবীর ব্যাস কমে গিয়েছে ৬½ সেন্টিমিটার।

সমান হয়) তাহলে m হয়ে ওঠে অসীম। তার মানে, আলোর বেগে গতিশীল বস্তুর ভর অসীম হয়ে যায়। ভর অসীম হলে গতির বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধও অসীম। এ-থেকে আরো একবার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, কোনো বস্তুর পক্ষে আলোর বেগে গতিশীল হওয়া সম্ভব নয়।

ভর বৃদ্ধি পাওয়ার এই সূত্রটি বাস্তব পরীক্ষাকার্যে নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং পরমাণু-বিজ্ঞানে সার্থকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। আলোর বেগের ৯৯ শতাংশ মাত্রায় (আলোর বেগ সেকেণ্ড ৩, ০০, ০০০ কিলোমিটার, অতএব তার ৯৯ শতাংশ মাত্রার বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ২, ৯৭, ০০০ কিলোমিটার) পৌঁছতে পারে এমন দৃষ্টান্ত পরমাণু-বিজ্ঞানে পাওয়া যায়। যথা, জোরালো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে গতিশীল ইলেকট্রন। বা, তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয়াস থেকে নিঃসৃত বিটা কণিকা। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে-কোনো হিসেব করার সময়ে বিজ্ঞানীরা এই ভরবৃদ্ধির ব্যাপারটাকেও অবশ্যই হিসেবে ধরেন, নইলে হিসেবে ভুল হয়ে যায়। পারমাণবিক কণিকা ত্বরণকারক বা সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণের সময়েও এই ভরবৃদ্ধির ব্যাপারটাকে হিসেবে রাখতে হয়।

এই হচ্ছে আপেক্ষিকতার একটি প্রধান সূত্র—ভরের আপেক্ষিকতা। শুধু ভর নয়, সময় ও দূরত্বও যে আপেক্ষিক তাও আমরা আগে জেনেছি। ভরের আপেক্ষিকতার এই সূত্র থেকে আইনস্টাইন অসাধারণ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। সিদ্ধান্তটি শক্তির (energy) সঙ্গে ভরের সম্পর্ক বিষয়ে, বা, আরো সঠিকভাবে বলতে হলে, সমতুলতার বিষয়ে। বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক।

আইনস্টাইনের যুক্তি অনুসরণ করে কথাটা এইভাবে বলা যেতে পারে। গতিশীল বস্তুর গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভর বাড়ে। গতি হচ্ছে এক ধরনের শক্তি (গতিশক্তি)। গতি বাড়া মানেই শক্তি বাড়া। তাহলে গতিশীল বস্তুর এই যে ভর বাড়া সেটা আসছে এই বেড়ে-যাওয়া শক্তি থেকে। তার মানে কি? কথাটা বড়ো ভয়ানক, শক্তির ভর আছে। তারপরে কয়েকটি সরল গাণিতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই শক্তি ও ভরের মধ্যে একটি সম্পর্ক বার করলেন।

দেখালেন, শক্তির পরিমাপটি যদি হয় E আর সমতুল ভর যদি হয় m তাহলে দুয়ের সম্পর্ক এই সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা চলে :

$$m=\frac{E}{c^2}$$ (c হচ্ছে আলোর বেগ)

আনস্টাইনের ভাষায়, 'যদি কোনো বস্তু থেকে বিকিরণের আকারে E পরিমাণ শক্তি নিঃসৃত হয় তাহলে তার ভর $\frac{E}{c^2}$ পরিমাণে কমে।'

আইনস্টাইন এমন একটি পরমাণু বা কণিকা কল্পনা করেছিলেন যা থেকে বিকিরণ ঘটছে ও তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয় হয়ে চলেছে। আজকাল আমরা তেজস্ক্রিয়তাজনিত ক্ষয়ের বহু দৃষ্টান্ত জানি, কিন্তু ১৯০৫ সালে যখন আইনস্টাইন এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন তখন তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণার সবে সূত্রপাত হচ্ছিল। তবুও তিনি কল্পনার সাহায্যে ক্ষয়-হয়ে-চলা তেজস্ক্রিয় পরমাণুর কল্পনা করতে পেরেছিলেন এবং তাকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছিলেন। এই হচ্ছে আইনস্টাইনের 'চিন্তাঘটিত পরীক্ষাকার্য' এবং এই পরীক্ষা-কার্যে তাঁর সাফল্য ছিল অসাধারণ ও বিস্ময়কর।

আইনস্টাইন বললেন, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দরুন বস্তুর ভর কমে আর বিকিরণের সঙ্গে কিছুটা শক্তি নিঃসৃত হয়। কমে-যাওয়া ভরের মাপটি (m) পাওয়া যায় নিঃসৃত শক্তিকে (E) আলোর বর্গ (c^2) দিয়ে ভাগ করে অর্থাৎ,

$$m=\frac{E}{c^2}$$

এ-থেকেই পাওয়া যায় আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সমীকরণ :

$$E=mc^2$$

(E হচ্ছে শক্তি, আর্গ-এ ; m হচ্ছে ভর, গ্রামে ; c হচ্ছে আলোর বেগ, সেকেণ্ড-সেন্টিমিটারে।)

১৯০৫ সালে 'আনালেন ডেয়ার ফিজিক' পত্রিকায় প্রকাশিত যে প্রবন্ধে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই প্রবন্ধে কিন্তু এই সূত্রের উল্লেখ ছিল না। সূত্রটি তিনি প্রকাশ করেন একই পত্রিকায় একই সালে প্রকাশিত তিনপৃষ্ঠার পৃথক একটি

প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির নাম, 'নিহিত শক্তির উপরে কি বস্তুর জড়ত্ব নির্ভর করে?' এই প্রবন্ধেও গাণিতিক আঁকজোক প্রায় না-থাকার মতো। এই প্রবন্ধের শেষে একটি বিনীত নিবেদন আছে—'যে-সব বস্তুর নিহিত শক্তি উচ্চমাত্রায় পরিবর্তনশীল (যেমন রেডিয়াম লবণ) সেখানে এই তত্ত্বটি সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা অসম্ভব নাও হতে পারে।' পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন বিনয়ের দৃষ্টান্ত জুটি নেই।

আইনস্টাইনের এই সমীকরণ ($E=mc^2$) থেকে শক্তির এক নতুন ও অজানা উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল। যে-কোনো বস্তুর কিছু ভর (m) থাকবেই। আর ভর থাকা মানেই শক্তিবিশিষ্ট হওয়া (mc^2)। আলোর বেগ অতি বিপুল, অতএব শক্তির পরিমাণও অতি বিপুল। একটি দৃষ্টান্ত দিলে এই বিপুলতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হওয়া সম্ভব। এক কিলোগ্রাম কয়লা যদি সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে তা থেকে পাওয়া যেতে পারে ২৫ শত-কোটি কিলোওআট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ। পরমাণু-বোমা তৈরি করার ব্যাপারে এই সমীকরণটি যে কতবড়ো ভূমিকা নিয়েছিল সে-কথা আমরা জানি।

আইনস্টাইনের এই সমীকরণ ($E=mc^2$) থেকে পদার্থবিজ্ঞানের বহু রহস্যের জবাব পাওয়া গেল। জানা গেল কি-ভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিপুল বেগে কণিকা নিঃসৃত হয় এবং লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নিঃসরণ চলতে থাকে। জানা গেল কি-ভাবে সূর্য ও তারা কোটি কোটি বছর ধরে আলো ও উত্তাপ বিকিরণ করছে। জানা গেল পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে কী বিপুল শক্তি ধরা আছে।

আর সবচেয়ে বড়ো এই কথাটি জানা গেল যে বস্তু ও শক্তি পৃথক কিছু নয়—সমতুল। আপেক্ষিকতার আগে দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে ধরা হত। বস্তু নিষ্ক্রিয়, বস্তুকে ধরা ও দেখা যায়, বস্তুর আছে ভর। শক্তি সক্রিয়, শক্তিকে দেখা যায় না, শক্তি ভরহীন। বস্তু ও শক্তিকে পৃথক পৃথকভাবে অক্ষয় মনে করা হত। দুটি স্বতন্ত্র সূত্রগ্রাহ্য ছিল—বস্তুর নিত্যতার সূত্র ও শক্তির নিত্যতার সূত্র। বস্তুর নিত্যতার সূত্রটি এই যে, কোনো একটি তন্ত্রে বস্তু সৃষ্টি করা যায় না

বা ধ্বংস করা যায় না। শক্তির নিত্যতার সূত্রটি এই যে, কোনো একটি তন্ত্রে শক্তি সৃষ্টি করা যায় না বা ধ্বংস করা যায় না। আপেক্ষিকতার তত্ত্বে এই দুটি সূত্র মিলিয়ে একটি সূত্র দাঁড় করানো হয়েছে। সেটি এই যে, কোনো একটি তন্ত্রে বস্তু ও শক্তির সমষ্টি নিত্য। তার মানে, বস্তু ও শক্তি পৃথক ও স্বতন্ত্র নয়—সমতুল। বস্তুও শক্তি, শক্তিও বস্তু। অবস্থাটি বস্তুও হতে পারে, শক্তিও হতে পারে। যাই হোক না কেন, তা চিরন্তন নয়—সাময়িক। বস্তু হচ্ছে ঘনীভূত শক্তি। বস্তুও নিত্য নয়, শক্তিও নিত্য নয়—নিত্য হচ্ছে দুয়ের সমষ্টি।

বস্তু ও শক্তির সমতুলতার এই সূত্র থেকে প্রকৃতির অনেক রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল। যেমন, তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে বস্তু, কিছুটা বিকিরণ, একভাবে দেখলে তা কণিকার সমষ্টি, অন্যভাবে দেখলে তরঙ্গের সমষ্টি—সমস্ত ব্যাপারটাকেই এই সূত্র দিয়ে আরো ভালোভাবে বোঝা গেল। যেমন, ইলেকট্রন বস্তুও বটে, বিদ্যুৎও বটে। এই দ্বৈত ভূমিকা আরো স্পষ্ট হল। প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে বটে কিন্তু সবকিছুর মধ্যে রয়েছে একই বাস্তবতা বস্তু ও শক্তির সমতুলতা। আলাদা আলাদাভাবে কোনটি কী, এ-প্রশ্ন করার দরকার নেই। কেননা, বস্তু হয়ে উঠতে পারে শক্তি, শক্তি হয়ে উঠতে পারে বস্তু। বস্তু যদি পুরো ভর খুইয়ে আলোর সমান বেগে ধাবিত হয় তাহলে আমরা তার নাম দিই বিকিরণ বা শক্তি। আমরা এখন জানি, সম্প্রতিকালে এমন সব 'মৌলিক কণিকা' আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণ ভর খুইয়ে সম্পূর্ণভাবে বিকিরণশীল শক্তি হয়ে যায়। মূল কণিকাটি আপনা থেকেই ভেঙে পড়তে শুরু করে এবং তার সমস্ত ভর রূপান্তরিত হয় শক্তিতে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা শক্তি হিসেবে পাই কিছু গামারশ্মির বিকিরণ। দেখা গিয়েছে, এই বিকিরণের মধ্যে মোট শক্তি কণিকার ভরের মধ্যে ধরা মোট শক্তির সমান। সম্পূর্ণ ভর সম্পূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার আরো চমৎকার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি কণিকা পরস্পর যুক্ত হয়, যুক্ত হওয়া মাত্রই একে অপরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে—তখন দুটি কণিকাই বিলীন হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত

হিসেবে বলা যেতে পারে, এমনি দুটি কণিকার একটি হতে পারে ইলেকট্রন, অপরটি তার বিপরীত-কণিকা পজিট্রন।* এই দুটি কণিকা যুক্ত হওয়া মাত্রই একে অপরকে বিলীন করে দেয়।

আরো একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউসন বা একীভবন।** সরল একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। একটি নিউট্রনের সঙ্গে একটি প্রোটোন যুক্ত হল এবং তার ফলে গঠিত হল ডিউটেরন বা ভারী হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে আছে একটি প্রোটোন নিয়ে গঠিত নিউক্লিয়াস ও একটি ইলেকট্রন। কিন্তু এই নিউক্লিয়াসে প্রোটোনের সঙ্গে যদি একটি নিউট্রন যুক্ত হয় তাহলে আমরা পাই ডিউটেরন একটি প্রোটোন ও একটি নিউট্রন নিয়ে গঠিত নিউক্লিয়াস ও একটি ইলেকট্রন। এই মিলনের সময়ে কিছু শক্তি নিঃসৃত হয়। আইনস্টাইনের সূত্র থেকে আমরা জানি শক্তি নিঃসৃত হওয়া মানেই ভর কমে যাওয়া।

*পজিট্রন আবিষ্কৃত হয় মহাজাগতিক রশ্মিতে, ১৯৩২ সালে। আবিষ্কারক আমেরিকার পদার্থ বিজ্ঞানী সি ডি অ্যাণ্ডারসন (১৯৩৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)। তার আগে, ১৯৩০ সালে, ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী পি এ এম ডিরাক পজিট্রনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ডিরাক-ই প্রথম যথার্থ মিলন ঘটিয়েছিলেন আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সঙ্গে কোয়ানটাম তত্ত্বের (কোয়ানটাম তত্ত্ব নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব) এবং আবিষ্কার করেছিলেন যে প্রত্যেক কণিকার অবশ্যই বিপরীত-কণিকা আছে।

** পরমাণুর গঠন এইরকম: কেন্দ্রীয় অংশে রয়েছে নিউক্লিয়াস। তাকে ঘিরে রয়েছে সূর্যকে ঘিরে থাকা গ্রহের মতো এক বা একাধিক নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রন। পরমাণুর ভর প্রায় সবটাই রয়েছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে। নিউক্লিয়াসের গঠনে আছে প্রায় সমান ভরের দুটি ভিন্ন ধরনের স্থায়ী কণিকা—প্রোটোন ও নিউট্রন। প্রোটোন পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট এবং নিউট্রন বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জ ও প্রোটোনের পজিটিভ চার্জ মাত্রার দিক থেকে সমান। অতএব, বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ একটি পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের প্রোটোন ও নিউক্লিয়াসকে ঘিরে থাকা ইলেকট্রন সমান-সংখ্যক হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রেও তাই হয়। তার মানে, আমরা বলতে পারি, ডিউটেরনের ভর তার অংশগুলির—অর্থাৎ প্রোটোন ও নিউট্রনের—ভরের সমষ্টির চেয়ে কম। ভরের এই যে পার্থক্য তাকে বলা হয় ডিউটেরনের 'বন্ধনী শক্তি'। প্রোটোন ও নিউট্রনের এমনি একীভবন বা ফিউসন ঘটিয়ে সমস্ত নিউক্লিয়াস গড়ে তোলা যেতে পারে। নিউক্লিয়াস যদি স্থায়ী হয় তাহলে অবশ্যই নিউক্লিয়াসের ভর তার অংশগুলির ভরের সমষ্টির চেয়ে কম হবে। সনাতন পদার্থবিদ্যায় এ-ব্যাপারটার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যেত না। কিন্তু আইনস্টাইনের সূত্র থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, তাই তো হওয়া উচিত, ফিউসন ঘটিয়ে নিউক্লিয়াস গড়ার সময়েই কিছু শক্তি—অর্থাৎ ভর—বেরিয়ে গিয়েছে।

নিউক্লিয়ার ফিউসন আরো একটি সমস্যার সমাধান করেছে। আমরা বুঝতে পেরেছি, কেন এবং কি-ভাবে তারা থেকে ও আমাদের সূর্য থেকে কোটি কোটি বছর ধরে এমন বিপুল পরিমাণ শক্তি নিঃসৃত হয়ে চলেছে। আসলে তারার মধ্যে ও সূর্যের মধ্যে ঘটছে ফিউসন-প্রক্রিয়া। তার ফলে নতুন নিউক্লিয়াস গড়ে উঠছে এবং খোয়া যাচ্ছে কিছু ভর। তারা ও সূর্যের শক্তি উৎপাদন এই খোয়া-যাওয়া ভর থেকে। ভর খোয়া যায় এতই সামান্য পরিমাণে যে শত-শত কোটি বছর ধরে তারা ও সূর্য জ্বলন্ত অবস্থায় থাকতে পারে।

১৯০৫ সালে লেখা আইনস্টাইনের তিনপৃষ্ঠার প্রবন্ধটি আধুনিক পদার্থবিদ্যায় সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে।

প্রাগ ও জুরিখ

আইনস্টাইনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার একবছর পরে, ১৯০৬ সালে, বার্ন পেটেন্ট অফিসে আইনস্টাইনের সামান্য পদোন্নতি হল। এই দুই ঘটনার মধ্যে এমনিতে কোনো সম্পর্ক নেই। পেটেন্ট অফিসের

কর্তাব্যক্তিরা জানতেন না অফিসের বাইরে আইনস্টাইন কি করছেন। কিন্তু বাইরের বিজ্ঞানীমহলে আইনস্টাইনের প্রবন্ধ নিয়ে আগ্রহ তৈরি হচ্ছিল। পোলদেশীয় পদার্থবিজ্ঞানী ভিট্‌কোভস্কি আইনস্টাইনকে বললেন, 'নতুন এক কোপারনিকাস'। নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)-এর জন্ম পোল্যাণ্ডে, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তাই পোলদেশীয় একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে কাউকে কোপারনিকাস বলা মানে তাঁকে সবচেয়ে বেশি সম্মান দেখানো। তার চেয়েও বড়ো কথা, আইনস্টাইনের প্রবন্ধ সে-সময়ের সবচেয়ে সম্মানিত দুই বিজ্ঞানীর মনোযোগ আকর্ষণ করল—মাক্‌স প্লাঙ্ক (১৮৫৮-১৯৪৭) ও হেনড্রিক লোরেন্‌ৎস (১৮৫৩-১৯১৮)। মাক্‌স প্লাঙ্ক আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তারপর থেকে দুজনে আজীবন বন্ধু ছিলেন। এমনিভাবেই আইনস্টাইনের আজীবন বন্ধু হয়েছিলেন কোয়ানটাম পদার্থবিজ্ঞানী মাক্‌স বর্ন (১৮৮২-১৯৭০)। পদার্থবিদ্যার একটি সভায় যোগ দিতে গিয়ে তিনি একজন অধ্যাপকের মুখে আইনস্টাইনের প্রবন্ধের কথা শোনেন এবং তক্ষুনি উঠে গিয়ে লাইব্রেরির তাক থেকে 'আনালেন ডেয়ার ফিজিক' (পদার্থ বিদ্যার বর্ষপঞ্জী) পত্রিকার সপ্তদশ খণ্ডটি নামিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন প্রবন্ধটির বিরাট তাৎপর্য। পরে তিনি নিজেও আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন।

পোঁয়াকারে কিন্তু আপেক্ষিকতার সূত্র মানতে পারেননি। ১৯০৫ সালের পরে যতোদিন তিনি বেঁচে ছিলেন (১৯১২), আপেক্ষিকতার সূত্র নিয়ে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন। কখনো আইনস্টাইনের নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু ১৯১১ সালে জুরিখ পলিটেকনিকে একটি কাজের জন্য যখন আইনস্টাইনের নাম বিবেচিত হচ্ছিল তখন তিনি আইনস্টাইনের 'মৌলিক চিন্তা', 'পাণ্ডিত্য' ইত্যাদির সপ্রশংস উল্লেখ করে একটি সুপারিশ-পত্র পাঠান।

অন্যদিকে লোরেন্‌ৎস আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন খানিকটা সময় নিয়ে। তিনি থাকতেন হল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর লীডেন-এ—খুবই তরুণ বয়স থেকে ১৯২৮ সালে মৃত্যু পর্যন্ত। ১৯১৫ সালে যখন তাঁর বয়স বাষট্টি তখন তিনি তাঁর

বিখ্যাত বই 'ইলেকট্রনের তত্ত্ব'-এ একটি পাদটীকা যোগ করেন। বলেন, এখন যদি এই বইয়ের শেষ অধ্যায়টি আবার নতুন করে লিখতে হয় তাহলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে তিনি অনেক বেশি প্রাধান্য দেবেন। কেননা, আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বে বিদ্যুৎচৌম্বক ব্যাপারের তত্ত্বটি এমন সরলভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন যা তিনি পারেননি। তারপরে সময় সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণার ভুল স্বীকার করেছেন।

এই পাদটীকাটি লোরেন্‌ৎস যখন লেখেন তখন তাঁর বয়স বাষট্টি। আসলে বয়সটাও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাইকেল্‌সন-মর্‌লে পরীক্ষাকার্য যখন সম্পন্ন হয় এবং পদার্থবিজ্ঞানে সংকট দেখা দেয় তখন পোঁয়াকারে ও লোরেন্‌ৎস দুজনেই চল্লিশের কোঠার শেষদিকে। তাঁরা এতবেশ জানতেন ও কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা ছিলেন যে সনাতন পদার্থবিদ্যা বর্জন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আসলে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার যা-কিছু বিরাট আবিষ্কার, সবই করেছেন ত্রিশের নিচের বিজ্ঞানীরা—দু-একটি ক্ষেত্র বাদে। বৃদ্ধরা না পেরেছেন মেনে নিতে, না পেরেছেন এমনকি লোরেন্‌ৎস-এর মতো নমনীয় হতে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লোরেন্‌ৎস ইথারের কথা বলতেন, কেননা ইথারকে ধরে নেওয়াটাই সুবিধের ছিল, কিন্তু ১৯১৯ সালের সেপ্‌টেম্বরে তিনিই আবার সবার আগে আইনস্টাইনকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ সূর্যগ্রহণ অভিযানে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। লোরেন্‌ৎস ও আইনস্টাইন—এই দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে বয়সের ও মানসিকতার পার্থক্য সত্ত্বেও গভীর বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে উঠেছিল। আইনস্টাইন নিজে যতোদিন বেঁচে ছিলেন লোরেন্‌ৎস-এর উচ্চপ্রশংসা করে গিয়েছেন।

অ্যালবার্ট মাইকেলসনকেও আইনস্টাইন গভীর শ্রদ্ধা করতেন। মাইকেলসন কিন্তু আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আদৌ পছন্দ করতেন না। এবং একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। মাত্র একবার মাইকেলসনের সঙ্গে আইনস্টাইনের দেখা হয়েছিল, ১৯৩১ সালে। আইনস্টাইনকে তিনি বলেছিলেন, তাঁর পরীক্ষাকার্য থেকে এমন একটা 'দানবের' জন্ম

হয়েছে দেখে তিনি দুঃখবোধ করছেন।

বার্ন পেটেণ্ট অফিসের সাধারণ একজন কর্মচারীর হাত থেকে এমন অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিজ্ঞানীমহলকে চমকিত করল। বিশেষ করে সুইস পদার্থবিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, আইনস্টাইনের মতো এক প্রতিভার পেটেণ্ট অফিসের কাজে থাকাটা অপচয় মাত্র। কাজেই চেষ্টা হতে লাগল আইনস্টাইনকে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে নিয়ে আসার। আইনস্টাইন নিজেও তাই চাইছিলেন।

সে-সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ পেতে হলে একটি নিয়ম মেনে চলতে হত। প্রফেসর হবার আগে প্রার্থীকে কিছুকাল কাজ করতে হত 'প্রিভাটডোৎসেণ্ট' হিসেবে। নিয়মটি অদ্ভুত। প্রিভাটডোৎসেণ্ট সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো দায়দায়িত্ব থাকত না, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে কোনো বেতনও দেওয়া হত না। অন্যদিকে প্রিভাটডোৎসেণ্টেরও কোনো দায়দায়িত্ব থাকত না। তিনি যা-খুশি লেকচার দিতে পারতেন। যে-সব ছাত্র সেই লেকচার শুনতে আসত তাঁরা সামান্য কিছু বেতন দিত। এমনি কিছুকাল থাকার পরে তবেই প্রফেসর হওয়া যেত।

১৯০৮ সালে আইনস্টাইন বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিভাটডোৎসেণ্ট হলেন। কিন্তু তা থেকে আয় হত এত সামান্য যে পেটেণ্ট অফিসের চাকরিও তাঁকে রাখতে হল।

পরের বছর জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ খালি হতে আইনস্টাইন সেই পদের প্রার্থী হলেন। ততোদিনে তিনি রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। পদার্থবিদ্যার জগতে গণ্য হয়েছেন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে। তবুও কিন্তু জুরিখের শিক্ষা-বোর্ডের কাছে বাতিল হয়ে গেলেন। এই পদের জন্য অন্য প্রার্থী ছিলেন ফ্রীডরিখ আডলার, অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতার পুত্র।*

*জুরিখে আইনস্টাইন পরিবার ও আডলার পরিবার একই বাড়িতে থাকতেন। এই বাড়িতেই ১৯১০ সালের জুলাই মাসে আইনস্টাইনের দ্বিতীয় পুত্র এডুয়ার্ডের জন্ম হয়। আইনস্টাইনের সঙ্গে আডলারের খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ১৯১২ সালে আডলার সুইজারল্যাণ্ড ছেড়ে নিজের দেশ অস্ট্রিয়ায়

বোর্ডের অধিকাংশ ছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্রাট, তাঁরা ফ্রীডরিখ আডলারকেই অধ্যাপকের পদের জন্য নির্বাচিত করলেন। কিন্তু আড্‌লার যখন শুনলেন আইনস্টাইন এই পদের প্রার্থী, নিজের পক্ষ থেকে এই পদ গ্রহণে অসম্মতি জানালেন এবং পীড়াপীড়ি করলেন যে এই পদে আইনস্টাইনকেই যেন নেওয়া হয়, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়েরই সম্মান বাড়বে। তখন আইনস্টাইনই নিযুক্ত হলেন। পদটি অধ্যাপকের বটে, কিন্তু 'অ-সাধারণ'। নামের এই মহিমা সত্ত্বেও বেতন ছিল সামান্য—বার্ন পেটেন্ট অফিসে যা পেতেন তার চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু বার্ন-এ একটা সুবিধে ছিল এই যে সাদাসিধে জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে কিছু অপরিহার্য সামাজিক দায়িত্ব পালন করতেই হয়, সেটা খরচেরও ব্যাপার। ফলে অধ্যাপক হবার পরে আইনস্টাইন বরং আরো টানাটানিতেই পড়লেন।

জুরিখ চিরকালই আইনস্টাইনের কাছে খুব প্রিয় জায়গা। কিন্তু তিনি কোনোদিনই কোনো একটি জায়গাকে নিজের জায়গা বলে মনে করেননি। যেখানে কাজের সুবিধে সেখানেই চলে গিয়েছেন। তাই

চলে যান। তিনি ছিলেন ঘোরতর যুদ্ধ-বিরোধী। অস্ট্রিয়ার গভর্নমেণ্ট যখন জনমতের সামনে দাঁড়াতে ভয় পেয়ে পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকতে অস্বীকার করল, তিনি একেবারে অস্ত্রধারণ করলেন। ১৯১৬ সালের অক্‌টোবরে হোটেল মাইসেলে ঢুকে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গুলি করে হত্যা করলেন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট স্ট্যুর্গ্‌খ্‌-কে। তারপরে যখন তাঁর বিচার চলছিল, কারাগারে বসে রচনা করলেন আপেক্ষিকতার বিষয়ে দীর্ঘ এক নিবন্ধ। এই নিবন্ধের কপি এসে পৌঁছল আইনস্টাইন ও অন্য পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে, এবং মনোবিজ্ঞানীদের কাছেও। আড্‌লারের পরিবার চাইছিলেন, পদার্থবিজ্ঞানীরা বলুন যে এই প্রবন্ধ পড়েই বোঝা যাচ্ছে আড্‌লারের মাথা খারাপ। কিন্তু বিজ্ঞানীদের পক্ষে অন্য একজন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সম্পর্কে একথা বলা শক্ত। যাই হোক, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আড্‌লার মাত্র আঠারো মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পরে অস্ট্রিয়ার জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং লেবার অ্যাণ্ড সোশ্যালিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের সম্পাদক-হয়ে ছিলেন।

১৯১১ সালে প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার পদ গ্রহণ করলেন। দুই ছেলেকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী মিলেভা রয়ে গেলেন জুরিখে এবং খরচ চালাবার জন্য বাড়িতে ভাড়াটে বসালেন।

প্রাগে এসে আইনস্টাইন একজন অধ্যাপকের পুরো বেতন পেতেন। কিন্তু এখানেও টিকে থাকলেন না। ১৯১২ সালে অধ্যাপকের পদে আবার ফিরে এলেন জুরিখ পলিটেকনিকে। বারো বছর আগে এই জুরিখ পলিটেকনিক থেকেই তিনি স্নাতক হয়েছিলেন!

এই গোটা সময়কাল ধরে আইনস্টাইন পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় প্রচুর কাজ করেছেন। এখানে আমরা শুধু আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি গড়ে ওঠার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। একই সময়ে কোয়ানটাম পদার্থবিদ্যাতেও আইনস্টাইন প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কাজ করে গিয়েছেন। সে-বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা তুলব।

চার মাত্রার স্পেস-সময়

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব গড়ে তুলতে তারপরে যিনি বড়ো রকমের ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন হেরমান মিন্‌কোভস্কি (১৮৬৪-১৯০৭)। আইনস্টাইন যখন জুরিখ পলিটেকনিকে পড়তেন তখন হেরমান মিন্‌কোভস্কি ছিলেন সেখানকার শিক্ষক। পুরনো ছাত্রের কথা হেরমান মিন্‌কোভস্কি মনে রাখতে পারেননি। তিনি নিজে চলে গিয়েছিলেন গোয়েটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে (তখনকার দিনে এবং পরে আরো বহু বছর ধরে গোয়েটিঙ্গেন ছিল বিশ্বে গণিত চর্চা ও অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ স্থান)। ১৯০৭ সালে তিনি উপস্থিত করলেন 'চার মাত্রার বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি'। বিশেষ আপেক্ষিকাতার তত্ত্বটি গণিতের ভাষায় মণ্ডিত হল।

তখনো পর্যন্ত বিশুদ্ধ গণিতে আইনস্টাইনের কোনো উৎসাহ ছিল না। কিন্তু পরে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব উপস্থিত করতে গিয়ে গণিতের অসাধারণ ক্ষমতা বুঝতে পারেন। ১৯১৬ সালে 'আপেক্ষিকতা' নামে যে সুন্দর একটি সাধারণবোধ্য বই লিখেছেন তার একটি পরিচ্ছেদের নাম 'মিন্‌কোভস্কির চার মাত্রার স্পেস'। তার শুরুর বাক্যটি এইরকম: 'চার-মাত্রার ব্যাপারের কথা শুনলেই গণিত যাঁরা জানেন না তাঁরা অজানা আতঙ্কে কেঁপে ওঠেন। তাঁর অনুভূতি দুজ্ঞেয়র চিন্তায় জেগে ওঠা অনুভূতি থেকে ভিন্ন নয়।' কিন্তু তারপরেই তিনি লিখছেন,'আমরা যে জগতে বাস করি তা হচ্ছে চার-মাত্রাবিশিষ্ট দেশ-কালের বা স্পেস-সময়ের নিরবচ্ছিন্নতা (continuum)--এই কথাটির চেয়ে মামুলি কথা আর কিছু হতে পারে না।'

কথাটি মামুলি কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। তবে মামুলি অর্থেই যদি ধরি তাহলে বলতে হয়--আমরা জানি বা না-জানি, ঘটনার বর্ণনা চারমাত্রাতেই দিয়ে থাকি। যেমন, নিতান্তই কথাটার অর্থ ধরবার জন্য মামুলি একটি ঘটনার কথা ধরা যেতে পারে। বিকাল চারটায় শহীদ মিনারের পাদদেশে জনসভা। এখানে একটি স্থান নির্দিষ্ট করা হচ্ছে—শহীদ মিনার। আমরা জানি যে কোনো একটি স্থানকে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে হলে তিনটি স্থানাঙ্ক চাই—x, y, z। কিন্তু শুধু স্থানটি নির্দিষ্ট করলেই ঘটনার বিবরণ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। তিনটি স্থানাঙ্কের সঙ্গে আরও যুক্ত করা চাই সময়। এই চারটি মাত্রা লাভ করলে তবেই ঘটনার বিবরণ সম্পূর্ণ হয়।

আইনস্টাইন আরো একটি কথা ব্যবহার করেছেন যার অর্থ আমাদের ভালো করে বোঝা দরকার। কথাটা হচ্ছে -নিরবচ্ছিন্নতা (continuum)।* যা বিচ্ছিন্ন নয় বা আলাদা হয়ে যাওয়া নয়,

---

* 'কন্টিনিউযাম' শব্দটির বাংলা করা হয় 'সন্ততি'। বাংলায় সন্ততি শব্দের অন্য অর্থ সন্তান এবং এই অর্থেই বহুল ব্যবহৃত। অর্থ ধরতে যাতে অসুবিধে না হয় তাই আমরা এখানে 'নিরবচ্ছিন্নতা' শব্দটি ব্যবহার করলাম। শব্দটির সঠিক অর্থ একটু পরেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তাই নিরবচ্ছিন্ন। এই লক্ষণটি যেখানে প্রকট তাই নিরবচ্ছিন্নতা। দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে সুবিধে হবে। একটি রুলার বা স্কেল হচ্ছে একমাত্রার স্পেস নিরবচ্ছিন্নতা। ছোট একটি স্কেল সাধারণত বারো-ইঞ্চি বা ত্রিশ-সেন্টিমিটারের মাপে হয়ে থাকে। প্রতিটি সেন্টিমিটারকে আবার দশভাগে ভাগ করে দেখানো হয়। কিন্তু শুধু দশ ভাগে কেন, লক্ষ বা কোটি ভাগে ভাগ করেও দেখানো চলত। তর্ক তোলার জন্য যদি বলা হয়, শত-কোটি নয় কেন? হ্যাঁ, তাও হতে পারে। তার চেয়ে বেশিও। নিরবচ্ছিন্নতার লক্ষণই হচ্ছে এই যে সেখানে যে-কোনো দুই বিন্দুর মধ্যেকার ফাঁক অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হতে পারে।

তেমনি, রেললাইনকেও বলা চলে এক-মাত্রার স্পেস নিরবচ্ছিন্নতা। রেললাইনের ওপর দিয়ে চলতে চলতে একজন ইঞ্জিন-ড্রাইভার একটি স্থানাঙ্ক দিয়েই তার অবস্থান বোঝাতে পারেন — যেমন, একটি স্টেশন বা একটি মাইলস্টোন উল্লেখ করে। কিন্তু সমুদ্রে ভাসমান কোনো জাহাজের ক্যাপটেনকে তাঁর অবস্থান বোঝাতে হয় দুটি স্থানাঙ্কের সাহায্য নিয়ে - অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা। কাজেই সমুদ্রপৃষ্ঠ হচ্ছে দুই-মাত্রার নিরবচ্ছিন্নতা। কিন্তু এরোপ্লেনের একজন পাইলটকে যেতে হয় তিন-মাত্রার নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে দিয়ে। তাঁকে নির্দেশ করতে হয় অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা শুধু নয়, তা ছাড়াও মাটি থেকে উচ্চতা। আসলে এরোপ্লেনের পাইলটের নিরবচ্ছিন্নতা হচ্ছে স্পেস। আর আমরা জানি স্পেস তিন-মাত্রাবিশিষ্ট।

কিন্তু গতিশীল কোনো ঘটনার বিবরণ দিতে হলে শুধু স্পেসের মধ্যে তার অবস্থান জানালেই চলে না। সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্পেসের মধ্যে সেই অবস্থান কি-ভাবে বদলাচ্ছে। যেমন, কলকাতা থেকে বোম্বাই একটি এরোপ্লেন যাচ্ছে। যদি শুধু স্পেসের মধ্যে দিয়ে এই এরোপ্লেনের গমনপথের বিভিন্ন বিন্দুর অক্ষাংশ (x) দ্রাঘিমা (y) ও উচ্চতা (z) জানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ঘটনার বিবরণ সম্পূর্ণ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হয় এরোপ্লেন কোন সময়ে কোন বিন্দু পার হয়েছে। অর্থাৎ, আরও একটি মাত্রা যোগ করতে হয়, যার নাম সময় (t)। এরোপ্লেনের কলকাতা থেকে

বোম্বাই গমন হচ্ছে চার-মাত্রাবিশিষ্ট স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতা।

সময় হচ্ছে এমন একটি পরিমাপ যা ধরা ছোঁয়া যায় না। কাজেই চার-মাত্রার স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতার একটি চিত্র বা মডেল তৈরি করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেটি কল্পনা করা যায় ও গণিতের ভাষায় উপস্থিত করা চলে। যেমন, মহাবিশ্বের বিপুল বিস্তার সম্পর্কে যদি ধারণা করতে যাই তাহলে তিনমাত্রার স্পেসের মধ্যেই কি তা ধরা সম্ভব—সময়ের মাত্রাকে বাদ দিয়ে? আমরা জানি, কোটি কোটি তারাজগৎ বা গ্যালাক্সি নিয়ে এই মহাবিশ্ব। আমাদের সূর্য যে-গ্যালাক্সির একটি তারা তার নাম ছায়াপথ বা মিল্কি ওয়ে। সূর্যের মতো এবং সূর্যের চেয়েও অনেক বড়ো ও উজ্জ্বল দশহাজার-কোটি তারা আছে এই গ্যালাক্সিতে। এমনি প্রত্যেকটি গ্যালাক্সিতে। আর এমনি গ্যালাক্সির সংখ্যা পাঁচশো-কোটি আলো-বছর বিস্তারের মধ্যে কোটি কোটি। রেডিও-দূরবীন মারফৎ তারও বাইরে থেকে আরো বহু গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটা ধারণা করতে হলে সময়কে কি করে বাদ দেওয়া যায়? আমাদের ছায়াপথ থেকে সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সি হচ্ছে অ্যাণ্ড্রোমিডা, কুড়ি-লক্ষ আলো-বছর দূরে। তার মানে, অ্যাণ্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি থেকে আমাদের এই পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে সময় লাগে কুড়ি-লক্ষ বছর। ফলে, পৃথিবী থেকে এই মুহূর্তে তাকিয়ে আমরা যে অ্যাণ্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি দেখি তা আসলে কুড়ি লক্ষ বছর আগেকার। তেমনি পাঁচশো-কোটি আলো-বছর দূরের কোনো গ্যালাক্সিকে যদি দেখি, সেটিও এই মুহূর্তের নয়—পাঁচশো-কোটি বছর আগেকার। একই সময়ে পৃথিবী থেকে তাকিয়ে একটিকে দেখছি কুড়ি-লক্ষ বছর আগেকার চেহারায়, আরেকটিকে পাঁচশো-কোটি বছর আগেকার চেহারায়। এই মুহূর্তে অ্যাণ্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির অস্তিত্ব যদি লোপ পায় তাহলে আরো কুড়ি লক্ষ বছর সে-খবর আমাদের কাছে অজানা থেকে যাবে। দ্বিতীয়টির বেলায় আরো পাঁচশো-কোটি বছর। আবার দর্শক যদি পৃথিবীতে না থেকে অন্য কোথাও থাকে, ধরা যাক ধ্রুবতারার

এলাকায়, তাহলে কিন্তু সময়ের সমস্ত হিসেবই বদলে যায়। অন্য কোনো গ্যালাক্সির দর্শকের কাছে সময়ের হিসেব আরো অন্য রকম।

অতএব, মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা করতে হলে যেমন ধরতে হয় তিনমাত্রার স্পেসের হিসেব, তেমনি একমাত্রার সময়ের হিসেব। অর্থাৎ, বিশ্বকে ধরতে হয় চারমাত্রার স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতায়।

চারমাত্রার স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতার গণিত প্রথম উপস্থিত করেন হেরমান মিন্‌কোভস্কি। ১৯০৮ সালের একটি বক্তৃতায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'স্পেস ও সময় সম্পর্কে যে ধারণা আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চাই তার উদ্ভব পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার জমি থেকে। আর সেখানেই তার শক্তি। এই ধারণা সম্পূর্ণ নতুন। এখন থেকে নিজস্ব অর্থে স্পেস ও নিজস্ব অর্থে সময় অবশ্যম্ভাবী রূপেই ছায়ামাত্রে বিলীন হচ্ছে। বাস্তবতা বজায় রাখছে একমাত্র দুয়ের মধ্যে একধরনের সম্মিলন।'

তাই বলে এমন কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতা শুধুই একটা গাণিতিক ধারণা। এই জগৎ বাস্তবিকই এক স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতা—একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি হতে পারে না। যেমন, সময়ের পরিমাপ আমরা করে থাকি সেকেণ্ডে, মিনিটে, ঘণ্টায়, ইত্যাদি। এগুলো আসলে কী? সূর্যের আপেক্ষিকে পৃথিবীর স্পেসগত অবস্থান। পৃথিবীর ওপরে আমরা আমাদের স্পেসগত অবস্থান নির্ধারণ করি অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা দিয়ে, কিন্তু এই অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা মাপা হয় মিনিটে ও সেকেণ্ডে।

স্পেস ও সময়ের সমতুলতা আরো স্পষ্ট হয়—যদি আমরা আমাদের এই ছায়াপথ গ্যালাক্সির তারামণ্ডলের দিকে তাকাই। তারামণ্ডলের তারাগুলোকে দেখে মনে হয় যেন তারা বিশেষ একটি আকারে একসঙ্গে জোট বেঁধেছে। কিন্তু তারামণ্ডলের সব তারার জোট আসল জোট নয়। আমাদের দেখার দোষে বা গুণে যে-দুটি তারাকে মনে হচ্ছে পাশাপাশি তাদের একটি হয়তো চারশো আলো-বছর দূরে, অপরটি মাত্র চল্লিশ আলো-বছর দূরে। তাহলে আমরা যখন তারামণ্ডলের দিকে তাকিয়ে পাশাপাশি দুটি তারাকে দেখি তখন

আসলে দেখি চারশো বছরের পুরনো একটিকে ও চল্লিশ বছরের পুরনো আরেকটিকে। অতএব সময়কে বাদ দেওয়া চলে না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাই বিশ্বকে স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতা হিসেবেই দেখেন। যখন তিনি তাঁর দূরবীনের মধ্যে দিয়ে তাকান তখন যেমন অতিক্রম করেন স্পেস—দূরের দিকে, তেমনি অতিক্রম করেন সময়—অতীতের দিকে। পঞ্চাশ-কোটি আলো-বছর দূরের বিশ্বকে যখন দেখেন তখন এই ধারণাও হয় যে এই আলো যখন তার উৎস থেকে রওনা হয়েছিল তখন পৃথিবীতে পুরাজীবীয় যুগের সমুদ্র থেকে মেরু-দণ্ডী জীব সবে ডাঙ্গায় উঠছিল।

আমরা আগে বলেছি, বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সমস্যাটি নিয়ে আইনস্টাইন কাজ শুরু করেছিলেন, যখন তিনি ছাত্র, বয়স মাত্র ষোল, সেই তখন থেকেই। ছাত্র ছিলেন বলেই গোড়ার দিকে পুরো সময় দিতে পারেননি। কিন্তু সমস্যাটা সবসময়েই মনের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। সমস্যার একটা সমাধানের জন্য বহুভাবে চেষ্টা করেন। বহু ব্যর্থ চেষ্টা বর্জন করেন। শেষপর্যন্ত দোষী ধরা পড়ে। কে এই দোষী?

আইনস্টাইন বলছেন, সময়।

এই দোষীকে চেনা দরকার। নইলে সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়।

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সকলেই সময় সম্পর্কে এই ধারণা গড়ে তুলি যে সময় চলেছে একটানা ও একভাবে। যন্ত্র দিয়ে গড়া যে ঘড়ি আমরা চোখের সামনে দেখি সেটিও এই ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ঘড়ি চলে একটানা, একভাবে। সময়ও তাই। ১৬৮৭ সালে নিউটন তাঁর প্রিনসিপিয়ায় সময়কে বলেছেন পরম, সময় বয়ে চলে একভাবে বাইরের কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে। সাধারণ বুদ্ধি থেকে আমরাও তাই ভাবি। সময়ের আদি নেই, অন্ত নেই, যা-কিছু ঘটুক-না-কেন সময় চলে স্বাধীনভাবে একটানা। জাগতিক ব্যাপারের দরুন সময়ের কোনো হেরফের হয় না। এই বিশ্ব যদি সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে যায় তখনো সময়ের প্রবাহ

একটানা নিরবচ্ছিন্ন। সময় পরম।

নিউটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী লাইব্‌নিৎস কিন্তু নিউটনের পরম সময়ের ধারণা মানতে পারেননি। তাঁর মতে, সময় কোনো-ক্রমেই স্বকীয় নয়, সময়ের চেয়ে আরো অনেক বেশি মৌলিক বিষয় হচ্ছে ঘটনা। ঘটনার বিন্যাসকেই তিনি বললেন সময়। তিনি-এই বলে যুক্তি দেখালেন :

> মনে করা যাক, কেউ একজন প্রশ্ন করছে, ঈশ্বর কেন আরো একবছর আগে সবকিছু সৃষ্টি করলেন না? এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান যে, ঈশ্বর অন্য কোনো সময়েও সৃষ্টি করতে পারতেন। তা না করে যখন তিনি করলেন তখনই কেন করলেন তার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। এই সিদ্ধান্ত সঠিক হবে যদি সময়ের অস্তিত্ব হয় স্বকীয় ও সকল ব্যাপার থেকে স্বতন্ত্র। কেননা তখন আর একথা বলার অর্থ হয় না যে কতকগুলো ব্যাপারের অস্তিত্ব কতকগুলো মুহূর্তে, অন্য কতকগুলো মুহূর্তে নয়—ব্যাপারগুলোর পারম্পর্য যেখানে অভিন্ন।

লাইব্‌নিৎস বললেন, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপার নেই অথচ মুহূর্ত আছে এমন হতেই পারে না। বিশ্ব যদি আরো একবছর আগে সৃষ্টি হত তাহলে সেই বিশ্বকে এই বিশ্ব থেকে তফাৎ করার কোনো উপায় নেই।

লাইবনিৎসের তত্ত্বকে বলা হয় সময়ের সম্পর্কগত তত্ত্ব (relational theory of time)। এই তত্ত্বের মূল কথাটি এই যে সময়কে আমরা পাই ঘটনা থেকে, ঘটনা ক সময় থেকে নয়। দুটি ঘটনা যুগপৎ এই কারণে নয় যে পরম সময়ের একই মুহূর্তে তাদের অস্তিত্ব, এই কারণে যে একটি যখন ঘটছে অপরটি তখনই ঘটছে।

আঠারো ও উনিশ শতকে কিন্তু সময় সম্পর্কে নিউটনীয় ধারণার প্রাধান্য ছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ধারণা ছিল যে সময়ের ব্যবস্থা সার্বিক ও স্ব-প্রতিষ্ঠ। ঘড়ির ব্যাপক প্রচলন থেকে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল। ভূপৃষ্ঠকে যে আমরা কতকগুলো সময়ের ভাগে ভাগ করেছি—এই ঘটনাও সময়ের সার্বিকতা ও পরমতা সম্পর্কে বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

তারপরে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন আবিষ্কার করলেন সময়ের আপেক্ষিকতা। সময় নিয়ে এতকাল যা-কিছু তত্ত্ব প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে সম্পর্কিত যা-কিছু দর্শন—সবই তিনি বাতিল করলেন।

আমরা আগেই জেনেছি, সময় নিয়ে আইনস্টাইনের অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎচৌম্বক তত্ত্বকে নিউটনের বল-বিদ্যার সূত্রের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে। আইনস্টাইন দেখতে চাইলেন আপেক্ষিকতার নিয়ম বস্তুজগতে যেমন খাটে, বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রে তেমনি খাটে কিনা। এখানেই দেখা গেল কোথাও একটা কিছু গণ্ডগোল থেকে যাচ্ছে। কেননা, দর্শক যদি আলোর বেগে গতিশীল হয় তাহলে আলোর তরঙ্গ তার কাছে নিশ্চল হয়ে যায়। অর্থাৎ, আলো আর আর আলো থাকে না যা কোনোক্রমেই হওয়া উচিত নয়। আইনস্টাইন বললেন, আপেক্ষিকতার নিয়ম বস্তুর ব্যাপারে যেমন সত্য, বিদ্যুৎচৌম্বক ব্যাপারেও তেমনি সত্য। দর্শকের বেগ যাই হোক না কেন, আলোর বেগে কোনো তারতম্য ঘটা উচিত নয়। আইনস্টাইন সিদ্ধান্ত করলেন, আলোর বেগ নিত্য। তারপরে বিশ্লেষণ করলেন সেই অনুমানগুলো যার আশ্রয় আমরা নিয়ে থাকি গতির মাপ নেবার সময়ে। দেখলেন, সেটা নির্ভর করে আমরা সময়ের মাপ কি-ভাবে নিই তার ওপরে। বুঝতে পারলেন, সময়ের মাপটা নির্ভর করে যুগপত্তার ধারণার ওপরে। তাঁর নিজের ভাষায়, 'সময়ের ভূমিকা আছে এমন সকল বিচার সবসময়েই যুগপৎ ঘটনার বিচার।' আইনস্টাইনের প্রবন্ধে বাক্যটি যেখানে আছে সেই অংশটি উপস্থিত করা যেতে পারে :

> আমরা যদি একটি বস্তু-বিন্দুর গতি বর্ণনা করতে চাই তাহলে তার স্থানাঙ্কগুলিকে সময়ের অপেক্ষক মূল্য দিই। এখন আমাদের সতর্কতার সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে 'সময়' বলতে আমরা কী বুঝি সে-সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ পরিষ্কার না-হওয়া পর্যন্ত এ-ধরনের বর্ণনার কোনো ভৌতিক অর্থ থাকে না। আমাদের বিবেচনায় আনা দরকার যে সময়ের ভূমিকা আছে এমন সকল বিচার সব-সময়েই যুগপৎ ঘটনার বিচার। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, আমি যদি বলি 'ট্রেন সাতটার সময়ে এখানে পৌঁছয়' তাহলে আমি যা

বলতে চাই তা অনেকটা এই : 'আমার ঘড়ির ছোট কাঁটার সাতটা নির্দেশ করা ও ট্রেনের পৌঁছনো যুগপৎ ঘটনা।'

মনে হতে পারে সময়ের সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত সকল অসুবিধা কাটানো যায় যদি 'আমার ঘড়ির ছোট কাঁটার সাতটা নির্দেশ করা' কথাগুলোর বদলে 'সময়' কথাটি বসিয়ে দিই। বস্তুতপক্ষে এমনি একটি সংজ্ঞা তখনই সন্তোষজনক যখন ঘড়ি যেখানে রয়েছে এককভাবে সেই জায়গার জন্য সময়ের সংজ্ঞা দিতে চাই। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ঘটমান ঘটনাগুলোকে যদি সময়ের অনুক্রমে যুক্ত করতে হয়, বা, একই কথা হয়ে দাঁড়ায়, ঘড়ি থেকে দূর দূর স্থানে ঘটমান ঘটনাগুলোর সময় যদি নির্ণয় করতে হয়, তাহলে কিন্তু তা আর সন্তোষজনক থাকে না।

আইনস্টাইনই প্রথম জানালেন, সময়ও আপেক্ষিক। যে প্রবন্ধে জানালেন তার বলার বিষয় বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। প্রবন্ধটির নাম, আগে বলেছি, 'গতিশীল বস্তুর বিদ্যুৎগতিবিদ্যা বিষয়ে'। ওপরের বাংলা অনুবাদ থেকেও বোঝা যাচ্ছে প্রবন্ধটি ঠিক যেন গুরুভার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মতো নয়। লিওপোলড ইনফেল্ড এই প্রবন্ধের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

প্রবন্ধের নাম সাদামাটা, তবুও যতো আমরা পড়ি ততো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাই প্রবন্ধটি অন্য সমস্ত প্রবন্ধ থেকে আলাদা। এখানে রেফারেন্স নেই, দিকপালের লেখা থেকে উদ্ধৃতি নেই, অল্প যে-কটি পাদটীকা আছে তার চরিত্র ব্যাখ্যামূলক। স্টাইল সরল এবং প্রবন্ধের বেশির ভাগ অংশ অগ্রসর কারিগরী জ্ঞান ছাড়া অনুধাবন করা চলে। কিন্তু প্রবন্ধটি পুরোপুরি বুঝতে হলে মনের পরিপক্কতা ও রুচি চাই, পুঁথিপড়া বিদ্যার চেয়ে যা আরও বিরল ও মূল্যবান। এমনকি আজকের দিনেও প্রবন্ধটির উপস্থাপনা ও স্টাইল কিছুমাত্র সজীবতা হারায়নি। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব জানার জন্য এখনো এইটিই সেরা উৎস। প্রবন্ধের লেখক ছিলেন বাইরের লোক, কোনো বৈজ্ঞানিক বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত পর্যন্ত ছিলেন না। ১৯০৫ সালে তিনি ছিলেন ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত তরুণ, বয়স ছাব্বিশ, সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন পেটেণ্ট অফিসে একজন কেরানি।

সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে আইনস্টাইন অনুশীলন করেছিলেন গতির ব্যাপার নিয়ে। দেখিয়েছিলেন, অন্য-নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীর গতি কখনো ধরা যায় না। বিশ্বে এমন কোনো নির্দিষ্ট মান নেই যাতে তা ধরা পড়ে। শুধু পৃথিবী নয়, একই কথা বলা চলে যে-কোনো গতিশীল বস্তু সম্পর্কে। আমরা বুঝতে পারি পরম গতি নয়, আপেক্ষিক গতি। গতিশীল বস্তুর গতি ধরা পড়ে একমাত্র তখনই যখন অন্য কোনো বস্তুর বিচারে তার জায়গা বদল হয়ে চলে। যেমন, আমরা জানি, সূর্যের চারদিকে পৃথিবী সেকেণ্ডে ত্রিশ কিলোমিটার বেগে ঘুরছে। অর্থাৎ, সূর্যের বিচারে পৃথিবীর জায়গা বদল হচ্ছে - এ থেকে পৃথিবীর গতিশীলতা বুঝতে পারি। কোনো রকম পরীক্ষাকার্য করে এই গতিশীলতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। পৃথিবী যে শূন্য দিয়ে ছুটছে তা আমরা অনুভব করি না। সহজেই মনে হতে পারে, পৃথিবী স্থির ও সূর্য গতিশীল—কেননা আকাশে অবস্থান বদলাচ্ছে সূর্যেরই। চারশো বছর আগেও মানুষের ধারণা তাই ছিল—স্থির পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে সূর্য। এই ধারণা নিয়েই প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিভুর্ল জ্যোতিষিক গণনা করতেন। মহাবিশ্বে গতিশীল সবকিছুই---সমস্ত গ্রহ, সমস্ত তারা, সমস্ত গ্যালাক্সি। কিন্তু সেই গতি আমরা টের পাই একটির সঙ্গে অপরটিকে বিচার করে। এমন যদি হত যে মহাবিশ্বে বস্তু একটিই, বিচার করার জন্য দ্বিতীয় কোনো বস্তু নেই, তাহলে কিছুতেই সেই বস্তুর গতি ধরা যেত না। গতি হচ্ছে একটা আপেক্ষিক অবস্থা। বিচার করে দেখার জন্য অন্য কিছুর অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে একক একটি বস্তুর গতিশীলতার কথা বলা অর্থহীন।

বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশের অল্প কিছুকাল পরে আইনস্টাইন ভাবতে লাগলেন, এমন কোনো এক ধরনের গতি কি

হয় না যা অন্য-নিরপেক্ষভাবে টের পাওয়া যায়—অর্থাৎ. যাকে বলা যায় পরম গতি? এমন এক গতি যা টের পাবার জন্য দ্বিতীয় কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনা করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। গতিশীল বস্তুর মধ্যেই এমন কিছু ঘটে যা সেই গতির ফল। একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে কথাটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল ট্রেনের মধ্যে একজন যাত্রী রয়েছে। বাইরের দিকে যদি সে না তাকায় তাহলে কি তার পক্ষে ধরা সম্ভব ট্রেন গতিশীল? সম্ভব নয়। কোনো রকম পরীক্ষকার্য চালিয়েও সম্ভব নয়। একটি পরীক্ষাকার্য এই হতে পারে যে কামরার সিলিং থেকে একটি বল কামরার মেঝের ওপরে ফেলা হচ্ছে। বলটি বরাবর সিধে পথে নেমে আসে—স্থির কামরায় যেমন এসে থাকে। অর্থাৎ, গতিশীলতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না! এবারে ভাবা যাক. আচমকা ব্রেক চেপে ট্রেনের গতি কমানো হচ্ছে। তখন সেই যাত্রীর শরীরটা সামনের দিকে ঝাঁকুনি খায় আর এই ঝাঁকুনি থেকে সে বুঝতে পারে ট্রেনের গতিশীলতা। সিলিং থেকে পড়ন্ত বলও তখন আর সিধে পথে নামে না, সামনের দিকে বাঁক নিয়ে বক্র পথ রচনা করে। কিংবা যদি ট্রেনের গতি বাড়তে থাকে। তখনো সেই যাত্রী পিছনের দিকে নিজের শরীরের ঝাঁকুনি থেকে ট্রেনের গতি টের পেয়ে যায়। পড়ন্ত বল পিছনের দিকে বাঁক নিয়ে বক্র পথ রচনা করে। গতি ক্রমেই বেড়ে চলাকে আমরা বলি ত্বরণ। ক্রমেই কমে চলাও ত্বরণ—ঋণাত্মক ত্বরণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, গতি যদি সমবেগের না হয়, অর্থাৎ গতি যদি ত্বরণযুক্ত হয়, তাহলে সেই গতি অন্য-নিরপেক্ষভাবেই টের পাওয়া যায়—যাকে বলা চলে 'পরম' গতি। যেমন, গোটা বিশ্বে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো বস্তু যদি না থাকে তাহলে এমনিতে পৃথিবীর গতি বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু অবশ্যই বোঝা যায় যদি পৃথিবী ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে ঘোরে।

আইনস্টাইন বলেছিলেন, গতি আপেক্ষিক। কিন্তু অসম গতির বেলায় কথাটা যেন খাটছে না। অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে বিচার না করে এককভাবেই এই গতি টের পাওয়া যায়। বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে আইনস্টাইন বলেছিলেন, পরস্পরের আপেক্ষিকে সমবেগে

গতিশীল সকল তন্ত্রে প্রকৃতির নিয়ম অভিন্ন। অথচ, দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতির নিয়ম অসম বেগের বেলায় অন্যরকম। প্রকৃতির নিয়মে এমন অসামঞ্জস্য না থাকাটাই স্বাভাবিক হত। আইনস্টাইন তাই ব্যাখ্যা খুঁজতে লাগলেন ও দশবছর ধরে গবেষণা করলেন। অবশেষে ১৯১৬ সালে পাওয়া গেল তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি -- সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। এবং এই তত্ত্বকে গড়ে তুলতে গিয়ে রচনা করলেন মহাকর্ষের নতুন সূত্র। গত তিনশো বছর ধরে যে-সব ধারণা নিয়ে মানুষ এই বিশ্বের চিত্র খাড়া করেছিল তাকে এই নতুন সূত্র একেবারে ওলোটপালোট করে দিয়ে গেল।

১৯০৫ সালের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে ১৯১৬ সালের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মাঝপথে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা দরকার—'আলোর চলাচলে মহাকর্ষের প্রভাব'। বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের প্রবন্ধের মতো এই প্রবন্ধেও গণিতের ব্যবহার ছিল সরল। আমরা আগে বলেছি, আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের গণিত অতি চমৎকারভাবে উপস্থিত করেছিলেন মিন্‌কোভস্কি। আইনস্টাইন তার জন্য খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। তিনি মনে করতেন, বিজ্ঞানকে অযথা বিস্তারিত করা হচ্ছে এবং তাতে পদার্থবিদ্যা চাপা পড়ছে। তারপরে, মিন্‌কোভস্কির বক্তৃতার অল্প কিছুকাল পরে, মাক্‌স ফন লাউয়ে (১৯১৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী) যখন বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিতভাবে একটি গাণিতিক পাঠ্যপুস্তক লিখলেন, আইনস্টাইন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'লাউয়ের বই আমি নিজেও বড়ো একটা বুঝতে পারি না।' গোয়েটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সম্ভবত তৎকালের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ডেভিড হিলবার্ট একবার মন্তব্য করেছিলেন,'গণিতের শহর আমাদের এই গোয়েটিঙ্গেনে রাস্তার প্রতিটি বালকও চার-মাত্রার জ্যামিতি আইনস্টাইনের চেয়ে বেশি বোঝে। তবুও কিন্তু কাজটা করলেন আইনস্টাইন, গণিতবিদরা নন।' একদল গণিতবিদকে তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা কি জানেন আমাদের এই প্রজন্মে স্পেস ও সময় সম্পর্কে সবচেয়ে মৌলিক ও

গভীর কথা আইনস্টাইন কেন বলতে পারলেন? এই কারণে যে সময় ও স্পেস নিয়ে এতসব গণিত ও দর্শনের কিছুই তিনি শেখেননি।' কিন্তু আইনস্টাইনের ১৯১৬ সালের প্রবন্ধ সম্পর্কে এমন কথা কিছুতেই বলা চলে না যে এই প্রবন্ধের চার-মাত্রার গণিত গোয়েটিঙ্গেনের 'রাস্তার প্রতিটি বালক' বুঝতে পারে। এখনকার উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞানের কোনো ছাত্র হয়তো রীমান জ্যামিতি, টেনসর ক্যালকুলাস ইত্যাদি বিষয়ে অনেকখানি জ্ঞান নিয়েই প্রবন্ধটি পড়তে পারে—তবুও তার কাছে সহজবোধ্য নয়। তখনকার অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ছিল। ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন আপেক্ষিকতার তত্ত্বের একজন বড়ো সমঝদার ছিলেন, তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'একথা কি সত্য যে সারা বিশ্বে মাত্র তিনজন ব্যক্তি সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বুঝতে পারেন?' জবাবে এডিংটন নাকি বলেছিলেন, 'তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?'

মহাকর্ষের শক্তি নির্ভর করে ভরের ওপরে। নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র থেকে আমরা জানি দুই বস্তুর মধ্যে আকর্ষণের জোর সেই দুই বস্তুর ভরের গুণফলের অনুপাতে হয়ে থাকে। ভর যতো বেশি আকর্ষণের জোর ততো বেশি। মহাকর্ষের টানে সূর্য যে গ্রহকে ধরে রাখে তা এই কারণে যে সূর্যের ভর অতি বিপুল।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার আছে। 'ভর' কথাটা আগেও জড়ত্ব নিয়ে আলোচনা করার সময়ে আমাদের আলোচনায় এসেছে, এখন আবার মহাকর্ষ নিয়ে আলোচনা করার সময় আসছে—কিন্তু দু-বারের ব্যবহার এক অর্থে নয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা দরকার।

বস্তুমাত্রেরই আছে জাড্য বা জড়ত্ব। এটি থাকার জন্য বস্তু যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই থাকতে চায়—স্থিতিশীল অবস্থাই হোক বা সরল রেখায় সমবেগে গতিশীল অবস্থাই হোক। অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে বলপ্রয়োগ করতে হয়। পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বস্তুর মধ্যে একটা প্রতিরোধ থাকে। এই প্রতিরোধের মাপকে বলা হয় জড়ত্বীয় ভর। নিউটনের সূত্র থেকে জড়ত্বীয় ভরের মাপও

পাওয়া যায়। সূত্রটি হচ্ছে: বল=জড়ত্বীয় ভর×ত্বরণ (বিষয়টি নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি)। যে-সব পরীক্ষাকার্যে মহাকর্ষের কোনো হিসেব থাকে না সেখানে এই জড়ত্বীয় ভরের মাপ নেওয়া চলে। যেমন, একটি চুম্বক একটুকরো লোহাকে আকর্ষণ করছে। এখানে মহাকর্ষের কোনো ব্যাপারই নেই। চুম্বকের আকর্ষণ থেকে পাওয়া যায় বল, লোহার টুকরোর আকর্ষিত হওয়া থেকে ত্বরণ। বলকে ত্বরণ দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই হচ্ছে লোহার টুকরোর জড়ত্বীয় ভর।

অন্যদিকে রয়েছে মহাকর্ষীয় ভর। আমরা জানি, দুই বস্তু একে অপরকে টানে। এটা মহাকর্ষীয় টান। মহাকর্ষের দরুন যখন ত্বরণ ঘটে তখন যে ভর পাওয়া যায় তার নাম মহাকর্ষীয় ভর। এবারে সূত্রটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম:

বল=মহাকর্ষীয় ভর×মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তীব্রতা

আমরা আগে জেনেছি জড়ত্বীয় ভরের বেলায় সূত্র হচ্ছে

বল=জড়ত্বীয় ভর×ত্বরণ

শেষের সূত্র থেকে যদি ত্বরণের মাপ পেতে হয় তাহলে সূত্রটির চেহারা দাঁড়ায়

$$\text{ত্বরণ} = \frac{\text{বল}}{\text{জড়ত্বীয় ভর}}$$

এবারে মহাকর্ষীয় ভরের সূত্র থেকে বল-এর জায়গায় আমরা বসাব মহাকর্ষীয় ভর×মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তীব্রতা। তাহলে ত্বরণের মাপ দাঁড়াচ্ছে এই:

$$\text{ত্বরণ} = \frac{\text{মহাকর্ষীয় ভর}}{\text{জড়ত্বীয় ভর}} \times \text{মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তীব্রতা}$$

আমরা যদি ধরে নিই মহাকর্ষীয় ভর ও জড়ত্বীয় ভর সমান তাহলে এই দুয়ে কাটাকুটি হয়ে যায়। থাকে শুধু

ত্বরণ=মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তীব্রতা

অঙ্কের ভাষায় যে-কথাটি বেরিয়ে আসছে, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার মিল আছে। সেই গ্যালিলিওর সময় থেকেই আমরা জানি, শূন্যস্থান দিয়ে যদি একটি ভারী বস্তু ও একটি হালকা

বস্তু (যেমন, একটি রুমাল ও একটি লোহার বল) একই উচ্চতা থেকে মাটিতে পড়ে তাহলে তারা একই ত্বরণ লাভ করে ও একই সময়ে মাটিতে পৌঁছয়। ব্যাপারটা সাধারণ অভিজ্ঞতার হলেও অন্য একদিক থেকে অসাধারণ। এমনিতে আমরা জানি (নিউটনের গতি-সম্পর্কিত দ্বিতীয় সূত্র), বস্তুকে ত্বরণযুক্ত করতে হলে কতখানি বলপ্রয়োগ করা দরকার তা নির্ভর করে বস্তুর ভরের ওপরে। ভিন্ন ভিন্ন ভরের দুটি বস্তুর ওপরে যদি একই মাপের বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে কম-ভরের বস্তুটির ত্বরণ বেশি-ভরের বস্তুটির ত্বরণের চেয়ে অধিক হবে। এই কথার সমর্থনে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। একটি কামানের গোলার চেয়ে একটি ভলিবল আরো বেশি জোরে ও আরো দূর পর্যন্ত ছোঁড়া চলে। কিন্তু এই কামানের গোলা ও ভলিবল যদি একই উচ্চতা থেকে মাটিতে পড়ে তাহলে তারা একই ত্বরণ নিয়ে একই সময়ে মাটিতে পৌঁছয়। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হতে পারে। আকার যাই হোক, ভর যাই হোক, মাটিতে পড়ার সময়ে একই ত্বরণে একই সময়ে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু মাটির সমান্তরালে বলপ্রয়োগ যদি একই মাত্রার হয় তাহলে ভরের ভিন্নতায় ত্বরণের ভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। এই গোলমেলে ব্যাপারটি নিউটনের সময় থেকেই জানা ছিল এবং ব্যাখ্যা হিসেবে তখন থেকেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জড়ত্বীয় ভর ও মহাকর্ষীয় ভর সমান।

জড়ত্বীয় ভর ও মহাকর্ষীয় ভরের এই যে সমতা—ব্যাপারটা অসাধারণই বটে। এই সমতা আছে বলেই একই উচ্চতা থেকে বিভিন্ন ভরের পড়ন্ত বস্তু একই ত্বরণ লাভ করে এবং একই সময়ে মাটিতে পৌঁছয়। এই ব্যাপারটা ধরে নিয়েই নিউটন তাঁর গতীয় সূত্র ও মহাকর্ষীয় সূত্র গড়ে তুলেছিলেন। এবং এই সূত্রের ওপরে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে আধুনিক বলবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারিং। কোথাও কোনো গণ্ডগোল দেখা যায়নি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিউটনের সূত্র অনুসারেই চলছে।

ব্যাপারটা সবাই মেনে নিয়েছিল, কেউ বুঝতে চায়নি বা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেনি। নিউটনের পরে দু-শো বছর ধরে এই ছিল

অবস্থা। কিন্তু আইনস্টাইন কখনো বিনা প্রশ্নে কোনো স্বতঃসিদ্ধ মানেননি, কোনো ধরাবাঁধা কথা স্বীকার করেননি। জড়ত্বীয় ভর ও মহাকর্ষীয় ভরের এই সমতাকে প্রকৃতির এক আকস্মিক ঘটনা হিসাবে মেনে নিতে তাঁর আপত্তি ছিল। পরবর্তী কালে লেখা একটি প্রবন্ধে তিনি বলছেন, 'এই সূত্র—যাকে সংজ্ঞাবদ্ধ করা চলে জড়ত্বীয় ভর ও মহাকর্ষীয় ভরের সমতার সূত্র হিসেবে—তাকে আমি তার সকল তাৎপর্য সমেত উপলব্ধি করলাম। সূত্রটির কোনো ব্যত্যয় নেই—তা দেখে আমি যৎপরোনাস্তি স্তম্ভিত হলাম। এবং অনুমান করলাম যে এই সূত্রের মধ্যেই রয়েছে জড়ত্ব ও মহাকর্ষের গভীরতর উপলব্ধির চাবিকাঠি।'

এই উপলব্ধি থেকেই আইনস্টাইন উদ্ভাবন করলেন মহাকর্ষের নতুন তত্ত্ব বা সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব।

আইনস্টাইন তাঁর কল্পনা থেকে একটি পরিস্থিতি তৈরি করলেন।

প্রকাণ্ড উঁচু একটি অট্টালিকা। এই অট্টালিকার লিফ্‌টের তার ছিঁড়ে গিয়েছে আর লিফ্‌টটি অবাধে উঁচু তলা থেকে নিচের তলায় নামছে। অবাধে নামছে, বা বলা চলে, পড়ছে—একটুকরো পাথর ওপর থেকে ছেড়ে দিলে যেমন পড়ে।

এই লিফ্‌টের ভিতরে একদল পদার্থবিজ্ঞানী রয়েছেন। বাইরে কী ঘটেছে বা ঘটছে তা তাঁরা জানেন না। লিফ্‌টের ভিতরে থেকে তাঁরা নানারকম পরীক্ষাকার্য চালাচ্ছেন। তাঁরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। লিফ্‌ট যে মাটিতে পড়ছে, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, এমন কোনো আশঙ্কা তাঁদের মনে নেই।

এই হচ্ছে পরিস্থিতি। এবারে দেখা যাক পদার্থবিজ্ঞানীরা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে কী ভাবতে পারেন।

ধরা যাক, পরীক্ষাকার্য করার জন্য তাঁরা পকেট থেকে নানাধরনের জিনিস বার করছেন—একটা কলম, একটা টাকা, একটা চাবি ইত্যাদি। তারপরে জিনিসগুলোকে তাঁরা শূন্যেই ছেড়ে দিচ্ছেন। কী দেখবেন তাঁরা? পরিস্থিতিটা মনে রাখা দরকার। পৃথিবীর মহাকর্ষের টানে (পৃথিবীর মহাকর্ষের টানকে বলা হয় অভিকর্ষ), বা

অভিকর্ষের টানে লিফ্‌ট যে-বেগে নিচে নামছে, সেই একই বেগে নিচে নামছেন পদার্থবিজ্ঞানীরাও, এবং সেই একই বেগে নিচে নামতে থাকবে তাঁদের হাত থেকে শূন্যে ছেড়ে দেওয়া জিনিসগুলোও। নিউটনের মহাকর্ষের সূত্রে তাই বলা হয়েছে—ভর যাই হোক, একই উচ্চতা থেকে পড়ন্ত সমস্ত জিনিস একই সময়ে একই বেগে মাটিতে পড়ে। লিফ্‌টের ভিতরেও তাই ঘটছে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা কী দেখবেন? জিনিসগুলো হাত থেকে শূন্যে ছেড়ে দেবার পরেও শূন্যেই থেকে যাচ্ছে—নিচে পড়ে না! জিনিসগুলো যেন ভারহীন—শূন্যেই ভাসে। এই দেখে পদার্থবিজ্ঞানীরা কী ভাববেন? তাঁদের ধারণা হবে, পৃথিবীর অভিকর্ষের বাইরে মহাশূন্যে তাঁরা রয়েছেন, ভারহীন অবস্থায়। ব্যাপারটা তাই কিনা পরখ করবার জন্য একজন হয়তো লিফ্‌টের মেঝে থেকে উঁচু দিকে লাফ দিলেন। তিনি সমানেই উঁচুতে উঠতে লাগলেন। উঠতে উঠতে লিফ্‌টের ছাদে তাঁর মাথা ঠেকল। একজন হয়তো শূন্যে ভাসমান কলমটাকে একদিকে একটা ধাক্কা দিলেন। কলমটা সেই দিকেই চলতে লাগল। চলতে চলতে লিফ্‌টের সেই দিকের দেওয়ালে ধাক্কা খেল। সবকিছুই যেন নিউটনের জড়ত্বীয় সূত্র মেনে চলছে—যা নিশ্চল তা তাই থাকে, যা সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল তাও তাই থাকে। নিউটনের গতীয় সূত্রও তাই। যে-ভাবেই হোক, লিফ্‌টটা যেন জড়ত্বীয় ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় লিফ্‌টের ভিতরকার পদার্থবিজ্ঞানীরা কোনো হদিস করতে পারবেন না। তাঁরা কি রয়েছেন এক মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে অবাধে পতনশীল অবস্থায়? নাকি, বাইরের সকল বল থেকে মুক্ত মহাশূন্যে? দুই অবস্থাতেই তাঁদের একই রকম অভিজ্ঞতা হবার কথা।

এবারে আইনস্টাইন দৃশ্যটা একটু বদলাচ্ছেন। পদার্থবিজ্ঞানীরা এখনো রয়েছেন সেই লিফ্‌টের ভিতরেই। কিন্তু লিফ্‌টটা প্রকৃতই রয়েছে মহাশূন্যে, অন্য সমস্ত জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ থেকে দূরে। লিফ্‌টের ছাদের ওপরে তার লাগানো আছে। কল্পনা করতে হবে, কেউ একজন সেই তার ধরে টানছে আর সেই টানে লিফ্‌ট সমমাত্রার ত্বরণে 'ওপরের' দিকে উঠছে। সমমাত্রার ত্বরণ মানে

লিফ্‌টের বেগ ক্রমেই সমান মাত্রায় বেড়ে বেড়ে চলা।

এই হচ্ছে পরিস্থিতি। এবারে দেখা যাক লিফটের ভিতরকার পদার্থবিজ্ঞানীরা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে কী ভাবতে পারেন।

তাঁরা লক্ষ করেন তাঁদের পা লিফ্‌টের মেঝের ওপরে শক্তভাবে এঁটে আছে। কেউ হয়তো লাফ দিলেন। তাঁর মাথা ছাদে ঠেকল না, মেঝে উঠে এসে পায়ের নিচে ঠেকেছে। একটা জিনিস হয়তো হাত থেকে ছেড়ে দেওয়া হল, মনে হবে জিনিসটা যেন মেঝেতেই 'পড়ছে'। আসলে মেঝেটাই উঠে এসে জিনিসটাকে ধরে ফেলেছে। একটা জিনিসকে হয়তো মেঝের সমান্তরাল পথে বিশেষ একটা দিকে ঠেলে দেওয়া হল। জিনিসটা সরলরেখায় সমবেগে সেই বিশেষ দিকেই চলতে থাকবে এমন ব্যাপার এবারে আর ঘটল না। তার বদলে জিনিসটাকে দেখে মনে হল যেন অধিবৃত্তাকার বক্রপথে মেঝের ওপরে গিয়ে পড়ছে (পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে কোনো জিনিস ছুঁড়লে জিনিসটা ঠিক যে-ভাবে গিয়ে মাটিতে পড়ে)। এমনটি মনে হওয়ার কারণ, জিনিসটা একই দিকে চলছে বটে কিন্তু মেঝে ওপরে উঠছে—উঠতে উঠতে ধরে ফেলছে জিনিসটাকে।

এইসব দেখে পদার্থবিজ্ঞানীদের ধারণা হবে, তাঁরা রয়েছেন এই পৃথিবীর মাটির ওপরেই। লিফ্‌টের ভিতরে সবকিছু ঘটছে পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে যেমনটি ঘটা উচিত তেমনিভাবে। তাঁরা ভাবতেও পারছেন না তাঁরা আসলে রয়েছেন মহাশূন্যে, তাঁদের লিফ্‌ট অদৃশ্য এক শক্তির টানে 'ওপরের' দিকে উঠছে।

কোনটি ঠিক? তাঁরা রয়েছেন এক মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবস্থায়? নাকি রয়েছেন মহাকর্ষের অস্তিত্বহীন মহাশূন্যে সমমাত্রায় ত্বরণশীল অবস্থায়? দুই অবস্থাতেই তাঁদের একই রকম অভিজ্ঞতা হবার কথা।

এবারে কল্পনা করা যাক মহাশূন্যে প্রকাণ্ড একটি নাগরদোলা ঘুরছে আর পদার্থবিজ্ঞানীদের কামরাটি নাগরদোলার কিনারে লাগানো। নাগরদোলা ঘুরছে, সেই সঙ্গে কামরাও ঘুরছে। এই অবস্থায় কামরার ভিতরে থেকে পদার্থবিজ্ঞানীদের মনে হবে কী একটা

শক্তি যেন তাঁদের নাগরদোলার কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। ওয়াকিবহাল কোনো ব্যক্তি যদি বাইরে থেকে নাগরদোলাটি দেখেন তাহলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন পদার্থবিজ্ঞানীদের বাইরের দিকে ঠেলছে কেন্দ্রাতিগ শক্তি (centrifugal force)। কোনো বস্তু যদি কেন্দ্রের চারদিকে বৃত্তাকারে ঘোরে তাহলে সেই বস্তু সবসময়েই বাইরের দিকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চায়। যেন একটা শক্তি বস্তুটিকে বাইরের দিকে ঠেলছে। এই শক্তির নাম কেন্দ্রাতিগ শক্তি। বস্তুটি যে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে না তার কারণ বস্তুটিকে কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে রাখার জন্য অন্য একটি শক্তি থাকে (টেনে ধরে রাখার এই শক্তিকে বলা হয় কেন্দ্রাভিগ শক্তি)। কিন্তু কামরার ভিতরে যে পদার্থবিজ্ঞানীরা রয়েছেন তাঁরা তো বাইরের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানেন না—তাঁদের কী ধারণা হবে? মনে রাখা দরকার, পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কামরায় কোনোরকম আসবাব বা সাজসজ্জা নেই। অর্থাৎ, এমন কোনো চিহ্ন নেই যা দেখে বলা চলে, এটা মেঝে, ওটা ছাদ, এটা দেওয়াল, ইত্যাদি। পদার্থবিজ্ঞানীরা শুধু অনুভব করবেন কামরার একটা বিশেষ দিকে টান। তখন, যে-দিকে টান সেই দিকটাই তাঁদের কাছে হয়ে উঠবে মেঝে। পায়ের নিচে টান নিয়ে মানুষ যেমন পৃথিবীর মাটির ওপরে দাঁড়ায় তেমনি তাঁরা দাঁড়াতে পারেন এই টানতে-থাকা ধারের ওপরে—অর্থাৎ, মেঝের ওপরে। তখন কী ধারণা হবে তাঁদের? ধারণা হবে, যে-টান তাঁরা অনুভব করছেন সেটা মহাকর্ষীয় টান।

এখানে একটা বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। মহাশূন্যে ওপর-নিচ বলে কিছু নেই। পৃথিবীতে যতোক্ষণ আছি ততোক্ষণ পৃথিবীর টানের দিকটাই আমাদের কাছে নিচের দিক। সূর্য থেকে যদি কেউ তাকিয়ে দেখত তাহলে তার মনে হত পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষরা মাটিতে পা রেখে ঝুলছে। কুমেরুর ওপর দিয়ে বিমান উড়ে গেলে তার মনে হত, বিমানটি উল্‌টে গিয়েছে আর, কুমেরুর তলা দিয়ে যাচ্ছে। আসলে দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষদের কাছেও পৃথিবীর টানের দিক-ই নিচের দিক।

কাজেই নাগরদোলার কিনারে লাগানো কামরার ভিতরকার পদার্থবিজ্ঞানীরাও টানের দিককেই ধরে নেবেন নিচের দিক বা মেঝে। এই মেঝের ওপরে তাঁরা শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারছেন। হাত থেকে শূন্যে জিনিস ছেড়ে দিলে সেই জিনিস মেঝের ওপরে পড়ছে। অর্থাৎ, আগের পরিস্থিতিতে যখন মহাশূন্যে তাঁদের কামরাটিকে টেনে 'ওপরে' তোলা হচ্ছিল তখন বিভিন্ন পরীক্ষাকার্য থেকে তাঁরা যে-সব ফল পেয়েছিলেন, এখনো হুবহু তাই পাচ্ছেন।

অতএব তাঁরা ধারণা করেন, তাঁরা আছেন একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবস্থায়।

এমনি কয়েকটি পরিস্থিতি বিবেচনা করে আইনস্টাইন বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত টানলেন। সিদ্ধান্তটিকে বলা হয় মহাকর্ষ ও জড়ত্বের সমতুলতার নিয়ম (Principle of Equivalence of Gravitation and Inertia)। এই নিয়মের কথা মাত্র এই-টুকু যে, জড়ত্বীয় বলের দ্বারা উৎপন্ন গতি আর মহাকর্ষীয় বলের দ্বারা উৎপন্ন গতি—এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ করার কোনো উপায় নেই। যেমন, রকেট উৎক্ষিপ্ত হবার পরে রকেটের যাত্রী যে-ধরনের শারীরিক অস্বস্তি ভোগ করে (যেন তার মাথা থেকে রক্ত টেনে নেওয়া হয়েছে, বিরাট এক বোঝা চাপিয়ে তাকে আসনের ওপরে চেপে ধরা হয়েছে), তেমনি অস্বস্তি ভোগ করে প্রচণ্ড বাঁক নেবায় সময়ে দ্রুতগামী বিমানের পাইলট। প্রথমটির হেতু মহাকর্ষীয় বল, দ্বিতীয়টির হেতু জড়ত্বীয় বল। শুধু অনুভব দিয়ে যদি বিচার করতে হয় তাহলে একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করা সম্ভব নয়।

সাধারণ আপেক্ষিকতার মূল কথা হচ্ছে এই নিয়মটি। এই নিয়মের মধ্যেই আইনস্টাইন খুঁজে পেলেন সেই সমাধান যা থেকে বোঝা গেল একদিকে মহাকর্ষ ও অন্যদিকে 'পরম' গতির সমস্যা। বোঝা গেল, অসমবেগের গতি অসাধারণ কিছু নয় বা 'পরম' নয়। এমনও যদি হয় যে অসমবেগের গতির অস্তিত্ব মহাশূন্যে এককভাবে রয়েছে, তাহলেও মহাকর্ষের ক্রিয়া থেকে তাকে আলাদা করে চেনা যায় না। যেমন সেই নাগরদোলার দৃষ্টান্তে। একজনের কাছে যা

জড়ত্বীয় টান বা কেন্দ্রাতিগ বল, অন্যজনের কাছে তাই মহাকর্ষীয় টান। গতির বা গতিমুখের পরিবর্তন ঘটলে যে জড়ত্বীয় ক্রিয়া ঘটে তা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ফলেও ঘটতে পারে। অর্থাৎ, গতিকে এককভাবে চিনে নেবার কোনো উপায় নেই। আপেক্ষিকতার মূলকথাও তাই। গতি যাই হোক, সমবেগের বা অসমবেগের, তার বিচার একমাত্র চলতে পারে কোনো ফ্রেমের সঙ্গে তুলনা করে। পরম গতি অস্তিত্বহীন।

এমনিভাবে আইনস্টাইন পরম গতির অস্তিত্বকে নাকচ করে দিলেন। বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে আইনস্টাইন আলোচনা করেছিলেন সমবেগসম্পন্ন গতি নিয়ে। তখন দেখা গিয়েছিল, সমবেগসম্পন্ন গতিমাত্রই আপেক্ষিক। অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা না করে এই গতি ধরা যায় না। কিন্তু অসমবেগের গতি বা ত্বরণযুক্ত গতির বেলায় মনে হয়েছিল, অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা না করেই এই গতি ধরা যায়। অর্থাৎ, ত্বরণযুক্ত গতিকে মনে হতে পারে 'পরম'। কিন্তু আইনস্টাইন দেখালেন, ত্বরণযুক্ত গতি যেমন হতে পারে জড়ত্বীয় তেমনি মহাকর্ষীয়। একটি থেকে অপরটিকে আলাদা করে চেনা যায় না। রূপকথার উপমা ব্যবহার করে বলা চলে, মহাকর্ষের তলোয়ার দিয়ে আইনস্টাইন পরম গতির দানবকে হত্যা করলেন। তাহলে আলোচনা করা দরকার, মহাকর্ষ কী? নিউটনের মহাকর্ষ থেকে আইনস্টাইনের মহাকর্ষ আলাদা কিসে?

প্রথমেই বলা দরকার, সম্পূর্ণ আলাদা। নিউটনের মহাকর্ষ একপ্রকারের 'বল'। আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তা নয়। নিউটন বলেছিলেন, দুই বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আইনস্টাইন বললেন, এই ধারণা ভুল। জগৎ-ব্যাপারকে আমরা ধরে নিই বৃহৎ একটা যন্ত্র হিসেবে, তাই অনায়াসেই ভাবতে পারি যে এই যন্ত্রের এক অংশ অন্য অংশের ওপরে বল আরোপ করতে পারে। আসলে বিশ্ব-ব্যাপার নিছক একটা যন্ত্রের সামিল নয়। তাই আইনস্টাইনের মহাকর্ষে বল সম্পর্কে কোনো কথা নেই। আছে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে বস্তুর আচরণের কথা। আকর্ষণের কথা নেই। আছে অনুসৃত

পথের কথা। আইনস্টাইনের কাছে মহাকষ হচ্ছে জড়ত্বেরই অংশ-মাত্র। গ্রহ ও তারার গতি তাদের অন্তর্নিহিত জড়ত্ব থেকেই উদ্ভূত। আর কোন পথ তারা অনুসরণ করবে তা নির্ভর করে স্পেসের বিন্যাসের ওপরে। বা, সঠিকভাবে যদি বলতে হয়, স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতার বিন্যাসের ওপরে।

কথাটা অবাস্তব মনে হতে পারে, বা এমনকি হেঁয়ালিপূর্ণ। কিন্তু অন্য একদিক থেকে ভাবলে এই কথার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না। নিউটন বলেছিলেন, দুই বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ, দুই বস্তুর মধ্যে থাকে একটা বল। মহাশূন্যে কোটি-কোটি কিলোমিটার দূরে থাকা সত্ত্বেও দুই বস্তু পরস্পরের ওপরে ক্রিয়াশীল হয় ও বল বিস্তার করে—এই হচ্ছে নিউটনীয় ধারণা। এই ধারণা বাতিল করা দরকার। এই যে 'দূরে-থেকে-ক্রিয়াশীলতা'—এই নিউটনীয় ধারণা এমনকি নিউটনের সময় থেকেই বিজ্ঞানীরা সহজে মেনে নিতে পারেননি, কেননা তার ফলে অন্য নানা ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধে দেখা দিচ্ছিল। যেমন, উল্লেখ করা চলে, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ব্যাপারে।

চুম্বকের কথাই ধরা যাক। চুম্বক একটুকরো লোহাকে 'আকর্ষণ' করে। কেন? জবাবে একালের কোনো বিজ্ঞানী বলবেন না যে চুম্বক লোহার টুকরোকে 'আকর্ষণ' করে অজানা কিন্তু তাৎক্ষণিক দূরে-থেকে-ক্রিয়াশীলতার দ্বারা। তাঁরা বরং বলবেন, চুম্বক তার চারদিকের স্পেসে একটা ভৌতিক অবস্থা সৃষ্টি করে, যাকে বলা হয় চৌম্বক ক্ষেত্র (magnetic field)। লোহার ওপরে ক্রিয়া ঘটে এই চৌম্বক ক্ষেত্রের এবং তার ফলে লোহার বিশেষ আচরণ দেখা যায়। বিশেষ আচরণটি কেমন তাও আমরা আগে থেকে বলে দিতে পারি। একটি চুম্বকের চারধারে লোহার গুঁড়ো ছড়াবার পরে যদি টোকা দিয়ে দিয়ে গুঁড়োগুলোকে নড়ানো যায় তাহলে গুঁড়োগুলো বিশেষ একটি চেহারায় বিন্যস্ত হয়ে ওঠে। এই হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র।

চৌম্বক ক্ষেত্র যেমন আছে তেমনি আছে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র। দুই-ই বাস্তব সত্য। দুয়েরই আছে নির্দিষ্ট গড়ন। গড়নটি কেমন তা বলা হয়েছে জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্‌সওয়েলের সমীকরণে। সেটি জানা

গিয়েছিল বলেই বৈদ্যুতিক ও রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে এতসব আবিষ্কারের হদিস পাওয়া গিয়েছে।

তেমনি বাস্তব সত্য হচ্ছে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। এই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রেরও একটি গড়ন আছে। সেটি কেমন তা জানা গিয়েছে আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে।

ম্যাক্সওয়েল ও ফ্যারাডে বলেছিলেন, চুম্বক তার চারপাশের স্পেসে একটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, চুম্বক থাকার জন্য চুম্বককে ঘিরে থাকা স্পেস বিশেষ গুণ লাভ করে। তেমনি আইনস্টাইন বললেন, চাঁদ গ্রহ তারা ও অন্য প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্ক নিজের নিজের চারদিকের স্পেসে বিশেষ গুণ সৃষ্টি করে। চৌম্বক ক্ষেত্রের মতো এই হচ্ছে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। চৌম্বক ক্ষেত্রের গড়নের ওপরে যেমন নির্ভর করে একটুকরো লোহা সেই চৌম্বক ক্ষেত্রে কেমনভাবে চলবে, তেমনি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের গড়নের ওপরে নির্ভর করে সেই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে কোনো বস্তুর চলন কেমন হবে।

মহাকর্ষ সম্পর্কে নিউটনের ধারণা ও আইনস্টাইনের ধারণার তফাৎটা বোঝাবার জন্য অনেক সময়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়ে থাকে। শহরের রাস্তায় একটি ছেলে মার্বেল খেলছে। রাস্তা খুবই এবড়োখেবরো—তার কোথাও ঢিবি, কোথাও গর্ত। ছেলেটি মার্বেল ছুঁড়ছে আর সেই মার্বেলের গতিবিধি লক্ষ করছে রাস্তার ধারের একটি বাড়ির দশতলা থেকে একজন ও একতলা থেকে আরেকজন। রাস্তা এবড়োখেবড়ো হওয়ার জন্য মার্বেলের চলাটাও হয়ে যাচ্ছে আঁকাবাঁকা। দশতলা থেকে যে দেখে, রাস্তার এবড়োখেবড়ো তার চোখে পড়ে না। মার্বেলের আঁকাবাঁকা চলন দেখে তাই সে ধরে নেয় মার্বেলটা কোথাও যেন দূরে সরে যাচ্ছে, কোথাও যেন কাছে এগিয়ে আসছে। ঠিক যেন একটা বল কাজ করে যাচ্ছে, এই বলের ক্রিয়াতেই কোথাও ঠেলা কোথাও টান। কিন্তু একতলার দর্শক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রাস্তাটাই এবড়োখেবড়ো। অর্থাৎ, মার্বেল যার ওপর দিয়ে চলছে সেই ক্ষেত্রটাই বক্র। ক্ষেত্রের বক্রতার জন্যই মার্বেলের চলা আঁকাবাঁকা। দশতলার দর্শক হচ্ছেন নিউটন, একতলার দর্শক আইনস্টাইন।

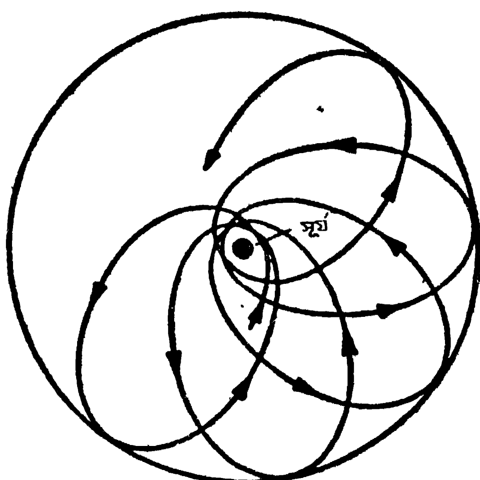
মহাকর্ষকে নিউটন দেখছেন বল হিসেবে, আইনস্টাইন ক্ষেত্র হিসেবে। আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় সূত্রে তাই শুধু বলা হয় স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা। যেমন, কয়েকটি সূত্রে উপস্থিত করা হয়েছে মহাকর্ষ-সম্পন্ন বস্তুর ভরের সঙ্গে তার চারদিকের ক্ষেত্রের কাঠামোর সম্পর্ক। অন্য কয়েকটি সূত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে গতিশীল বস্তুর পথ। প্রথম সূত্রগুলো কাঠামো সম্পর্কে, দ্বিতীয় সূত্রগুলো গতি সম্পর্কে।

মনে হতে পারে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের গড়ন এবং সেই ক্ষেত্রে গতিশীল বস্তুর পথ সম্পর্কে আইনস্টাইনের সূত্রগুলো বুঝি নিছক কতকগুলো গাণিতিক পরিকল্পনা। তা নয়। সূত্রগুলো দাঁড়িয়ে আছে মহাজাগতিক ব্যাপারে কতকগুলো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অনুমানের ওপরে। যেমন, অনুমান করা হয়েছে, মহাবিশ্বের ইমারতটি তেমন দৃঢ়বদ্ধ ও অপরিবর্তনীয় নয়, এমন নয় যেখানে আলাদা আলাদা বস্তু আলাদা আলাদা স্পেস ও সময়ের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। মহাবিশ্ব এক নিরবয়ব নিরবচ্ছিন্নতা, যার কোনো নির্দিষ্ট স্থাপত্য নেই। মহাবিশ্ব নমনীয় ও পরিবর্তনশীল – অনবরত বদলাচ্ছে, অনবরত বিকৃত হচ্ছে। যেখানেই বস্তু ও গতি থাকে, সেখানেই নিরবচ্ছিন্নতা বিচলিত হয়। মাছ যখন সমুদ্রের মধ্যে সাঁতার কাটে তখন তার চারদিকের জল আলোড়িত হয়। ঠিক তেমনি বিকৃত হয় স্পেস-সময়ের বিন্যাস যখন তার মধ্যে দিয়ে গতিশীল হয় কোনো তারা বা ধূমকেতু বা ছায়াপথ।

জ্যোতিষিক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় সূত্রের যা ফল, নিউটনের মহকর্ষীয় সূত্রেরও প্রায় তাই। সব ক্ষেত্রেই যদি তাই হত তাহলে বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরিচিত নিউটনের সূত্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন এবং আইনস্টাইনের সূত্রকে উদ্ভট কল্পনা বলে বাতিল করতেন। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতার ভিত্তিতেই কতকগুলো অদ্ভুত নতুন ব্যাপার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং একটি পুরনো হেঁয়ালির সমাধান পওয়া গিয়েছে। হেঁয়ালিটা ছিল বুধগ্রহের চলনে খানিকটা বেনিয়ম নিয়ে। অন্যান্য গ্রহের মতো বুধগ্রহ তার উপ-বৃত্তাকার কক্ষে ঠিক যেন নিয়মমতো চলে না। প্রতি বছরেই তার

চলার পথ থেকে বুধগ্রহ একটু যেন সরে যায়। সরে অতি সামান্যই, কিন্তু তবুও তার কোনো ব্যাখ্যা কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। বিজ্ঞানীরা অবশ্য ব্যাখ্যা খুঁজছিলেন নিউটনীয় তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে থেকে। ব্যাখ্যা পাওয়া গেল আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় তত্ত্ব হাতে আসার পরে।

সূর্যের চারদিকে যতোগুলো গ্রহ আছে তাদের মধ্যে বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছে। এই গ্রহটি ছোট এবং সূর্যের চারদিকে ঘোরে প্রচণ্ড বেগে।* নিউটনের সূত্র অনুসারে শুধু এই কারণে বুধের চলনে



সূর্যের চারদিকে বুধের উপবৃত্তাকার কক্ষের আবর্তন। ছবিতে ব্যাপারটাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। আসলে বুধের কক্ষ সারা বছরে অগ্রসর হয় ৪৩ সেকেণ্ড পরিমাণ চাপ।

কোনো বিচ্যুতি ঘটা উচিত নয়—অন্যান্য গ্রহের যেমন বুধেরও তাই হওয়া উচিত। কিন্তু আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় সূত্র দিয়ে বিচার করলে

---

* বুধের ব্যাস ৪,৮৮০ কিলোমিটার (পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৫৭ কিলোমিটার)। বুধ সূর্যের চারদিকে ঘোরে সেকেণ্ডে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার গড় বেগে (পৃথিবী ২৯·৭৯ কিলোমিটার)। বুধের কক্ষের উৎকেন্দ্রতা ০·২০৬ (পৃথিবীর কক্ষের ০·০১৭)। অর্থাৎ, বুধের কক্ষ খুবই চ্যাপটা ধরনের উপবৃত্ত।

বলতে হয়, বুধের চলনে কিছুটা পার্থক্য আসতেই পারে। তার কারণ, সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তীব্রতা ও বুধের প্রচণ্ড বেগ। এই কারণে বুধের কক্ষপথের গোটা উপবৃত্তটি সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে। ঘোরে খুবই আস্তে আস্তে, তিন লক্ষ বছরে একবার -- তবুও দেখা গেল বুধের চলনে যতটুকু বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে তার সঙ্গে এই হিসেবের মিল আছে। তার মানে, বলতে হয়, উচ্চ বেগ ও জোরালো মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র নিয়ে যখন বিচার হয় তখন নিউটনের সূত্রের চেয়ে আইনস্টাইনের সূত্র অনেক বেশি সঠিক।

এমনিভাবে বুধগ্রহের চলনের খামখেয়ালিপনার হদিস পাওয়া গেল। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আইনস্টাইনের অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী—তা হচ্ছে আলোর ওপরে মহাকর্ষের ক্রিয়া সম্পর্কিত। আলোর ওপরে মহাকর্ষের যে কোনো ক্রিয়া থাকতে পারে তা অন্য কোনো বিজ্ঞানী স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

আলোর ওপরে মহাকর্ষের ক্রিয়া সম্পর্কে আইনস্টাইন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন অন্য একটি কাল্পনিক পরিস্থিতি বিচার করার পরে। দৃশ্যটি এবারেও সেই আগের মতোই। মহাশূন্যে একটি লিফ্‌ট সমান মাত্রার ত্বরণ নিয়ে ওপরে উঠছে আর সেই লিফটের মধ্যে রয়েছেন একদল বিজ্ঞানী। এখন কল্পনা করা যাক, মহাশূন্য থেকে একজন বন্দুকধারী লিফ্‌টের দিকে তাক করে বন্দুক ছুঁড়ল। বুলেটটা লিফ্‌টের একদিকের দেয়াল ফুটো করে ভিতরে ঢুকল, ভিতরটা পার হল, তারপরে উল্‌টো দিকের দেয়াল ফুটো করে বেরিয়ে গেল। ভিতরে ঢোকার সময়ে দেয়ালে যেখানে ফুটো হয়েছিল তার চেয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার সময়ে দেয়ালের ফুটো সামান্য একটু নিচে। এমনটি হবার কারণ, বুলেট যখন লিফ্‌টের ভিতর পার হচ্ছিল তখনো লিফ্‌ট 'ওপরে' উঠছে। ভিতর পার হয়ে উল্‌টো দিকের দেয়ালে পৌঁছতে খানিকটা সময় লাগছেই, সেই সময়ের মধ্যে সেই দেয়াল খানিকটা ওপরে উঠছেই—অতএব বুলেটের ভিতরে ঢোকার সময়কার ফুটো আর বুলেটের বাইরে বেরিয়ে যাবার সময়কার ফুটো একই উচ্চতায় হতে পারে না। দ্বিতীয় ফুটোটি একটু

নিচুতে হবেই।

কিন্তু লিফ্‌টের ভিতরকার বিজ্ঞানীদের কী ধারণা হবে? তাঁরা দেখলেন মাথার ওপর দিয়ে একটি বুলেট চলে গেল। বুলেটটি ভিতরে ঢোকার সময়ে যতোখানি উচ্চতায় ছিল, বাইরে বেরিয়ে যাবার সময়ে তার চেয়ে খানিকটা নিচে। তাঁদের ধারণা হবে, বুলেটটি লিফ্‌টের ভিতর পার হল সরলরেখায় নয়, অধিবৃত্তাকার পথে। পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও ঠিক এমনি পথে বুলেটকে তাঁরা যেতে দেখতেন। অতএব তাঁদের এমন ধারণা না হবার কোনো কারণ নেই যে তাঁরা রয়েছেন একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবস্থায়।

এবারে অন্য একটি দৃশ্য কল্পনা করতে হবে। লিফ্‌ট তেমনি সমান ত্বরণ নিয়ে ওপরে উঠছে। লিফ্‌টের ভিতরে বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ আবদ্ধ রয়েছেন। ফলে তাঁরা ধারণা করছেন তাঁরা রয়েছেন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবস্থায়। এবারে অন্য একটি কাণ্ড ঘটল। মহাশূন্য থেকে এক ঝলক আলো এসে পড়ল লিফ্‌টের একদিকের দেয়ালে একটা ফোকরের ওপরে, ফোকর দিয়ে ভিতরে ঢুকল, উল্‌টো দিকের দেয়ালের গায়ে ঘা দিল। লিফ্‌ট কিন্তু সমানে ওপরে উঠছেই। অন্যদিকে লিফ্‌টের ভিতরটা পার হতে, যতো সামান্যই হোক, আলোর কিছুটা সময় লাগছেই। ফলে, উল্‌টো দিকের দেয়ালে যেখানে গিয়ে আলো ঘা দিচ্ছে তার উচ্চতা, যতো সামান্যই হোক, কিছুটা কমছেই। তাহলে লিফ্‌টের ভিতরে যে বিজ্ঞানীরা রয়েছেন তাদের কী ধারণা হবে? আমরা ধরে নিচ্ছি, বিজ্ঞানীদের হাতে এমন যন্ত্রপাতি আছে যা দিয়ে মাপজোক নিয়ে তাঁরা ধরে ফেলেছেন লিফ্‌টের একদিকের দেয়ালের যতোখানি উচ্চতায় আলো ভিতরে ঢুকেছে অন্যদিকের দেয়ালে তার চেয়ে কম উচ্চতায় লিফ্‌ট থেকে বাইরে বেরিয়েছে। অন্যদিকে নিজেদের সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা, তাঁরা রয়েছেন এক মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবস্থায়। নিউটনের নিয়ম অনুসারে তাঁরা অবশ্যই আশা করবেন, আলো চলবে সরল রেখায়। অথচ তাঁরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন, লিফ্‌টের ভিতরে আলো বেঁকে গিয়েছে। তখন, তাঁরা যদি বিশেষ

আপেক্ষিকতার তত্ত্বের কথা জেনে থাকেন, তাঁদের মনে পড়বে শক্তিরও ভর আছে ($E = mc^2$)। আলো হচ্ছে একপ্রকারের শক্তি, অতএব আলোরও ভর আছে। ভর থাকার জন্যই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে আলোর ওপরে ক্রিয়া ঘটেছে এবং আলো বেঁকে গিয়েছে।

এই পরিস্থিতি বিচার করেই আইনস্টাইন একটি সিদ্ধান্ত করলেন। কোনো বিপুল বস্তুর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র পার হবার সময়ে বাস্তব পদার্থের মতো আলোও বেঁকে যায়। আইনস্টাইন বললেন, কথাট ঠিক কিনা তা পরখ করা যেতে পারে সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে তারার আলোর পথ পর্যবেক্ষণ করে। কী ভাবে? দিনের বেলা তো কোনো তারা দেখা যায় না। একমাত্র সূর্যগ্রহণের সময়ে সূর্য ও তারা একই সঙ্গে দেখা যেতে পারে। আইনস্টাইন প্রস্তাবা করলেন, সূর্যগ্রহণের সময়ে সূর্যের কালো চাকতির কিনারে থাকা কোনো তারার ছবি নেওয়া হোক। সেই ছবি মিলিয়ে দেখা হোক অন্য সময়ে তোলা সেই তারার ছবির সঙ্গে। অন্য সময়ে মানে সূর্য না-থাকা সময়ে, যখন তারার আলোকে সূর্যের কিনার ঘেঁষে আসতে হচ্ছে না। এই দুটি ছবি মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র পার হবার সময়ে তারার আলো সত্যিই বেঁকেছে কিনা।

প্রস্তাবটি আইনস্টাইন তুলেছিলেন তাঁর ১৯১১ সালের প্রবন্ধেই। বলেছিলেন, 'সূর্যের নিকটবর্তী আকাশের এলাকায় স্থির নক্ষত্রগুলো সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময়ে দৃশ্যমান হয়। এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে তত্ত্বের ফলাফলকে পরীক্ষাকার্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।' প্রবন্ধটি এই বলে শেষ করেন, 'এখানে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেটি যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হাতে নেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। কেননা, তত্ত্বের কথা বাদ দিলেও, এই প্রশ্ন তো আছেই যে যন্ত্রপাতি এখন যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে আলোর চলাচলে মহাকর্ষের প্রভাব ধরা যায় কিনা।'

এই প্রস্তাবে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। সেই ১৯১৪ সালেই, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে, একদল জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী রুশদেশের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। সেখানে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ

হবার কথা ছিল। কিন্তু কোনো মাপজোক নিতে পারার আগেই তাঁরা যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন (কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁরা ছাড়া পান, কিন্তু যন্ত্রপাতি ফিরে পাননি)। মাপজোক যদি তাঁরা নিতে পারতেন তাহলে নিশ্চয়ই প্রমাণ হত যে সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে তারার আলো বেঁকে যায়।

কতখানি বেঁকবে তার একটা হিসেবও আইনস্টাইন দিয়েছিলেন। জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যদি সত্যিই বাঁকের হিসেব নিতে পারতেন তাহলে দেখা যেত আইনস্টাইনের মাপের চেয়ে বাস্তবের মাপ দ্বিগুণ বেশি। এ থেকে মনে হয় ১৯১১ সালের প্রবন্ধে আইনস্টাইনের কিছু অনুমান ভুল ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে আইনস্টাইন নিজেই তা ধরতে পেরেছিলেন।

এই সময় থেকে আইনস্টাইন তাঁর গবেষণা-কর্মে গণিতের সারকে আরো বেশি করে ধরতে পেরেছিলেন। কথাটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: বিজ্ঞানীরা সাধারণত নানারকম পরীক্ষাকার্য করেন এবং তা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। তারপরে সেই তথ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি তত্ত্বে পৌঁছন। কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন কোনো তথ্য থেকে নয়, গণিত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি যেন অনেকখানি সরে এলেন। গোড়ার দিকের গবেষণা-কর্মে তিনি বস্তুজগতের ক্রিয়াকাণ্ডের অর্থ ও তাৎপর্য ধরতে চাইতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর গবেষণা-কর্মের সঙ্গে বস্তুজগতের ক্রিয়াকাণ্ডের সরাসরি সম্পর্ক না-থাকার মতো। তিনি কোনো পরীক্ষাকার্যের দ্বারা চালিত হন না। পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয়েছে তাঁর তত্ত্ব প্রকাশিত হবার কয়েক বছর পরে। এমনও বলা যেতে পারে, তিনি চালিত হন চিন্তাভাবনার দ্বারা। এবং তার ফলে একটি তত্ত্বেও পৌঁছতে পারেন, যে তত্ত্বের শক্তি অতি বিপুল। তখন তাঁর নিজেরও প্রত্যয় হয় যে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে একটা ধারণায় পৌঁছতে মানুষের মনের ক্ষমতা অসাধারণ। এ-প্রসঙ্গে তাঁর একটি বক্তৃতা থেকে কয়েকটি লাইন তোলা যেতে পারে। বক্তৃতাটি তিনি দিয়েছিলেন অক্সফোর্ডে ১৯৩৩

সালের জুন মাসে, তার বিষয় ছিল 'তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার পদ্ধতি'।

> আমাদের এতাবৎ কালের অভিজ্ঞতা থেকে সঙ্গতভাবেই বিশ্বাস করতে পারি, প্রকৃতি হচ্ছে সরলতম কল্পনালভ্য গাণিতিক ধারণার উপলব্ধি। আমার এই প্রত্যয় হয়েছে যে বিশুদ্ধ গাণিতিক নির্মাণ-কার্যের সহায়তায় আমরা আবিষ্কার করতে পারি সেই সমস্ত ধারণা ও তাদের মধ্যেকার সেই সমস্ত বিধিসঙ্গত সম্পর্ক যা থেকে আমরা পেতে পারি প্রাকৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডকে উপলব্ধি করার চাবিকাঠি। অভিজ্ঞতা থেকে যথাযথ গাণিতিক ধারণার হদিস পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে তা কিছুতেই অনুমেয় নয়। অভিজ্ঞতা অবশ্যই গাণিতিক নির্মাণকার্যের ভৌতিক কার্যকারিতার একমাত্র নিরিখ। কিন্তু সৃজনমূলক নীতির অবস্থান গণিতে। অতএব, এক অর্থে আমি একথা সত্য বলে বিশ্বাস করি যে বিশুদ্ধ চিন্তার দ্বারা বাস্তবতাকে ধরা সম্ভব, প্রাচীনরা যেমন স্বপ্ন দেখতেন।

সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মধ্যে একটি বড়ো কথা এই যে পরম শূন্য স্পেসের বাস্তব অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আইনস্টাইন বলতেন, 'স্পেস বস্তু নয়।' স্পেস ও সময়কে ধরবার জন্য চাই মাপনদণ্ড ও ঘড়ি। আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি, বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে এই মাপনদণ্ড ও ঘড়ি বড়োরকমের ভূমিকা নিয়েছে। ভূমিকা আছে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বেও – তা আরও মার্জিত। বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব 'বিশেষ' এই কারণে যে তার আলোচনার বিষয় একধরনের গতি—সরলরেখায় সমবেগের গতি। নিউটন নিজেও বিশ্বাস করতেন, সরলরেখায় চলা সমবেগের গতিকে স্থিতিশীল অবস্থা থেকে পৃথক করা যায় না। কিন্তু নিউটনের মতে ত্বরণ হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক এক ব্যাপার। আমরা যদি ত্বরণযুক্ত হই তাহলে তা টের পাই—কেননা তখন আমরা ঠেলা বা টান অনুভব করি। এ থেকে মনে হতে পারে, শূন্য স্পেসেও ত্বরণের মাপ নেওয়া যেতে পারে।

নিউটন যে-সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার অনেকগুলোই আবর্তন-সংক্রান্ত। একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। দুটি ওজন একটি দড়ি দিয়ে

বাঁধা আছে। একটি মধ্যবিন্দুর চারদিকে ওজনদুটিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। দড়িতে বাঁধা থাকার জন্য ওজনদুটি ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারবে না, ঘুরতেই থাকবে, আর দড়িতে একটা টান পড়বে। নিউটন ভেবেছিলেন, দড়ির এই টানের মাপ থেকে আবর্তনশীল ওজনের ত্বরণের মাপ পাওয়া যেতে পারে।

ব্যাপারটা এই যে দুটি ওজন ঘুরে চলছে বা আবর্তিত হচ্ছে। নিউটনের সূত্র দিয়ে বিচার করলেও বলতে হয় কিছু বল এই দুটি ওজনের ওপরে ক্রিয়াশীল তবেই-না ওজনদুটি আবর্তিত হচ্ছে। কী সেই বল? ব্যাপারটা বোঝার জন্য একালের একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। রেডিও ও টি-ভি প্রচারের জন্য আজকাল ভূ-স্থির (synchronous) উপগ্রহ আকাশে তোলা হয়। এমন উপগ্রহ যা পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হয় স্থির। আসলে এই উপগ্রহকে এমন এক কক্ষে স্থাপন করা হয় যাতে কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরতে উপগ্রহের সময় লাগে চব্বিশ ঘণ্টা। সেই একই সময়ে পৃথিবীও নিজের অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরছে। ফলে পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হয় উপগ্রহটি স্থির। মনে করা যাক এমনি একটি ভূ-স্থির উপগ্রহ বিষুবরেখার ওপরে আকাশে তোলা হয়েছে। বিষুবরেখা থেকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে উপগ্রহটি স্থির। তখন নিউটনের সূত্র অনুসারেই বলা চলে, উপগ্রহটি যেহেতু স্থির অতএব তার ওপরে কোনো বলের ক্রিয়া নেই। কিন্তু আমরা জানি, অভিকর্ষের বল উপগ্রহটিকে নিচের দিকে টানছে। অতএব, নিউটনের সূত্র অনুসারেই বলতে হয়, এমন কোনো বল নিশ্চয়ই উপগ্রহটির ওপরে ক্রিয়াশীল যা উপগ্রহটিকে ওপরের দিকে ঠেলছে। এই বলের নাম কেন্দ্রাতিগ বল।

এই কেন্দ্রাতিগ বল কিছুটা অসাধারণ ধরনের। এই কারণে যে আশেপাশে অন্য কোনো বস্তুর থাকা না-থাকার সঙ্গে এই বলের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা জানি, অন্য কোনো বস্তু কাছে থাকলে মহাকর্ষের বল তৈরি হয়। বৈদ্যুতিক চার্জবিশিষ্ট বস্তু থাকলে বৈদ্যুতিক বল তৈরি হয়। কিন্তু কেন্দ্রাতিগ বলের বেলায় ব্যাপারটা অন্য রকম। এক্ষেত্রে অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্কের

প্রয়োজন থাকছে না। শূন্য স্পেসের মধ্যে থেকেই কেন্দ্রাতিগ বল তৈরি হচ্ছে। যেন শূন্য স্পেসের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক থেকেই কেন্দ্রাতিগ বল তৈরি হচ্ছে। পরিস্থিতিটা যে কী অদ্ভুত আইনস্টাইন তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কল্পনা করা যাক এই বিশ্ব দুটি একই রকমের গোলক দিয়ে গঠিত। গোলকদুটি প্লাস্টিক-জাতীয় উপকরণে তৈরী, যার আকার বদলাতে পারে। নিউটনের পদার্থবিদ্যায় যদি থাকি তাহলে পরিস্থিতি এমনও হতে পারে যে একটি গোলকের পেটের দিকটা ফুলে উঠে তার আকার হয়ে উঠল উপবৃত্তাকার গোলকের মতো, অপরটি থেকে গেল বৃত্তাকার গোলক। অথচ দুটি গোলককেই বাইরের কোনো বস্তুর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা হয়েছে এবং গোলকদুটির একের প্রভাব অপরের ওপরে একই রকম। এমনি পরিস্থিতি তখনই হয় যখন একটি গোলক আবর্তিত হয় কিন্তু অপর গোলক স্থির। গোলক আবর্তিত হলে কেন্দ্রাতিগ বলের ক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে গোলকের পেটের দিকটা ফুলে ওঠে। নিউটনের পদার্থবিদ্যায় থেকে একথা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, এই কেন্দ্রাতিগ বলের কারণ কী? নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় জবাব শুধু এইটুকুই যে শূন্য স্পেসে বা পরম স্পেসে গোলকটি আবর্তিত হচ্ছে। নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় এই জবাবই দিতে হয়। কেন্দ্রাতিগ বলের কল্পনা না করলে বলের সঙ্গে ত্বরণের সম্পর্কের সূত্রটি অসিদ্ধ হয়ে যায়। একই কারণে ভূ-স্থির উপগ্রহের বেলাতেও কেন্দ্রাতিগ বলের কল্পনা করতে হয়েছিল। কেননা কেন্দ্রাতিগ বল না থাকলে থাকে শুধু অভিকর্ষের টান। তাহলে তো উপগ্রহটির মাটিতে নেমে আসা উচিত।

নিউটনের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রথম যিনি সমালোচনা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন নিউটনেরই সমসাময়িক আইরিশ দার্শনিক বিশপ বার্ক্‌লে।*

* বিশপ জর্জ বার্ক্‌লে (১৬৮৫-১৭৫৩) ছিলেন ধর্মযাজক, দার্শনিক, রয়্যাল সোসাইটির ফেলো, এবং 'এ ট্রীটিজ কন্‌সার্নিং দ্য প্রিন্‌সিপিল্‌স অফ হিউম্যান নলেজ' গ্রন্থের লেখক। সময়কে তিনি আপেক্ষিক হিসেবে ধারণা করেছিলেন, নিউটনের ধারণার সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল। উঁচুদরের লেখক ছিলেন তিনি এবং দর্শনের ইতিহাসে এক প্রখর মননসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

'প্রিন্‌সিপিয়া' প্রকাশিত হবার কুড়ি বছর পরে তিনি বললেন, শূন্য স্পেসের প্রভাবে বল তৈরি হচ্ছে—কথাটাই অর্থহীন। তিনি আরও বলেছিলেন, হয়তো দূরের কোনো আবর্তনশীল তারার প্রভাবে ব্যাপারটা ঘটলেও ঘটতে পারে। তৎকালীন বিজ্ঞানীরা বিশপ বার্ক্‌লের কথাকেই অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। মহাকর্ষ সম্পর্কে নিউটনের ধারণার সঙ্গে বিশপ বার্ক্‌লের কথাকে খাপ খাইয়ে নেবার কোনো পথই ছিল না। তারপরের দু-শো বছরে এই নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। এমনি চলেছিল উনিশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত।

বিশপ বার্ক্‌লের বক্তব্যকে আরো জোরালোভাবে যিনি উপস্থিত করলেন তিনি হচ্ছেন আর্নস্ট মাখ্‌।* বললেন, ত্বরণযুক্ত বস্তুর আচরণে তারা ইত্যাদি দূরের বস্তুর প্রভাব পড়ে এবং তারই ফলে কেন্দ্রাতিগ বল তৈরি হয়। নিউটন দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

* আর্নস্ট মাখ্‌ (১৮৩৮-১৯১৬)—অস্ট্রিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞানের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তক। তরুণ আইনস্টাইনের ওপরে তাঁর বিরাট প্রভাব পড়েছিল। ১৮৯৭ সালে আইনস্টাইনের বন্ধু বেসো আইনস্টাইনকে মাখ্‌-এর একটি বই পড়তে দিয়েছিলেন—'সায়েন্স অফ মেকানিক্‌স' (বলবিদ্যার বিজ্ঞান)। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বিকাশে এই বইটি একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক রচনা। বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছিল নিউটনীয় বলবিদ্যার বিরুদ্ধে কড়া বিতর্ক। আইনস্টাইন স্বীকার করেছেন, আপেক্ষিকতার গঠনে দার্শনিক ভিত্তির জন্য নিউটনীয় বলবিদ্যা সম্পর্কে মাখ্‌-এর বিশ্লেষণের কাছে তিনি ঋণী। নির্মম সমালোচক মাখ্‌ পদার্থবিদ্যার ভিত্তির মধ্যেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিপাত করেছিলেন। চেয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানকে অধিবিদ্যা থেকে মুক্ত করতে। অধিবিদ্যা বলতে বুঝতেন সেই জিনিস যা সরাসরি অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সবসময়ে যে নির্ভুল ধারণা পোষণ করতেন তা নয়। যেমন, জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত পরমাণুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন। আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছবার পরে মাখ্‌বাদ বর্জন করেন। তাঁর বন্ধু বেসো কিন্তু আজীবন একান্ত অনুগত মাখ্‌পন্থী থেকে যান। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে কিছু চিঠি লেখালেখিও হয়। সাধারণের কাছে মাখ্‌-এর অন্য খ্যাতি মাখ্‌ সংখ্যার জন্য। এটা হচ্ছে বায়ুর গতির মাপ, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ও চাপে, বিমানের ডানা বা অনুরূপ গতিশীল বস্তুর ওপর দিয়ে।

এমন একটি অবস্থা যদি কল্পনা করা যায় যে এই বিশ্বে কোথাও আর কিছু নেই, শুধু একটি গোলক ঘুরছে, তাহলেও সেই গোলকে কেন্দ্রাতিগ বল তৈরি হবে। মাখ্ বললেন, এমন অবস্থা আদৌ সম্ভব নয়, বিশ্বে আর কিছু থাকবে না, দূরের তারা পর্যন্ত নয়, তা কি করে হয়? দূরের তারার ক্রিয়া থাকবেই থাকবে। আইনস্টাইনের একটি গোলক যদি শূন্য বিশ্বে আবর্তিত হতে থাকে তাহলে কী হয় তা নিয়ে কোনো পরীক্ষাকার্য সম্ভব নয়। কেননা, শূন্য বিশ্ব হতেই পারে না। এমনি-ভাবে, নিউটন যেখানে বলকে সম্পর্কিত করেছিলেন স্পেসের সঙ্গে, মাখ্ করলেন বিশ্বের অবশিষ্ট বস্তুর সঙ্গে। মাখ্ তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে একটি পরীক্ষাকার্যের উল্লেখ করলেন। পরীক্ষাকার্যটির নাম ফুকো দোলক (Foucault Pendulum)।

পৃথিবীর উপরিতলে নির্দিষ্ট একটি স্থানে একটি দোলক ঝুলিয়ে দেওয়া হল। শক্তভাবে এঁটে নয়, এমন আলগা ভাবে যেন দোলকটি বিনা বাধায় ঘুরে যেতে পারে। দোলকটি দুলতে থাকুক। লক্ষ করলে দেখা যাবে, দোলকটির দোলনের তল একটু একটু করে ঘুরে যাচ্ছে। তার মানে, দোলকটিই ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে পুরো একটি পাক ঘুরতে সময় নেয় পুরো একটি দিন। উত্তর গোলার্ধ হলে দোলকের এই ঘোরাটা হবে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে। কিন্তু একই সঙ্গে অন্য একটি আশ্চর্য ব্যাপারও লক্ষ করা যায়। আকাশের স্থির তারার সঙ্গে বিচারে দোলকের দোলনের তল একই রকম থেকে যাচ্ছে। ব্যাপারটার ব্যাখ্যা এই যে পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে ঘুরছে, তাই পৃথিবীর দর্শকের মনে হচ্ছে দোলকের দোলনের তলটি ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু আকাশের স্থির তারার সঙ্গে বিচার করে বোঝা যাচ্ছে দোলনের তল একই রকম আছে। তার মানে, আমরা বলতে পারি, দোলকটি ত্বরণযুক্ত হচ্ছে না—যদিও দোলনের নিচে পৃথিবী ঠিকই ঘুরে চলেছে।

মাখ্-এর কাছে এই ঘটনাটি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হল। এ থেকেই তিনি ধরে নিলেন, ত্বরণকে সম্পর্কিত করতে হবে স্পেসের সঙ্গে নয়, দূরের তারার সঙ্গে। এই হল মাখের নিয়ম (Mach's Principle)।

আইনস্টাইন তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখায় বলেছেন, সেই ১৯০৮ সালেই তাঁর ধারণা হয়েছিল যে মহাকর্ষ ও ত্বরণের সমতুলতার নিয়ম ও মাখের নিয়ম অঙ্গীভূত করে মহাকর্ষের কোনো তত্ত্ব যদি গড়ে তুলতে হয় তাহলে বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব তার ভিত্তি হতে পারে না। কেননা বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে দেখার বিষয় ছিল সরলরেখায় সমবেগসম্পন্ন গতি। সেটা ছিল স্পেস ও সময়ের এমন একটা জ্যামিতিক বিচার যার মধ্যে ত্বরণ বা মহাকর্ষের স্থান হওয়া শক্ত ছিল। কথাটাকে স্পষ্ট করার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যে দৃষ্টান্ত আইনস্টাইন নিজেও কয়েকবার দিয়েছেন।

মনে করা যাক একটি চ্যাপ্টা গোল চাকতি তার কেন্দ্রীয় বিন্দুর চারদিকে ঘুরছে। সেটিকে একটি ঘুরন্ত চাকা বলেও ধরা যেতে পারে। এখন, এই ঘুরন্ত অবস্থায় যদি চাকতির মাপজোখ নিতে হয় তাহলেও কি আমরা ইউক্লিডের জ্যামিতির সাহায্য নেব? সনাতন পদার্থবিদ্যায় তাই নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, ইউক্লিডের জ্যামিতিতে বলা হয়েছে, বৃত্তের পরিধির মাপ তার ব্যাসের মাপের প্রায় π গুণ। বৃত্তের ব্যাসের যতো গুণ তার পরিধি, সেই সংখ্যাটিকে একটি গ্রীক অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়—π('পাই') (দশমিকে 'পাই'-এর মান ৩.১৪১৫৯২৭...)। ঘুরন্ত অবস্থাতেও কি চাকতির পরিধির মাপ তার ব্যাসের 'পাই'-গুণ হবে? সনাতন পদার্থবিদ্যা অনুসারে, তাই। কিন্তু আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে আমরা জানি, গতির দিকে গতিশীল বস্তুর লোরেন্ৎস সংকোচন ঘটে। তাহলে, চাকতির ঘুরন্ত অবস্থায় তার পরিধির রেখাও গতির দিকে সংকুচিত হচ্ছে (পর্যবেক্ষক রয়েছে চাকতির স্থির কেন্দ্রে, যার চারদিকে চাকতি ঘুরছে)। কিন্তু চাকতির ব্যাস রয়েছে গতির দিকে লম্ব হয়ে, অতএব ব্যাসের সংকোচন নেই। তার মানে, চাকতির ঘুরন্ত অবস্থায় চাকতির কেন্দ্রে থাকা পর্যবেক্ষকের কাছে চাকতির পরিধির মাপ তার ব্যাসের মাপের 'পাই'-গুণ থাকতে পারে না। তার মানে, চাকতির ঘুরন্ত অবস্থায়, বা বলা চলে ত্বরণঘটিত অবস্থায়, ইউক্লিডীয় জ্যামিতি অচল হয়ে যাচ্ছে।

একই কথা ঘড়ি সম্পর্কে। ঘুরন্ত চাকতির কেন্দ্রে থাকা স্থিতিশীল দর্শকের কাছে ঘুরন্ত চাকতির পরিধিতে থাকা ঘড়ি কেন্দ্রে থাকা

ঘড়ির চেয়ে আস্তে চলে। শুধু পরিধিতে কেন, ঘুরন্ত চাকতির পরিধি ও কেন্দ্রের মাঝখানে অন্য যেখানেই সেই ঘড়ি থাকুক সেই ঘড়ি কেন্দ্রের ঘড়ির চেয়ে পিছিয়ে থাকেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটি ঘুরন্ত চাকতির বেলায় স্পেস ও সময় নিয়ে পুরোপুরি একটি নির্দেশাংক খাড়া করা সম্ভব নয়—যেমনটি করা গিয়েছিল বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের বেলায়। সে-সময়ে মাপনদণ্ড ও ঘড়ি বসিয়ে বসিয়ে আমরা যে হদিস নিতে পেরেছিলাম, ঘুরন্ত চাকতির বেলায় সেটা সম্ভব নয়। কেননা, দেখা যাচ্ছে, ঘুরন্ত চাকতির বেলায় কেন্দ্রে থাকা পর্যবেক্ষকের কাছে মানদণ্ড সংকুচিত হয় ও ঘড়ি আস্তে চলে। আইনস্টাইন বড়োই সংকটের মধ্যে পড়লেন। লোরেন্‌ৎস সংকোচনকে যদি এমন একটা সাধারণ রূপ দিতে হয় যে ত্বরণের ব্যাপারটাও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তাহলে নির্দেশাংক সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাকে বাতিল করতে হয়। আইনস্টাইন তখন ভাবতে লাগলেন, পদার্থ-বিজ্ঞানে নির্দেশাংক বলতে সাধারণত আমরা কী বুঝি? এই সমস্ত ভাবনাচিন্তা থেকে একটা পথ খুঁজে পেতে অনেকটা সময় কেটে গেল।

কী সেই পথ? মোটামুটি একটা ধারণা দিতে হলে এইভাবে বলা চলে।

নতুন পথের সার কথাটা এই যে স্পেস-সময়ের জ্যামিতি ও মহাকর্ষের মধ্যে একটা সম্পর্ক থেকে গিয়েছে। কথাটার একটা ইঙ্গিত ছিল আইনস্টাইনের সেই ১৯১১ সালের প্রবন্ধেই, যেখানে আইনস্টাইন বলেছিলেন সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র পার হবার সময়ে আলো বেঁকে যায়। অথচ আমরা জানতাম আলো চলে সরলরেখায়। ইউক্লিডের যে জ্যামিতি আমরা পড়ি তা পুরোপুরিভাবেই দাঁড়িয়ে আছে এই সরলরেখার ওপরে। তাহলে কোনো একটি রেখা সরল কিনা তা ঠিক করা হয় কি-ভাবে? শেষপর্যন্ত সেই আলোর চলা বিচার করেই। আমরা জানি, দুই বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্বকে বলা হয় সরলরেখা। এই দুটি বিন্দুর একটি থেকে অপরটিতে যেতে হলে আলোও এই সবচেয়ে কম দূরত্বের পথ ধরেই চলে। তাই আলোর চলার পথকেই ধরে নেওয়া হয় সরলরেখা হিসেবে। কিন্তু

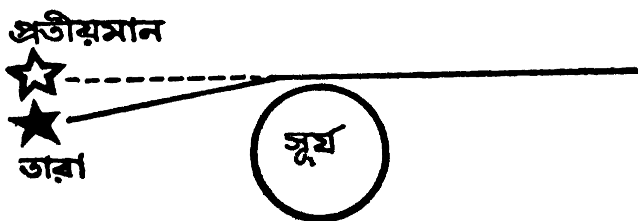
এখন দেখা যাচ্ছে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে আলোর রশ্মি বেঁকে যায়। তার মানে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে আলোর রশ্মি ইউক্লিডের জ্যামিতি মানে না। তাহলে তো জ্যামিতি সম্পর্কে আমাদের ধারণাই পালটাতে হয়। এবং পালটাতে হয়েছে।

আমাদের এই পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে আলো যখন চলে তখন তা বেঁকে যায় কি? অবশ্যই যায়। তবে ধরা যায় না এমন মাত্রায়। কেননা বস্তু হিসেবে পৃথিবী ছোট এবং তার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র তেমন জোরালো হতে পারে না। তাই পৃথিবীর এই জগতে আলোর চলাচল ইউক্লিডের জ্যামিতি মেনেই চলে।

কিন্তু বস্তুটি যদি বড়ো হয়? ধরা যাক, সূর্যের মতো বড়ো? তাহলে, আমরা দেখেছি, আলো লক্ষণীয়ভাবেই বেঁকে যায়। কতখানি বাঁকে তার একটা হিসেব আইনস্টাইন তাঁর ১৯১১ সালের প্রবন্ধে দিয়েছিলেন। সেই হিসেবটি সঠিক ছিল না, কেননা হিসেবটি করা হয়েছিল নিউটনের মহাকর্ষের সূত্রের ভিত্তিতে। আইনস্টাইন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র থেকে মহাকর্ষ ও ত্বরণের সমতুলতার নিয়ম ধরা যায় না এবং পরম স্পেসের ক্রিয়া অস্বীকার করা চলে না।

আইনস্টাইন তখন মহাকর্ষের নিউটনীয় সূত্রের জায়গায় নতুন সূত্র উপস্থিত করলেন। যে সূত্র সবজায়গায় খাটে—সমবেগসম্পন্ন গতিতেও, ত্বরণসম্পন্ন গতিতেও। যে সূত্র স্পেস-সময়ের জ্যামিতি নির্ধারণ করে। মহাকর্ষ যেখানে নেই, অর্থাৎ যে জায়গা বৃহৎ কোনো বস্তু থেকে অনেক দূরে, সেখানে জ্যামিতির রূপ হয়ে থাকে ইউক্লিডীয়—বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে যেমনটি হয়। এই জ্যামিতিকে বলা হয় সমতল, কেননা আলো এখানে সরলরেখায় চলে এবং ইউক্লিডীয় জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ অনুযায়ী আচরণ করে। মহাকর্ষ যেখানে আছে সেখানে স্পেস-সময়ের জ্যামিতি বদলে যায়। ব্যাপারটাকে বোঝাবার জন্য অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে, স্পেস-সময় যেন দুমড়ে বা বেঁকে যাচ্ছে। কথাটাকে আরো ব্যাখ্যা করার জন্য এইভাবেও বলা চলে। মহাকর্ষ যেখানে আছে সেখানে আলোর রশ্মি দিয়ে গড়া চিত্রে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির নিয়ম খাটে না।

ইউক্লিডীয় জ্যামিতির নিয়ম অনুসারে আলোর রশ্মির চলা উচিত সরলরেখায়। কিন্তু এখানে আলোর রশ্মি চলে, যাকে বলা হয় 'জিওডেসিক', সেই পথ ধরে। জিওডেসিক কি? ভূ-গোলকে দ্রাঘিমা দেখাবার জন্য যে-সব গুরুবৃত্ত আঁকা হয় সেগুলো প্রত্যেকটিই জিওডেসিক। নতুন জ্যামিতিতে এই জিওডেসিক-ই সরলরেখার ভূমিকা পালন করে। মহাকর্ষ যদি দুর্বল হয় তাহলে আইনস্টাইনের সূত্র থেকে পাওয়া ফলাফল আর নিউটনের সূত্র থেকে পাওয়া ফলাফল অভিন্ন হয়ে থাকে। এই কারণে নিউটনের সূত্র থেকে প্রায় সঠিকভাবে গ্রহের গতিবিধির হদিস পাওয়া যায়। কিন্তু আলোর রশ্মি যদি সূর্যের কাছ দিয়ে চলে তাহলে আর নিউটনের সূত্র দিয়ে তার পুরো হদিস পাওয়া যায় না। কিছু সংশোধনের প্রয়োজন হয়। এমনটি হওয়ার কারণ, সূর্যের মহাকর্ষে স্পেস যথেষ্ট বক্র হয়ে যায়। তখন আলোর রশ্মি সেখানে যে জিওডেসিক ধরে চলে তার চেহারাও নিউটনের সূত্র অনুযায়ী হতে পারে না। আলোর রশ্মি বেঁকে যায়। এখন, কল্পনা করা যাক, দূরের কোনো তারা থেকে এই আলোর রশ্মি আসছে। সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র পার হবার সময়ে এই আলোর রশ্মি বেঁকে গেল। এই অবস্থায় পৃথিবী থেকে তাকিয়ে তারাটিকে দেখা উচিত সূর্য থেকে খানিকটা দূরে সরে যাওয়া অবস্থানে। যাকে বলা হয়



প্রতীয়মান অবস্থান। আইনস্টাইন হিসেব করে দেখালেন, তারার প্রতীয়মান অবস্থান হওয়া উচিতপ্রকৃত অবস্থান থেকে ১·৭৪ সেকেণ্ড*

---

* সেকেণ্ড যেমন সময়ের মাপ তেমনি কোণের মাপ। ৬০ সেকেণ্ডে ১ মিনিট। ৬০ মিনিটে ১ ডিগ্রী। ৯০ ডিগ্রীতে ১ সমকোণ। একটি সরলরেখা যদি অপর একটি সরলরেখার উপরে লম্ব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে যে কোণ পাওয়া যায় তার মাপ ৯০ ডিগ্রী।

বৃত্তচাপ দূরে। হিসেবটি পাওয়া গেল আইনস্টাইনের সাধারণ অপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিষয়ক ১৯১৬ সালের প্রবন্ধে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে চলছে। কাজেই ঠিক তখনই আইনস্টাইনের এই হিসেব বাস্তবে যাচাই হতে পারল না। তার জন্য অপেক্ষা করতে হল ১৯১৯ সাল পর্যন্ত।

জুরিখে

জুরিখ পলিটেকনিকে আইনস্টাইনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর পুরনো বন্ধু মার্সেল গ্রস্‌মান। এই সেই গ্রস্‌মান, বারোবছর আগে যাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন বলে আইনস্টাইন গণিতের ক্লাসে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন বোধ করেননি। এখন তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। কেননা সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে ঠিকমতো দাঁড় করাতে হলে গণিতের সাহায্য অবশ্যই চাই—রেখা ও তলের বক্রতা সম্পর্কিত গণিত, তিন-মাত্রার স্পেস ও চার-মাত্রার স্পেস-সময়ের বক্রতা সম্পর্কিত গণিত। প্রাগে থাকার সময়ে অন্য একজন অধ্যাপকের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেয়েছিলেন, সেটা যথেষ্ট ছিল না। এই অবস্থায় গ্রস্‌মানকে কাছে পেয়ে আইনস্টাইন খুব খুশি হলেন। গ্রস্‌মান এমনই একজন গণিতবিদ যিনি আপেক্ষিকতার তত্ত্বের জন্য প্রয়োজনীয় গণিত সম্পন্ন করতে পারেন। তবুও দুজনের মধ্যে সেই পুরনো দিনের মতো তর্ক চলত: কার গুরুত্ব বেশি—পদার্থবিদ্যার, না, গণিতের? আইনস্টাইন ততোদিনে ভালো করেই বুঝতে পেরে গিয়েছেন, গণিত ছাড়া পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব অচল। ফলে গণিতের পদ্ধতি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রচুর আলোচনা হল, তারপরে গ্রস্‌মান একাই সেই গণিত নিয়ে লেগে পড়লেন।

জুরিখ পলিটেকনিকে আইনস্টাইন যোগ দিয়েছিলেন ১৯১২ সালের আগস্টে। তখন থেকে শুরু করে ১৯১৪ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রতি অর্ধ-বছরে অনেকগুলো বিষয় পড়াতেন। তাছাড়াও চালাতেন পদার্থবিদ্যার বিষয় নিয়ে একটি সাপ্তাহিক আলোচনা-সভা। সভা বসত পলিটেকনিকে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বহু শিক্ষক ও ছাত্র তাতে যোগ দিতে আসতেন। পদার্থবিদ্যার নতুন নতুন কাজ নিয়ে আলোচনা হত, প্রধান একটি আলোচনার বিষয় অবশ্যই ছিল আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। সভার শেষে আইনস্টাইন একটি রেস্তোরাঁয় খেতে যেতেন, ইচ্ছুক অনেকেই থাকতেন সঙ্গে। খেতে খেতেও তুমুল আলোচনা চলত।

১৯১৩ সালের গ্রীষ্মকালে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন পদার্থ-বিজ্ঞানী পল এরেনফেস্ট। তাঁর উপস্থিতির ফলে আলোচনা খুবই সজীব হয়ে উঠেছিল। মাক্স ফন লাউয়ে (১৯১২ সাল থেকে তিনি বিশেষ অধ্যাপক রূপে জুরিখে ছিলেন) লিখছেন, 'আমি এখনো দেখতে পাই একদল পদার্থবিজ্ঞানী পরিবৃত হয়ে আইনস্টাইন ও এরেনফেস্ট জুরিখ্‌বার্গের ওপরে বেয়ে বেয়ে উঠছেন। এখনো শুনতে পাই এরেনফেস্টের উল্লসিত চিৎকার, এই তো, পেয়ে গিয়েছি।'

১৯৩৩ সালে এরেনফেস্টের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আইনস্টাইনের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। কুড়িবছরের এই বন্ধুত্ব থেকে আইনস্টাইন খুবই উপকৃত হয়েছিলেন।

১৯১৩ সালের শরৎকালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসে আইনস্টাইন যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসে যোগদান আইনস্টাইনের এই প্রথম নয়। প্রাগে থাকার সময়ে ১৯১১ সালে ব্রাসেল্‌স-এ গিয়েছিলেন প্রথম সোল্‌ভে কংগ্রেসে যোগ দিতে। সেই কংগ্রেসের উদ্যোক্তা ছিলেন বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও বেলজিয়ামের ধনী ব্যবসায়ী আর্নস্ট সোল্‌ভে। কংগ্রেসে আমন্ত্রিত প্রত্যেক বিজ্ঞানীকে তিনি দিয়েছিলেন যাতায়াতের ও থাকা-খাওয়ার খরচ, তাছাড়াও এক হাজার ফ্রাঁ করে পারিশ্রমিক। প্রথম সোল্‌ভে কংগ্রেসে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন ইংলণ্ডের

স্যার আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, ফ্রান্সের মাদাম কুরী, অঁারি পোঁয়াকারে, জঁা পেরঁ্যা ও পল লাঁজভাঁ, জার্মানির মাক্স প্লাঙ্ক ও ভালটের নার্ন্স্ট, হল্যাণ্ডের এইচ এ লোরেন্ৎস, এবং অস্ট্রিয়া থেকে আইনস্টাইন ও ফ্রান্ৎস হাজেনোয়েল। আর্নেস্ট সোল্‌ভের উদ্যোগে এমনি কংগ্রেস পরে আরো কয়েকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বহুকাল পর্যন্ত সোল্‌ভে কংগ্রেসই ছিল পদার্থবিজ্ঞানীদের মিলিত হবার স্থান। প্রথম সোল্‌ভে কংগ্রেসে আপেক্ষিকতা নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়েছিল। সে-সময়ে এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে আইনস্টাইন জানিয়েছিলেন, আপেক্ষিকতার সারকথা অবিদিত থেকে গিয়েছে। তবে এই চিঠিতেই বিশেষ আবেগের সঙ্গে লোরেন্ৎস-এর কথাও বলেছিলেন। লোরেন্ৎস এক বিস্ময়কর প্রতিভা, লোরেন্ৎস এক আশ্চর্য মানুষ, ইত্যাদি। পরে, ১৯২৮ সালে, লোরেন্ৎস-এর সমাধির পাশেও এমনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

১৯১৩ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসে তাঁর বলার বিষয় ছিল সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। তত্ত্বটিকে তখনো সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেননি, মোটামুটি একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। বলেছিলেন, তাঁর এই তত্ত্ব হচ্ছে মহাকর্ষের নতুন তত্ত্ব। মহাকর্ষীয় তত্ত্বকে তুলনা করেছিলেন বিদ্যুতের তত্ত্বের বিকাশের সঙ্গে। আঠারো শতকে বিদ্যুৎ সম্পর্কে শুধু এইটুকু জানা ছিল যে বিদ্যুৎ হচ্ছে চার্জ। চার্জ বিশিষ্ট হলে দুই বস্তু পরস্পরকে কাছে টানে বা দূরে ঠেলে। কাছে টানা বা দূরে ঠেলার বল নির্ভর করে দুয়ের মধ্যেকার দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে। মহাকর্ষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও এখনো এমনি প্রাথমিক স্তরের। আমরা এইটুকু মাত্র জানি যে পার্থিব বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। বিদ্যুতের বিজ্ঞান কিন্তু গত দেড়শো বছরে অনেকখানি উন্নতি করেছে। এখন আমরা বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র ও বিদ্যুৎচৌম্বক দোলন সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। মহাকর্ষের তত্ত্বেও এমনি জটিল ধারণা গড়ে তোলার সময় এসে গিয়েছে।

ভিয়েনায় থাকার সময়ে আইনস্টাইন আর্নস্ট মাখের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মাখের বয়স তখন পঁচাত্তর, দারুন পক্ষাঘাতে একেবারে পঙ্গু, থাকেন শহরের উপকণ্ঠে। আইনস্টাইন ঘরে ঢুকে দেখলেন

উসকোখুসকো পাকাচুল পাকাদাড়ি এক বুড়ো, খানিকটা ভালোমানুষি খানিকটা দুষ্টুমি ভরা চোখের দৃষ্টি, স্লাভ কৃষকের মতো চেহারা। আইনস্টাইন পরে জানিয়েছেন, সেদিন মাখের সঙ্গে তাঁর একটি প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল অণু ও পরমাণুর অস্তিত্ব।

এই সময়ে আইনস্টাইন তাঁর সমস্ত মনন নিয়ে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বটিকে রূপ দিচ্ছিলেন। এমনকি বাইরে থেকেও বোঝা যেত সবসময়ে তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। হয়তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করছেন, হয়তো পরিবারের সঙ্গে খাবার টেবিলে বসেছেন, তখনো তাঁর মন কাজ করে চলেছে।

আর এই সময়ে স্ত্রী মিলেভার সঙ্গে সম্পর্কেও চিড় ধরছিল। চূড়ান্ত বিচ্ছেদের দিন খুব বেশি দূরে ছিল না।

বার্লিনে

জার্মানির সম্রাট তাঁর নিজের নামে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংস্থা স্থাপন করেছিলেন—কাইজার ভিল্‌হেল্‌ম ইনস্টিটিউট। সম্রাটের এই উদ্যোগে প্রচুর টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বড়ো বড়ো শিল্পপতি ও ব্যাঙ্কমালিক। সকলেরই এক উদ্দেশ্য—বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের আধিপত্য খর্ব করা। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, তত্ত্বীয় বিজ্ঞান এই উদ্দেশ্যসাধনে জোরালো হাতিয়ার হতে পারে। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন মোটা মাইনে দিয়ে ও সমস্ত রকমের সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করে বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীদের এই ইনস্টিটিউটে টেনে আনতে। এ-কাজের ভার নিয়েছিলেন কোয়ানটাম তত্ত্বের স্রষ্টা ও স্বনামধন্য বিজ্ঞানী মাক্স প্লাঙ্ক ও রসায়নবিজ্ঞানী ভালটের নার্ন্স্ট।

একদিন এই দুই বিজ্ঞানী সশরীরে হাজির হলেন জুরিখে, আইনস্টাইনের কাছে। প্রস্তাব রাখলেন—আইনস্টাইন বার্লিনে চলুন, সেখানে তিনি হবেন কাইজার ভিলহেল্‌ম ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও প্রুশীয় বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য। সেখানে তাঁকে করা হবে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। ক্লাস নেবার দায়দায়িত্ব বিশেষ থাকবে না। ইচ্ছে হলে নিজের পছন্দমতো দু-একটা বক্তৃতা দিলেও দিতে পারেন। খুশিমতো গবেষণা করতে পারবেন, খুশিমতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে যোগ দিতে পারবেন।

আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন, এই সুযোগ যদি গ্রহণ করেন তাহলে নিজেকে তিনি পুরোপুরি নিয়োজিত করতে পারবেন সাধারণ আপেক্ষিকতার কাজে। শুধু তাই নয়, প্লাঙ্ক ও নার্ন্‌স্ট আরো বলেছিলেন, বার্লিনে আছেন শীর্ষস্থানীয় সব পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়াটাও আইনস্টাইনের পক্ষে লাভজনক হবে। আইনস্টাইন বলেছিলেন, ল'াজভ'া বলেন আপেক্ষিকতা সত্যিকারের বোঝেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা সারা বিশ্বে মাত্র বারো। সঙ্গে সঙ্গে নার্ন্‌স্ট বলে ওঠেন, তাই যদি হয় তাহলে তাঁদের মধ্যে আটজনই থাকেন বার্লিনে।

তবুও আইনস্টাইন ইতস্তত করতে লাগলেন। জুরিখের জীবন কত সহজ ও স্বচ্ছন্দ। সে-তুলনায় বার্লিনের সরকারী মহলের উগ্র জঙ্গীপনা ও কড়াকড়ি চালচলন অসহ্য মনে হতে বাধ্য। বার্লিনে গেলে বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীর সংস্পর্শ পাওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু জীবন কাটাতে হবে অসহ্য এক আবহাওয়ার মধ্যে। ভেবে দেখার জন্য আইনস্টাইন একটু সময় চাইলেন। ঠিক হল, আইনস্টাইনের মত জানবার জন্য প্লাঙ্ক ও নার্ন্‌স্ট আবার আসবেন জুরিখে। তখন আইনস্টাইন একটু মজা করলেন। বললেন, প্লাঙ্ক ও নার্ন্‌স্ট আবার যখন আসবেন তখন যদি তিনি লালফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে যান তাহলে বুঝতে হবে তিনি বার্লিনে যেতে রাজী, কিন্তু সাদাফুলের গুচ্ছ হাতে থাকলে বুঝতে হবে অরাজী।

দিনকয়েক পরে প্লাঙ্ক ও নার্ন্‌স্ট আবার এলেন জুরিখে। স্টেশনে নেমেই দেখলেন একগুচ্ছ লালফুল হাতে নিয়ে আইনস্টাইন দাঁড়িয়ে।

মিলেভা থেকে গেলেন জুরিখে। আইনস্টাইন একা গেলেন বার্লিনে। তারিখটি ছিল ৬ এপ্রিল ১৯১৪।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আলোর বক্রতা

আইনস্টাইন বার্লিনে এলেন আর তার কয়েক মাস পরেই ১ আগস্ট ১৯১৪ তারিখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

বার্লিনে আসার পরেই আইনস্টাইন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন সাপ্তাহিক আলোচনা-সভার মাধ্যমে। জার্মানিতে যতোদিন ছিলেন এই আলোচনা-সভা চালিয়ে গিয়েছেন। সভায় যাঁরা আসতেন তাঁরা অনেকেই হয়ে উঠেছিলেন তাঁর বন্ধু। আসতেন প্লাঙ্ক ও নার্ন্স্ট, মাক্স্ ফন লাউয়ে, গুস্তাফ হার্ৎস, জেমস ফ্রাঙ্ক, এরভিন শ্রোয়েডিংগার (১৯২৪-২৬ সালে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার জন্য পরবর্তী কালে বিখ্যাত), কিছুটা সময়ের জন্য লিজে মাইট্নার (১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে ইউরেনিয়াম বিদারণের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার জন্য বিশ্বখ্যাতা)।

১৯১৪ সালের মে মাসে জুরিখের এক বন্ধুর কাছে চিঠিতে লিখছেন, 'বার্লিনের জীবন তেমন খারাপ নয়, এমনটি আমি আশা করিনি। তবে আমার মনের প্রশান্তি নষ্ট হচ্ছে এই কারণে যে যতো সব অর্থহীন ব্যাপার নিয়ে আমাকে তালিম দেওয়া হচ্ছে—যেমন, আমার কি-ধরনের পোশাক পরা উচিত, যাতে কেউ না ভেবে বসে যে আমি সমাজের নিচুতলা থেকে এসেছি।'

বার্লিনে আসার পরে আইনস্টাইন অনেক নতুন বন্ধু পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু শত্রুও যে তৈরি হচ্ছিল সেদিকে খেয়াল করেন নি। নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। তাঁর সমস্ত মন জুড়ে

থাকত ত্বরণযুক্ত গতির আপেক্ষিকতার সমস্যা, মহাকর্ষ, স্পেসের ঘটনাবলীর ওপরে স্পেসের জ্যামিতিক ধর্মের নির্ভরতা। সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বটিকে তিনি মনে মনে রূপ দিচ্ছিলেন।

১৯১৪ সালের মার্চ মাসে বার্লিনের রাস্তায় সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ শুরু হয়ে গেল। কাইজারের জয়ধ্বনি তোলা উৎসাহী দর্শকদের ভিড় দাঁড়িয়ে গেল রাস্তার দু-ধারে। অতি ভয়ংকর এক অবস্থার মধ্যে পড়লেন আইনস্টাইন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, বর্বর জঙ্গীবাদ শিক্ষায়তনের আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছে। জার্মান জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে খারাপ লক্ষণগুলো উগ্রভাবে প্রকট হয়ে উঠল। লেসিং ও শিলারের স্থান নিল যুদ্ধোন্মাদনা তৈরি করার উপযোগী সব পুস্তিকা। এমনকি মাক্স প্লাঙ্কের মতো বিজ্ঞানী পর্যন্ত দিশেহারা হয়ে গেলেন এবং 'জার্মানির বৈধ দাবি' নিয়ে কিছু কথাও বলে ফেললেন। মাক্স প্লাঙ্ক সহ ৯৩ জন প্রখ্যাত জার্মান শিল্পী বিজ্ঞানী ও লেখকের স্বাক্ষর নিয়ে প্রকাশিত হল 'সভ্য জগতের কাছে ইশতাহার'। তাতে বলা হল, জার্মান সংস্কৃতি ও জার্মান সমরবাদ অচ্ছেদ্য। আইনস্টাইন এই ইশতাহারে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখাটাও তাঁর পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। অল্প কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া আর কাউকেই তিনি পেলেন না যাঁরা তাঁর মতো স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক সংহতির আদর্শে বিশ্বাসী। তাই বলে চুপ করে বসে থাকলেন না। অন্যান্য দেশের শান্তিবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করলেন। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে চিঠি লিখলেন রম্যাঁ রলাঁর কাছে, রলাঁর যুদ্ধবিরোধী সংগঠনের কাজে নিজেকে জড়িত করতে চাইলেন।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে নিজেই চলে গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে। তাঁর দুই ছেলে মায়ের সঙ্গে জুরিখে থাকত, ছেলেদের সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর গেলেন ভেভে-তে, যেখানে তখন ছিলেন রম্যাঁ রলাঁ। রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার আইনস্টাইনের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল।

এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে রলাঁ তার ডায়েরিতে লিখছেন,

আইনস্টাইন এখনো তরুণ (তার বয়স তখন ছত্রিশ), খুব লম্বা নয়, চ্যাটালো লম্বা মুখ, মাথায় এক ঝাঁক কোঁকড়ানো কুঁচকানো ঘোর কালো চুল, মধ্যে মধ্যে সাদার ছিটে, চুলের রাশ খাড়া উঠে গিয়েছে চওড়া কপাল থেকে। তার নাক মাংসল ও প্রকট, মুখ ছোট, ঠোঁট পুরুষ্টু, গাল ফোলা-ফোলা, চিবুক গোল। ছোট করে ছাঁটা গোঁফ সে ধারণ করে আছে। ফরাসী বলে একটু যেন আড়ষ্টভাবে, ফরাসীর সঙ্গে মেশানো থাকে জার্মান। মানুষটি খুবই জীবন্ত, হাসতে ভালোবাসে। সবচেয়ে গুরুতর চিন্তাকেও মোচড় দিয়ে মজার করে তোলে, সেটাই তার স্বভাব।

জার্মানি সম্পর্কে তার মতামতে আইনস্টাইন অবিশ্বাস্যরকমের স্পষ্টভাষী, যে-জার্মানিতে সে থাকে, যে-জার্মানি তার দ্বিতীয় পিতৃভূমি (কিংবা প্রথম)। এতখানি স্বাধীনতা নিয়ে অন্য কোনো জার্মান কাজ করে না বা কথা বলে না। অন্য কেউ হলে ভয়ংকর সেই বিগত বছরে হয়তো একাকীত্ব বোধ করত। কিন্তু তেমন মানুষ সে নয়। সে হাসে। যুদ্ধের সময়েই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক রচনা লেখা। তাকে জিজ্ঞেস করি, তার ধ্যানধারণা সে তার জার্মান বন্ধুদের কাছে ব্যক্ত করে কিনা, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কিনা। সে বলে, না। সে শুধু তাদের কাছে প্রশ্ন তোলে, সক্রেটিসের ধরনে—আর তাই দিয়েই তাদের নির্বিকারত্বকে ধাক্কা দিতে চায়। লোকে তাও পছন্দ করে না, সে বলে।

পদার্থবিজ্ঞানী বন্ধু পল এরেনফেস্টকে আইনস্টাইন নিজে লিখেছিলেন,

ইউরোপ তার উন্মত্ততায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার শুরু করেছে। এমনি সময়ে মানুষ বুঝতে পারে জীবের কোন শোকাবহ প্রজাতিতে তার স্থান। আমি নিঃশব্দে চালিয়ে যাচ্ছি আমার শান্তিপূর্ণ অধ্যয়ন ও মনন, এবং বোধ করছি করুণা ও বিরক্তি। আমার প্রিয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রয়েণ্ডলিখ (১৯১৪ সালের অভিযানের নেতা) সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ আর পাবে না, তার বদলে রুশদেশে যুদ্ধবন্দী হবে। ওর সম্পর্কে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

তারপরেও যুদ্ধ চলতেই থাকে এবং সারাটা যুদ্ধের কাল আইন-

স্টাইন তার শান্তিপূর্ণ অধ্যয়ন চালিয়ে যান। ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে তিনি প্রায় ত্রিশটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন।

একে এই প্রচণ্ড পরিশ্রম, তার ওপর বার্লিনে একা থাকার জন্য হোটেলে-রেস্তোরাঁয় অযত্নের খাওয়াদাওয়া—ফলে আইনস্টাইন প্রায়ই গুরুতর পেটের পীড়ায় ভুগতেন। একবার তো এমনই অসুস্থ হয়েছিলেন যে প্রাণের আশা ছিল না। সে সময়ে সেবাশুশ্রূষা করে তাঁকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে আনেন তাঁর মায়ের দিক থেকে মাসতুতো বোন ও বাবার দিক থেকে খুড়তুতো বোন এল্‌সা। স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পরে এলসা তার দুই মেয়েকে নিয়ে বার্লিনে তার বাবা রুডোলফ আইনস্টাইনের কাছেই থাকতেন। আইনস্টাইনও প্রায়ই কাকার বাড়িতে যেতেন, খাওয়াদাওয়া ও গল্পগুজব করতেন। ১৯১৯ সালে মিলেভার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হবার পরে আইনস্টাইন এলসাকে বিয়ে করেন। এলসা ছিলেন 'মধুরস্বভাব, রসবোধসম্পন্ন আকর্ষণীয় মহিলা, বন্ধু ও মায়ের মতো মেজাজ, ঘরসংসারকে মনোরম করে তোলায় আগ্রহী'। মিলেভার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের সময়ে কথা হয়ে থাকে যে আইনস্টাইনের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার (তখনো পাননি, কিন্তু পাবেন-ই ধরে নিয়েছিলেন) পুরো অর্থ মিলেভা পাবেন, দুই ছেলেকে মানুষ করার জন্য। আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯২১ সালে 'আলোক-বিদ্যুৎ সূত্রের জন্য ও তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যায় কাজের জন্য'। আপেক্ষিকতা তখনো বিতর্কিত বিষয়, নোবেল পুরস্কারে তার কোনো উল্লেখ ছিল না।

বার্লিনে আইনস্টাইনের কঠিন অসুখের সময়ে আরো একজন মহিলা খোঁজখবর নিতে আসতেন। তিনি হচ্ছেন মাক্‌স বর্নের স্ত্রী হেডি। মাকস বর্ন ও হেডি বর্নের সঙ্গে আইনস্টাইনের গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক সারা জীবন ধরে বজায় ছিল, যদিও আইনস্টাইনের জার্মানি ছেড়ে যাওয়ার পরে দেখাসাক্ষাৎ আর হয়নি, এবং যদিও কোয়ান্টাম বিজ্ঞানী মাক্‌স বর্নের সঙ্গে আইনস্টাইনের গুরুতর মতভেদ ছিল।*

*১৯১৬ থেকে আইনস্টাইনের মৃত্যুর বছর ১৯৫৫ পর্যন্ত আলবার্ট আইনস্টাইন এবং মাক্‌স ও হেডভিক বর্নের লিখিত চিঠিপত্র 'দ্য বর্ন-আইনস্টাইন লেটার্স' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন এবং টীকা ও মন্তব্য লিখেছেন মাক্‌স বর্ন। পুস্তকটি এক অসাধারণ দলিল—আশ্চর্য এক বন্ধুত্বের নিদর্শনের জন্য শুধু নয়, সমকালীন বৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তায় উদ্বেলিত দুই দিকপাল বিজ্ঞানীর ঐকান্তিক আদানপ্রদানের জন্যও।

হেডি বর্নের কবিতা আইনস্টাইন আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন ও মতামত জানাতেন। হেডিও নানা ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন আইনস্টাইনকে, নানা খবর জানাতেন। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯২০ তারিখের চিঠিতে পুনশ্চ দিয়ে লিখছেন, 'আপনি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরেবাইরে' পড়বেন—-এমন চমৎকার উপন্যাস বহুকাল আমি পড়িনি।' বার্লিনে আইনস্টাইনের মরণাপন্ন অসুখের সময়ে দেখা করতে এসে একদিন 'হেডি বর্ন' জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কি মরতে ভয় পান?' আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'না, মোটেই না, আমি নিজেকে প্রতিটি জীবন্ত সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে এত জড়িত বলে মনে করি যে, এই অনন্ত প্রবাহে কোনো একটি মানুষের অস্তিত্বের কোথায় শুরু ও কোথায় শেষ, সে-বিষয়ে জানতে বিন্দুমাত্র আগ্রহান্বিত নই।' এই উক্তির কুড়ি বছর পরে আইনস্টাইন যখন প্রিন্সটনে, পোলদেশীয় বিজ্ঞানী লিওপোল্ড ইন্‌ফেল্ড তাঁর সঙ্গে কাজ করছেন, সে-সময়ে একদিন ইনফেল্‌ডকে বলেছিলেন, 'জীবনটা এক উত্তেজনাকর ব্যাপার। আমার ভালো লাগে। জীবন কী চমৎকার। কিন্তু আমি যদি জানতে পারি যে আর তিনঘণ্টা পরে আমার মৃত্যু হচ্ছে তাহলেও বিচলিত হব না। ভাবতে বসব এই শেষ তিনঘণ্টা কি-ভাবে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগানো যায়। তারপরে শান্তভাবে কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে শান্তিতে শুয়ে পড়ব।'

জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী আর্নোল্ট জোমেরফেল্ট ম্যুনিখ থেকে কয়েকটি চিঠি দিয়েছিলেন আইনস্টাইনকে, কোনোটিরই জবাব পাননি। আইনস্টাইন বার্লিনে আর জোমেরফেল্ট ম্যুনিখে, যুদ্ধের সময়ে হলেও চিঠির লেনদেনে কোনো অসুবিধে ছিল না, আর চিঠির জবাব না দেওয়া আইনস্টাইনেরস্বভাবই নয়। কিছু ঘটেছিল নিশ্চয়ই। শেষপর্যন্ত জবাব পেলেন ২৮ নভেম্বর ১৯১৫ তারিখে। আইনস্টাইন লিখছেন,

> গত একমাস ধরে আমার জীবনের একটি সবচেয়ে উত্তেজনাকর ও সবচেয়ে কর্মনিবদ্ধ সময় কাটাবার অভিজ্ঞতা হয়ে গেল, তবে অবশ্যই স্বীকার্য যে একটি সবচেয়ে সাফল্যমণ্ডিত সময়ও।

চিঠি লেখার প্রশ্নই ছিল না।

কেননা আমি অনুধাবন করেছিলাম, এতকাল পর্যন্ত মহাকর্ষ সম্পর্কিত আমার সমস্ত ক্ষেত্রীয় সমীকরণ সম্পূর্ণ অবলম্বনহীন ছিল।.......

পূর্বেকার তত্ত্বে সমস্ত আস্থা এইভাবে লোপ পাবার পরে আমি স্পষ্টই দেখতে পেলাম রীমানের...তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি সন্তোষজনক মীমাংসা পাওয়া যেতে পারে।...

এবারে আমার চমৎকার অভিজ্ঞতা হল—প্রথম আসন্ন ফল হিসেবে পেয়ে গেলাম নিউটনের তত্ত্ব, শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় আসন্ন ফল হিসেবে বুধের অনুসূর গতিও (একশো বছরে ৪৩ সেকেণ্ড)। সূর্যের কাছে আলোর বিক্ষেপ পেলাম পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ।

এই চিঠি যখন লিখছেন তখন আইনস্টাইন সবেমাত্র সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। ১৯০৫ সালের প্রবন্ধের বিষয় ছিল বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ। তখনো তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব শুধু বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্রাউনীয় বিচলন ও ফোটোন তত্ত্বে তাঁর মৌলিক অবদানের জন্যও বিজ্ঞানীমহলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ও কোয়ানটাম তত্ত্বের ওপরে। মহাকর্ষ নিয়ে কাজ করার পক্ষে কোনো আকর্ষণ ছিল না। নিঃসঙ্গ ও একক আইনস্টাইন শুধু নিজের তাগিদেই এই সময় থেকে পুরো দশবছর মহাকর্ষের তত্ত্বের ওপরে গবেষণা চালিয়ে গেছেন। সমকালীন পদার্থবিদ্যার রেওয়াজের বাইরে গিয়ে এই গবেষণা একমাত্র আইনস্টাইনের পক্ষেই স্বাভাবিক ছিল।

প্রবন্ধটির নাম 'সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ভিত্তি', প্রকাশিত হল ১৯১৬ সালে 'আনালেন ডেয়ার ফিজিক' পত্রিকার ৪৯তম খণ্ডে, ৭৬৯ থেকে ৮২২ পৃষ্ঠায়। বহু পদার্থবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, এই তত্ত্বটি হচ্ছে পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে—সম্ভবত সকল বিজ্ঞানের ইতিহাসে—সবচেয়ে নিখুঁত এবং নন্দনগতভাবে সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি। মাক্স বর্ন বলেছেন, 'তখন আমার মনে হয়েছিল, এবং এখনো মনে হয়, এই তত্ত্ব হচ্ছে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনার মহত্তম কৃতিত্ব;

দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি, ভৌতিক স্বজ্ঞা ও গাণিতিক দক্ষতার বিস্ময়কর মিলন।'

এই তত্ত্বের মূলকথাটি এইঃ নিউটন অনুসারে মহাকর্ষ হচ্ছে একটা শক্তি যা দূর থেকে পলকের মধ্যে ক্রিয়াশীল হতে পারে। আইনস্টাইন বললেন, মহাকর্ষ হচ্ছে বস্তুর উপস্থিতির ফলে সৃষ্ট স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতায় বক্র ক্ষেত্র, তার বিস্তার ঘটে আলোর বেগে। প্রকৃতপক্ষে মহাকর্ষ হচ্ছে ক্ষেত্র, চৌম্বক ক্ষেত্রের মতো। চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে চুম্বক, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করে বস্তু তার চারদিকের স্পেসকে বিকৃত করে তুলে। দৃষ্টান্ত দিতে হলে বলতে হয়, একটা রবার-শীটের ওপরে একটা টেনিসবল রাখলে রবার-শীট যেমন ডেবে যায় অনেকটা তেমনি। একটি পোকা যদি সবচেয়ে কম দূরত্বের পথে সেই টেনিসবলটি পার হতে চায় তাহলেও সে সিধে পথে চলতে পারে না, চলে টেনিসবলের উপস্থিতির ফলে রবারশীটে যে বাঁক তৈরি হয়েছে সেই বরাবর। টেনিসবল না হয়ে ফুটবল হলে বাঁক হত আরো বেশি, মটরদানা হলে আরো কম।

নিউটনের মহাকর্ষের তত্ত্ব দিয়ে হিসেব করলে গ্রহের কক্ষের কতকগুলো চলন ব্যাখ্যা করা যেত না। বুধগ্রহের অনুসূর (কক্ষপথে সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের বিন্দু) একটু একটু করে এগিয়ে যায়, বিজ্ঞানীদের কাছে ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর ছিল। সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে ব্যাপারটার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। আর ধারণা করা গেল যে সূর্যের মহাকর্ষে আলোর রশ্মি বেঁকে যায়। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে পাওয়া গেল আধুনিক এক বিশ্বতত্ত্ব। এই তত্ত্ব দিয়েই বিচার করা যাচ্ছে সম্প্রতিকালে আবিষ্কৃত পাল্‌সার (পাল্‌সেটিং স্টার বা স্পন্দনশীল তারকা) এবং ব্ল্যাক হোল বা কালো বিবর (এই আলোচনায় আমরা পরে আসছি)।

সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বা মহাকর্ষের আইনস্টাইন তত্ত্ব বাস্তবে যাচাই হতে পারে যদি সত্যিই দেখা যায়, তারার আলো সূর্যের কিনার দিয়ে যাবার সময়ে বেঁকে যাচ্ছে। সেজন্য তারার ফোটো তোলা দরকার—সূর্য যখন নেই সেই সময়ের, সূর্য আছে এবং

সূর্যের কিনারে তারাটি রয়েছে সেই সময়ের (এই ফোটো তোলা যেতে পারে কেবলমাত্র পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ে, নইলে সূর্য থাকার জন্য তারাটি অদৃশ্য থেকে যায়)। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে তারার ফোটো তুলে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে যাচাই করা সম্ভব ছিল না।

সুযোগ ঘটে গেল ১৯১৯ সালে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন গোড়া থেকেই সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। এবং নিঃসন্দেহ ছিলেন যে তত্ত্বটি নির্ভুল। যুদ্ধ শেষ হতেই তত্ত্বটিকে বাস্তবে যাচাই করার জন্য তিনি বিশেষরকম তৎপর হয়ে উঠলেন। তাছাড়া তিনি চাইছিলেন যুদ্ধের ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে যোগাযোগের সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তা আবার জোড়া লাগুক।

অন্যদিক থেকেও আশ্চর্য একটি যোগাযোগ ঘটে গেল। ক্রান্তিবৃত্তে সারা বছরের পরিক্রমায় সূর্য অনেকগুলো তারামণ্ডল পার হয়। এমনি একটি তারামণ্ডল হচ্ছে পাঁচটি তারা নিয়ে গঠিত বৃষরাশি। সূর্য যতো তারামণ্ডল পার হয় তার মধ্যে এইটিই সবচেয়ে উজ্জ্বল, ফোটো তোলার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধের। হিসেবে দেখা গেল, ১৯১৯ সালের ২৯শে মে তারিখে সূর্য বৃষরাশিতে থাকছে। আর ঘটনার আশ্চর্য যোগাযোগ বলতে হবে, ১৯১৯ সালের ২৯ মে তারিখেই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবার কথা এবং পৃথিবীর বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা সম্ভব।

অতএব বড়োরকমের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। ২৯ মে ১৯১৯ তারিখে ৩০২ সেকেণ্ড ব্যাপী পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ে বৃষরাশির ফোটো তোলার জন্য স্থান নির্বাচিত হল দুটি—উত্তর ব্রাজিলের সোব্রাল এবং পশ্চিম আফ্রিকার কাছে গিনী উপসাগরের দ্বীপ প্রিন্সিপে। স্বয়ং এডিংটন অপর একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী সহ (ই টি কটিংহ্যাম) প্রকাণ্ড একটি দূরবীন সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন প্রিন্সিপে দ্বীপে। আর সোব্রালে গেলেন অপর দুজন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী—ডঃ এ সি ডি ক্রোমেলিন ও ডেভিডসন।*

---

* স্যার আর্থার এডিংটন তার 'স্পেস টাইম অ্যাণ্ড গ্র্যাভিটেশন' পুস্তকে এই দুটি অভিযানের বড়ো সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। সোব্রালে যে দূরবীন ব্যবহার করা হয়েছিল তার একটি ছবিও এই পুস্তকে আছে।

পরীক্ষাকার্যের প্রস্তুতির জন্য এডিংটন ও তাঁর সহকর্মী এক-মাসেরও বেশি সময় ছিলেন প্রিন্‌সিপে দ্বীপে। যে-দূরবীন নিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন সেই একই দূরবীনের সাহায্যে ইংলণ্ড থেকে জানুয়ারি মাসে বৃষরাশির ফোটো নেওয়া হয়েছিল। তারপরে ঘটনার দিন (২৯মে) প্রিন্‌সিপে দ্বীপে ৩০২ সেকেণ্ড ধরে সূর্যগ্রহণ চলার সময়ে তাঁরা বৃষরাশির ষোলটি ছবি নিয়েছিলেন। আকাশে মেঘ ছিল, অধিকাংশ ছবিতেই বৃষরাশির তারাগুলো ছিল মেঘের আড়ালে। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য মেঘ সরে যেতে একটি ছবিতে পাঁচটি তারাই স্পষ্ট পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে জানুয়ারি মাসে তোলা ছবির সঙ্গে সেই ছবি মিলিয়ে তাঁরা ধরতে পারলেন, তারার আলো প্রকৃতই বাঁক নিয়েছে। তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেবের কাজটা সারা হল দেশে ফিরে আসার পরে। ততোদিনে সোব্‌রালে তোলা সাতটি ছবিও এসে গিয়েছে। দুই প্রস্থ ছবিতেই নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া গেল যে বৃষরাশির তারাগুলো সূর্য না-থাকলে যেখানে থাকে সূর্য থাকলে সেখান থেকে খানিকটা দূরে দৃশ্যমান হয়। তার মানে, সূর্যের মহাকর্ষে আলোর রশ্মি প্রকৃতই বেঁকে যাচ্ছে। *

প্রিন্‌সিপের পরীক্ষাকার্যে তারার সরে যাওয়ার মাপ পাওয়া গিয়েছিল ১'৬১ সেকেণ্ড। সোব্‌রালের মাপ ছিল ১'৯৮ সেকেণ্ড। আইনস্টাইনের হিসেবে সরে যাওয়ার মাপ ছিল ১'৭৪ সেকেণ্ড। ধরে নেওয়া চলে, আইনস্টাইনের হিসেবের সঙ্গে বাস্তব পরীক্ষা-কার্যের ফলের মিল পাওয়া যাচ্ছে।

৬ নভেম্বর ১৯১৯ তারিখে লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটি ও রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির যুগ্ম সভায় পরীক্ষাকার্যের ফল উপস্থিত করা হল। সভাপতি তাঁর ভাষণে বললেন, 'এই আবিষ্কার কোনো প্রান্তীয় দ্বীপের নয়, নতুন বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার এক সম্পূর্ণ মহা-দেশের। নিউটন যখন তাঁর তত্ত্ব বিবৃত করেছিলেন তারপর থেকে মহাকর্ষ সম্পর্কে এই হচ্ছে সবচেয়ে বিরাট আবিষ্কার। ...আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় কেউ বলতে

* ১৯১৯ সালের সূর্যগ্রহণের সময়ে তারার আলোকচিত্র তোলার জন্য দুটি অভিযানে খরচ পড়েছিল প্রায় ৪,৬০০ ডলার (প্রায় ৩৪,০০০ টাকা)।

পারেননি আইনস্টাইনের তত্ত্বটি ঠিক কী।'

পরদিন, ৭ নভেম্বর ১৯১৯ তারিখে, লণ্ডন 'টাইমস' পত্রিকায় বড়ো বড়ো হরফে সংবাদের শিরোনাম দেওয়া হল : বিজ্ঞানে বিপ্লব – নিউটনীয় ধ্যানধারণা বাতিল। *

আইনস্টাইনকে কিন্তু আগেই পরীক্ষাকার্যের ফলাফল জানানো হয়েছিল। ১৯১৯ সালে তাঁর একজন ছাত্র সে-সময়ের কথা লিখে গিয়েছেন :

> হঠাৎ তিনি (আইনস্টাইন) আলোচনা থামিয়ে···জানলার বাজুর ওপরে পড়ে থাকা একটি তারবার্তা হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন এবং আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই যে, এই খবরে তোমার হয়তো আগ্রহ থাকতে পারে।' আমি দেখলাম, সূর্যগ্রহণ অভিযানের ফলাফল জানিয়ে তারবার্তা এসেছে এডিংটনের কাছ থেকে। তাঁর হিসেবের সঙ্গে পরীক্ষাকার্যের ফল মিলে গিয়েছে, এজন্য আমি যখন আনন্দপ্রকাশ করছিলাম, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি তো জানতাম তত্ত্বটি যথার্থ।' তারপরে আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, এমন যদি হত যে তাঁর হিসেব পরীক্ষাকার্যের ফলে সমর্থিত হচ্ছে না—তাহলে? তিনি পাল্টা জবাব দিলেন, 'তাহলে আমি আমাদের প্রিয় প্রভুর জন্য দুঃখিত হতাম—তত্ত্বটি নির্ভুল।**

---

*রয়্যাল সোসাইটিতে ৬ নভেম্বরের সভা হয়ে যাবার পরে আপেক্ষিকতা সম্পর্কে মজার মজার কথা শোনা যেত। ডিসেম্বর মাসে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এডিংটন বলেছিলেন, তিনি যদি খাড়া দিকে সেকেণ্ডে ২,৫৭,৬০০ কিলোমিটার বেগে ধাবিত হন তাহলে দৈর্ঘ্যের দিকে সংকুচিত হয়ে তিনি অর্ধেক খাটো হয়ে যাবেন (অর্থাৎ, তিনি মানুষটি যদি দু মিটার লম্বা হন, তখন হয়ে যাবেন এক-মিটার)। জে. জে. টমসন বলেছিলেন, মাস্টারমশাইরা অনেকেই ছাদের ঘরের চেয়ে একতলার ঘর পছন্দ করেন, তাঁরা জেনে রাখুন যতো বেশি উঁচুতে তাঁরা উঠবেন ততো তাঁদের স্পেস হবে ইউক্লিডীয়—কেননা, যতো বেশি উঁচুতে মহাকর্ষের ক্রিয়া ততো বেশি দূরে।

**আইনস্টাইনের নিজের ভাষায়, 'Da koennt' mir der liebe Gott leid tun, die Theorie stimmt doch'। ইংরেজি অনুবাদে—'Then I would have been sorry for the dear Lord—the theory is correct'.

দ্বিতীয়বার খবর পেয়েছিলেন ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ তারিখে লোরেন্ৎস-এর কাছ থেকে পাওয়া একটি তারবার্তায়—'এডিংটন দেখেছেন সূর্যের কিনারে তারা সরে যায়'। আইনস্টাইন একটি পোস্টকার্ড লিখে খবরটা তাঁর মাকে জানিয়েছিলেন। চিঠির প্রায় সবটা জুড়েই ছিল পারিবারিক বিষয় নিয়ে কথা, তার সঙ্গে শুরুতে এই একটিমাত্র লাইন—'আজকের খবর আনন্দের, এইচ এ লোরেন্ৎস টেলিগ্রাম করে আমাকে জানিয়েছেন—ইংরেজ অভিযান থেকে প্রকৃতই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে সূর্যের দ্বারা আলো বিক্ষিপ্ত হয়।'

আইনস্টাইনের মা তখন ছিলেন লুসার্ন-এর একটি স্বাস্থ্যনিবাসে। আইনস্টাইনের বাবা হেরমান আইনস্টাইন আগেই মারা গিয়েছেন। তারপরে মা পাউলিনে কিছুদিন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছিলেন। ১৯১৯ সালে এল্সাকে বিয়ে করার পরে দুই সৎ-মেয়ে ইল্জে ও মার্গটকে নিয়ে আইনস্টাইন যখন বার্লিনে নয়-কামরার বড়ো ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন (৫, হাবেরলাণ্ডস্ট্রাসে), মা পাউলিনেও থাকতে এলেন সেখানে। ১৯২০ সালে এই বাড়িতেই তিনি মারা যান।

আইনস্টাইন তখন খ্যাতির তুঙ্গে। খবরের কাগজে যেদিন খবর বেরিয়েছিল যে সূর্য তারার আলোকে বেঁকিয়ে দেয় সেদিন থেকেই তাঁর নাম সারা বিশ্বের ঘরে ঘরে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিরাট এক আলোড়নের জনক—একটা প্রতীক। কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষে এমন দিগ্বিজয়ী খ্যাতিলাভ আর কখনো ঘটেনি।

আর ঠিক এই সময়েই জার্মানিতে ইহুদী-বিরোধিতার প্রথম প্রচণ্ড প্রকাশ ঘটে গিয়েছিল। এই ইহুদী-বিরোধিতার অঙ্গ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছিল আইনস্টাইন-বিরোধী আন্দোলনও। আক্রমণ শুরু হয় ১৯১৯ সাল শেষ হবার আগেই। এরেনফেস্টকে আইনস্টাইন লিখেছিলেন, বার্লিনে উৎকট ইহুদী-বিরোধিতা চলছে। এই সময়ে লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকা আইনস্টাইনের কাছে একটি লেখা চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছিল যে আইনস্টাইন যেন সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। 'আপেক্ষিকতার তত্ত্ব কী?' এই নামে তাঁর লেখাটি 'টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২৮ নভেম্বর ১৯১৯ সালে। লেখার শেষে তিনি একটি মন্তব্য যোগ করেছিলেন,

সেটি এই :

> আমার জীবন সম্পর্কে ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আপনার পত্রিকায় যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তার অনেকগুলোই লেখকের জীবন্ত কল্পনাপ্রসূত। পাঠককে আনন্দিত করার মতো এই হচ্ছে আপেক্ষিকতার নিয়মের আরো একটি প্রয়োগ : আজকের দিনে জার্মানিতে আমাকে বলা হচ্ছে 'জার্মান পণ্ডিত' ও ইংলণ্ডে 'সুইস ইহুদী'। কিন্তু কখনো যদি আমার কপাল এমন হয় যে আমাকে জুজু হিসেবে দেখাতে হবে তাহলে জার্মানদের কাছে আমি হয়ে উঠব 'সুইস ইহুদী' আর ইংরেজদের কাছে 'জার্মান পণ্ডিত'।

আইনস্টাইন হয়তো তখনই দেখতে পেয়েছিলেন, একটা জুজু তুলে ধরে তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরি হচ্ছে। আক্রমণকারীদের বক্তব্য ছিল এই রকম : আপেক্ষিকতা এক পুরোপুরি ইহুদীচক্রান্ত— সাধারণভাবে বিশ্বের বিরুদ্ধে, বিশেষভাবে জার্মানির বিরুদ্ধে। আপেক্ষিকতার চরিত্রটাই ইহুদি ইত্যাদি। আর আক্রমণ চলছিল আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত চরিত্রের কথা তুলে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি কিছুমাত্র শোনা যেত না।

আইনস্টাইন-বিরোধীরা শেষপর্যন্ত একটি সংগঠন খাড়া করতে পারলেন—'জার্মান প্রাকৃতিক দার্শনিকদের অধ্যয়ন গোষ্ঠী'। এই সংগঠনের হাতে ছিল প্রচুর অর্থ এবং সেটা অকাতরে ব্যয় করা হত আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ও লেখার জন্য। তথাকথিত এই অধ্যয়ন গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন বিজ্ঞানীমহলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক ব্যক্তি—পাউল ভাইলাণ্ট। জনকয়েক পদার্থবিজ্ঞানীও গোষ্ঠীর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—যেমন, আর্নস্ট গেরকে, আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণার জন্য বিখ্যাত ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফিলিপ লেনার্ড। আইনস্টাইন এই গোষ্ঠীর নাম দিয়েছিলেন 'আপেক্ষিকতা বিরোধী কোম্পানী'।* কোম্পানীটি মোটেই নিরীহ

---

*আপেক্ষিকতা বিরোধী কোম্পানীকে নিয়ে আইনস্টাইন একবার বড়োই মজা করেছিলেন। কোম্পানীর কর্মসূচীতে ছিল আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবার জন্য জার্মানির সবচেয়ে বড়ো বড়ো কুড়িটি শহরে সভা ডাকা। প্রথম সভার আয়োজন হল কোম্পানির সদরদপ্তর বার্লিনে ২৭

ছিল না, আইনস্টাইনকে হত্যা করার প্ররোচনা পর্যন্ত কোম্পানীর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল।

মহাকর্ষের তত্ত্ব

বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে বিচারের বিষয় ছিল সরলরেখায় সমবেগের গতি। সেখানে দর্শক হয় স্থিতিশীল কিংবা সমবেগে আপেক্ষিক গতিশীল। এই দর্শকের গতিকে বলা হয় জড়ত্বীয়, তার নির্দেশ-ফ্রেমকে জড়ত্বীয় নির্দেশ-ফ্রেম। সাবেকী পদার্থবিদ্যায় নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্রেও নির্দেশ-ফ্রেম হওয়া চাই জড়ত্বীয়। যেমন, নিউটনের গতিবিষয়ক প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে, কোনো বল ক্রিয়া না করলে স্থির বস্তু স্থির অবস্থাতেই থেকে যায়, আর বস্তু সচল থাকলে সমবেগে সরলরেখায় চলতে থাকে। এমনটি দেখা সম্ভব একমাত্র সেই দর্শকের পক্ষে যার নির্দেশ-ফ্রেম জড়ত্বীয়।*

আগস্ট ১৯২০ তারিখে। সভায় প্রচুর লোক এল, কিন্তু সভার আবহাওয়ায় গুরুগম্ভীর ভাবটি যেন লাগল না—যেন একটা প্রহসন হতে চলেছে। প্রথমে বক্তৃতা দিলেন ভাইলাণ্ট, তারপরে গেরকে। আর ঠিক তখনই সারা হলঘরে গুঞ্জন উঠল, 'আইনস্টাইন, আইনস্টাইন'। আইনস্টাইন নিজেই এসেছেন ব্যাপারটা কী হচ্ছে দেখার জন্য। তারপরে বক্তৃতা শুনতে শুনতে সারাক্ষণ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন এবং কপট প্রশংসায় হাততালি দিলেন। পরে বন্ধুদের বলেছিলেন, 'কী মজাই না হল!'

*বিষয়টি নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি, আরো একবার মনে করিয়ে দিতে চাই। ঘুরন্ত নয়, ত্বরণযুক্ত নয়, এমন যে নির্দেশ-ফ্রেম তার নাম জড়ত্বীয় নির্দেশ-ফ্রেম। এমনি জড়ত্বীয় নির্দেশ-ফ্রেম অসংখ্য হতে পারে। যে-কোনো দুটি নির্দেশ-ফ্রেম কোনোরকম ঘূর্ণন ব্যতিরেকে সরলরেখায় সমবেগে পরস্পরের আপেক্ষিক গতিশীল থাকে। সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল দর্শককে বলা হয় জড়ত্বীয় দর্শক। ভৌতিক দিক থেকে সকল জড়ত্বীয় দর্শক সমতুল, কেননা এমন কোনো আভ্যন্তরিক পরীক্ষাকার্য সম্ভব নয় যার দ্বারা একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করে ধরা যেতে পারে।

তেমনি, নিউটনের সূত্রের বদলে গতিবিষয়ক যে নতুন সূত্র বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে পাওয়া যায়, তাও নিরূপিত হয়েছে জড়ত্বীয় নির্দেশ-ফ্রেমের বিচারেই।

কিন্তু বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের দশবছর পরে আইনস্টাইন যে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব উপস্থিত করেন সেখানে বিচার কিন্তু জড়ত্বীয় নির্দেশ-ফ্রেমে নয়। সেখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে সম্ভাব্য সকল প্রকারের গতিতে সম্ভাব্য সকল প্রকারের নির্দেশ-ফ্রেম সমান অবস্থানে রয়েছে। একে বলা হয় সাধারণ সহভেদের নিয়ম (principle of general covariance)। কথাটা আসলে কী? এখানে গতি হতে পারে যতো রকমের হওয়া সম্ভব—সমস্তই। দর্শক হতে পারে যতো রকমের হওয়া সম্ভব—সমস্তই (বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মতো শুধু জড়ত্বীয় ফ্রেমের দর্শক নয়)। তাই যদি হয় তাহলেও প্রকৃতির নিয়মগুলো একই গাণিতিক চেহারায় প্রকাশ করা চলে। এই হচ্ছে সাধারণ সহভেদের নিয়ম। সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে আইনস্টাইন এই নিয়ম কাজে লাগিয়েছেন। তার সঙ্গে আছে আরো একটি নিয়ম যার নাম, আমরা আগেই আলোচনা করেছি, মহাকর্ষ ও জড়ত্বের সমতুলতার নিয়ম। মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, মহাকর্ষ ও জড়ত্বের সমতুলতার নিয়মের কথা শুধু এইটুকু যে জড়ত্বীয় বলের দ্বারা উৎপন্ন গতি (ত্বরণ. কেন্দ্রাতিগ বল, প্রত্যাগতি ইত্যাদি) মহাকর্ষীয় বলের দ্বারা উৎপন্ন গতি থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করলেন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই ঘটনা যে, সকল বস্তু সমান ত্বরণ নিয়ে মাটিতে পড়ে (জড়ত্বীয় ভর ও মহাকর্ষীয় ভরের সমতা)। তার মানে, মাটিতে পড়ার সময়ে এক বস্তুর বিচারে অপর বস্তুর কোনো ত্বরণ নেই। তার মানে, নির্দেশ-ফ্রেমটি যদি এমন হয় যে কোনো বস্তু যে-ত্বরণ নিয়ে মাটিতে পড়ে সেই ত্বরণে গতিশীল, তাহলে সেই নির্দেশ-ফ্রেমের বিচারে সকল পড়ন্ত বস্তু সমবেগসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আইনস্টাইন অবাধে পতনশীল লিফ্‌টের কল্পনা করেছেন (বিষয়টি নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি)। এ-থেকে আইনস্টাইন সিদ্ধান্ত করলেন, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বেলায় সবসময়েই

এমন এক স্পেস-সময় ফ্রেমে রূপান্তরণ সম্ভব যেখানে মহাকর্ষের ক্রিয়া দেখা যায় না।

ত্বরণযুক্ত গতির ক্ষেত্রে যদি আপেক্ষিকতার নিয়ম পেতে হয়—তাহলে দেখা দরকার আলোর ব্যাপারটাকেও মহাকর্ষ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা। অবাধে পতনশীল সেই লিফ্‌টের দৃষ্টান্তে আমরা দেখেছি, আলো বেঁকে যাচ্ছে। আরও দেখেছি, সূর্যের কিনার দিয়ে আসা তারার আলো বেঁকে যায়। এমনটি যে ঘটে তার কারণ আলোর ভর আছে (আলো গতিশীল, এতএব আলো লাভ করে গতির ভর)। ভরবিশিষ্ট আলোকে আকর্ষণ করে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। এ থেকে তাহলে অন্য একটি সিদ্ধান্তও টানতে হয়। যেহেতু আলোর ভর আছে, অতএব মহাকর্ষীয় বলের ক্রিয়ায় আলোর ত্বরণ ঘটতে পারে। অথচ বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে আমরা জানি যে আলোর বেগ নিত্য। আইনস্টাইন এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন এবং বললেন যে বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রযোজ্য কেবল সেই এলাকাতেই যেখানে মহাকর্ষীয় বলের অস্তিত্ব না-থাকার মতো। তারার আলো যে প্রকৃতই বেঁকে যায় তার প্রমাণ বাস্তবে পাওয়া গেল। এমনিভাবে ত্বরণযুক্ত তন্ত্রকেও আপেক্ষিকতার নিয়মের মধ্যে আনতে পারা গেল। সকল প্রকারের গতির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হল স্পেস-সময় সম্পর্ক।

বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে আমরা দেখেছি, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র যেখানে অনুপস্থিত সেখানে স্পেস-সময় সম্পর্ক গ্যালিলীয় আপেক্ষিকতার নিয়ম মেনে চলে।* এমনি একটি সম্পর্ককে নির্দেশ করা যাক যে-কোনো প্রকারের গতিসম্পন্ন অন্য আরেকটি সম্পর্কের সঙ্গে। তাহলে জড়ত্ব ও মহাকর্ষের সমতুলতার নিয়ম অনুসারে বলা চলে, দ্বিতীয় সম্পর্কের আপেক্ষিকে একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র পাওয়া যায়। সেই ক্ষেত্রের ধরন অবশ্যই নির্ভর করে গতির ধরনের ওপরে। বিশেষ ধরনের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও এ-থেকে

*মনে করিয়ে দেবার জন্য বলি, গ্যালিলীয় আপেক্ষিকতার নিয়মটি এই—বলবিদ্যার নিয়ম যদি একটি ফ্রেমে সিদ্ধ হয় তাহলে সেই ফ্রেমের আপেক্ষিকে সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল অন্য কোনো ফ্রেমেও সিদ্ধ।

মহাকর্ষের সাধারণ সূত্রটি না-পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে তার আগে গুরুতর রকমের একটি অসুবিধে কাটিয়ে ওঠা দরকার। সেজন্য চাই স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও প্রসারিত করা।

এক্ষেত্রেও স্পেস ও সময়ের সঙ্গে মাপনদণ্ড ও ঘড়ি জড়িত। বিষয়টিকে বোঝাবার জন্য আইনস্টাইন একটি ঘুরন্ত নির্দেশ-ফ্রেমে মাপনদণ্ড ও ঘড়ি বসিয়েছেন। ধরা যাক একটি ঘুরন্ত চাকতি। দৃষ্টান্তটি নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি এবং তখন দেখেছি—ঘুরন্ত চাকতির কেন্দ্রে থাকা দর্শকের কাছে পরিধিতে থাকা ঘড়ি আস্তে চলে, পরিধির মাপ ব্যাসের 'পাই'-গুণ হয় না। ইউক্লিডীয় জ্যামিতি এখানে অচল। আমরা আরো দেখেছি, চাকতির দর্শক এমন ধারণাও করতে পারেন যে তিনি রয়েছেন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে। এ থেকে প্রমাণ হয়, সাধারণভাবে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি হুবহু প্রযোজ্য হতে পারে না। বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে যে পদ্ধতিতে আমরা স্থানাঙ্ক নিরূপণ করেছি, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে তা অচল।

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বা মহাকর্ষের তত্ত্ব সম্পর্কে এই হচ্ছে আসল কথা—মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্পেস ও সময়ের জ্যামিতি অন্যরকম হয়ে যায়। কথাটার অর্থ সঠিকভাবে কী দাঁড়াচ্ছে তা স্পষ্ট জানা দরকার।

ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ। কিন্তু পৃথিবীর মতো একটি গোলকের উপরিতলে যদি আমরা একটি ত্রিভুজ আঁকি তাহলেও কি সেই ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ? না। একটি ভূ-গোলক নিয়ে সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। উত্তরমেরু হোক ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু, বিষুবরেখার অংশ হোক ভূমি—যে ত্রিভুজটি পাওয়া যাচ্ছে তার তিনকোণের সমষ্টি দুই-সমকোণের চেয়ে বেশি। এই ত্রিভুজ অ-ইউক্লিডীয়। একটি তারা থেকে ভূপৃষ্ঠের দুই পৃথক বিন্দুতে আলো এসে পৌঁছচ্ছে। তারা শীর্ষবিন্দু, আলোর দুই রেখা দুটি বাহু, দুই বিন্দুর সংযোগরেখা ভূমি। এই ত্রিভুজ কি ইউক্লিডীয়? তিনটি

কোণের মাপ নিলেই জানা যাবে—ইউক্লিডীয় নয়।

অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি যে থাকতে পারে, এই প্রশ্ন প্রথম তুলেছিলেন জার্মান গণিতবিদ কার্ল ফ্রীডরিখ গাউস *—আঠারো শতকের শেষদিকে ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। পরবর্তী কালে গাউস ও আরো দুজন গণিতবিদ অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নিখুঁতভাবে গড়ে তুললেন এবং প্রমাণ দিলেন যে এই অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতেও উপপাদ্যগুলিকে সঠিকভাবে প্রমাণ করা চলে। পরে উনিশ শতকের জার্মান গণিতবিদ বার্নহার্ট রীমান এই অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে আরো উন্নত করেন।

এবার তাহলে স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতার কথা তোলা চলে। বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে যে চারমাত্রার স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতার কথা আমরা বলেছিলাম তার মাপ ছিল কার্টেজীয় স্থানাঙ্কে। তার নাম আমরা দিয়েছিলাম 'গ্যালিলীয় নির্দেশতন্ত্র'। আমরা আরো দেখেছিলাম, একটি গ্যালিলীয় ব্যবস্থা থেকে সমবেগে গতিশীল অপর

* কার্ল ফ্রীডরিখ গাউস (১৭৭৭—১৮৫৫) ছিলেন গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানী। তাঁর সমকক্ষ বিজ্ঞানী কমই ছিলেন। সংখ্যাতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। গাউসকে বলা চলে সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ—আর্কিমিডিস ও নিউটনের সঙ্গে তুলনীয়। অল্প বয়সেই তিনি আঠারো শতকীয় গণিতের তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে উল্টিয়ে দিয়ে নিজস্ব বিপ্লবী সংখ্যাতত্ত্বের অনুসরণে প্রবর্তন করেছিলেন মধ্য-উনিশ শতকীয় কঠোর বিশ্লেষণ। বিশুদ্ধ গণিতে তাঁর অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ-শতকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধরাকৃতিবিদ্যা ও বিদ্যুৎচুম্বকতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর বাস্তব প্রয়োগগত কাজ গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম জার্মানির ব্রুনস্‌ভিক্-এ গরীব কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম, একজন ডিউকের বদান্যতায় শিক্ষালাভ। গণিত পাঠ করেন গোয়েটিঙ্গেনে, ডক্টরেট লাভ হেল্‌ম্‌স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চব্বিশবছর বয়সে প্রকাশিত হয় সংখ্যাতত্ত্ব-বিষয়ক তাঁর অসাধারণ গ্রন্থটি। ১৮০৭ সালে গোয়েটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও নতুন মানমন্দিরের অধ্যক্ষ হন। বাকি জীবন এখানেই কাটিয়েছিলেন। ১৮২০ সাল থেকে মনোযোগ দিয়েছিলেন পৃথিবীর উপরিতলের গড়ন ও আকারের গাণিতিক নির্ধারণে। প্রায় ১৫৫টি গ্রন্থের প্রণেতা।

একটি গ্যালিলীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরণের জন্য লোরেন্‌ৎস রূপান্তরণের সমীকরণই যথেষ্ট ছিল। আমরা জানি, বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের এই সমস্ত সিদ্ধান্তই এসেছে একটি সিদ্ধান্ত থেকে—আলোর বেগের নিত্যতা। পরে আমরা জেনেছি মহাকর্ষের অস্তিত্ব যেখানে নেই সেখানে এই সিদ্ধান্ত প্রকৃত সত্য। বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতা হচ্ছে ইউক্লিডীয় নিরবচ্ছিন্নতা।

পরে আমরা জেনেছি, মহাকর্ষ যেখানে আছে সেখানে আলোর বেগের নিত্যতা বজায় থাকে না। আলোর ভর আছে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে আলোর বক্রতা ঘটে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে আলোর বেগ স্থানাঙ্কের ওপরে নির্ভরশীল হয়। অন্যদিকে সেই ঘুরন্ত চাকতির দৃষ্টান্ত থেকে আমরা দেখেছি, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অস্তিত্ব থাকলে বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের অর্থে স্থানাঙ্ক ও সময় বাতিল হয়ে যায়। অতএব, সাধারণ আপেক্ষিকতার নিয়মে* স্পেস-সময় নিরবিচ্ছন্নতাকে ইউক্লিডীয় মনে করা চলে না।

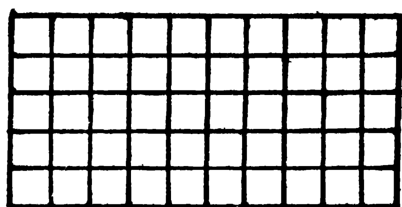
ইউক্লিডীয় ও অ-ইউক্লিডীয় নিরবচ্ছিন্নতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেবার জন্য আইনস্টাইন একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

একটি মার্বেল পাথরের টেবিল আমাদের সামনে পাতা রয়েছে। এই মার্বেলের এক বিন্দু থেকে অন্য যে-কোনো বিন্দুতে আমরা যেতে পারি নিরবচ্ছিন্নভাবে এক বিন্দু থেকে পার্শ্ববর্তী বিন্দু অতিক্রম করে—বিন্দু থেকে বিন্দুতে যাবার জন্য লম্ফ দিয়ে দিয়ে নয়। এই শর্ত যদি পূরণ হয় তাহলে মার্বেল পাথরের তল নিরবচ্ছিন্নতা বিশিষ্ট।

এবারে অনেকগুলো ছোট ছোট সমান দৈর্ঘ্যের দণ্ড নিয়ে সেই মার্বেল পাথরের ওপরে গায়ে গায়ে লাগানো চৌখুপি তৈরি

* বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে আমরা মেনে নিয়েছিলাম গ্যালিলিওর আপেক্ষিকতার নিয়ম। সেখানে স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতা ছিল ইউক্লিডীয় নিরবচ্ছিন্নতা। আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, গ্যালিলিওর আপেক্ষিকতার নিয়ম এই: বলবিদ্যার নিয়ম যদি কোনো একটি তন্ত্রে সিদ্ধ হয় তাহলে সেই তন্ত্রের আপেক্ষিকে সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল অন্য কোনো তন্ত্রেও সিদ্ধ। সাধারণ আপেক্ষিকতার নিয়মের বেলায় সরলরেখায় সমবেগের গতি নয়, যে-কোনো গতি বিবেচনা করা হয়।

করা যাক। প্রত্যেকটি চৌখুপি এক একটি বর্গক্ষেত্র, প্রত্যেকটি বর্গক্ষেত্র সমান মাপের। আয়োজনটি এমন যে প্রত্যেক বাহু



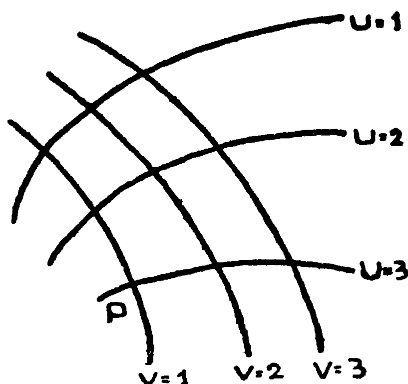
একটি মার্বেল পাথরের ওপরে চৌখুপি তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক চৌখুপি সমান মাপের বর্গক্ষেত্র। প্রত্যেক বাহু দুটি বর্গক্ষেত্রের বাহু। প্রত্যেক কৌণিক বিন্দু চারটি বর্গক্ষেত্রের কৌণিক বিন্দু। এমনটি হলে মার্বেল পাথরের বিন্দুগুলো নিয়ে গঠিত হয় ইউক্লিডীয় নিরবচ্ছিন্নতা।

দুটি বর্গক্ষেত্রের বাহু হয়ে থাকে, প্রত্যেক কৌণিক বিন্দু চারটি বর্গক্ষেত্রের কৌণিক বিন্দু হয়ে থাকে।

আয়োজনটি যদি নিখুঁত হয়ে থাকে তাহলে বলা চলে, মার্বেল পাথরের বিন্দুগুলো নিয়ে একটি ইউক্লিডীয় নিরবচ্ছিন্নতা গঠিত হয়েছে। এই আয়োজনে যে-কোনো একটি কৌণিক বিন্দুকে উৎস ধরে নিয়ে অন্য যে-কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ধারণ করা চলে। এই স্থানাঙ্ক কার্টেজীয় স্থানাঙ্ক।

কিন্তু এই নিখুঁত আয়োজনটিও সহজেই ওলোট-পালোট হয়ে যেতে পারে। মনে করা যাক দণ্ডগুলো এমনই যে উত্তাপ পেলে লম্বায় বড়ো হয়, যতো বেশি উত্তাপ ততো বেশি লম্বা। এবার সেই মার্বেল পাথরের মধ্য-অংশ উত্তপ্ত করা যাক—কিনারের অংশ বাদ দিয়ে। তখন মার্বেল পাথরের মধ্য-অংশের দণ্ডগুলো লম্বায় বেড়ে যায়। ফলে বর্গক্ষেত্রগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ে। এই অবস্থায়, দণ্ড যদি বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহলে মার্বেল পাথরকে কিছুতেই ইউক্লিডীয় নিরবচ্ছিন্নতা বলা চলে না। তখন আর কার্টেজীয় স্থানাঙ্ক-নির্ধারণ সম্ভব নয়। তখন অন্য যে নির্দেশতন্ত্রের সাহায্যে এই এলো-

মেলো হয়ে যাওয়া আয়োজনের স্থানাঙ্ক নির্ধারণ করা চলে তার নাম গাউসীয় নির্দেশতন্ত্র। এই ব্যবস্থায় মার্বেলের ওপরে আঁকা হয় যথেচ্ছ কতকগুলো বক্ররেখা, ঘন-সন্নিবিষ্ট ভাবে অথচ কোনোটির



গাউসীয় নির্দেশতন্ত্র। P বিন্দুর গাউসীয় স্থানাঙ্ক হচ্ছে u=3, v=1

সঙ্গে কোনোটির ছেদ না ঘটিয়ে। তার পরে আঁকা হয় এমনি আরো একপ্রস্থ বক্ররেখা। প্রত্যেক প্রস্থের প্রত্যেকটি রেখাকে যদি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় তাহলে এই দুই প্রস্থ বক্ররেখার সাহায্যে মার্বেলের যে-কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ধারণ করা চলে। এই হচ্ছে গাউসীয় স্থানাঙ্ক।

বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের জন্য আমরা গ্যালিলিওর আপেক্ষিকতার নিয়ম ধরে নিয়েছিলাম। সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের জন্য সাধারণ আপেক্ষিকতার নিয়ম। এবারে এই নিয়মটিকে এমনিভাবে বলা চলে: প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম উপস্থিত করাব জন্য সকল গাউসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা মূলত সমতুল। তার মানে, সরল রেখায় সমবেগের গতির বেলায় আমরা ব্যবহার করি কার্টেজীয় স্থানাঙ্ক, ত্বরণযুক্ত গতির বেলায় গাউসীয় স্থানাঙ্ক।

মনে করা যাক নির্দেশতন্ত্রে একটি অক্ষে দেখানো হয়েছে অতিক্রান্ত পথ, অন্য অক্ষে অতিবাহিত সময়। বস্তুর গতিতে যদি কোনো বলের ক্রিয়া না থাকে তাহলে সেই গতি সরলরেখায় নির্দেশিত হয়। আর বস্তুর গতি ত্বরণযুক্ত হলে বক্ররেখায়। তাহলে

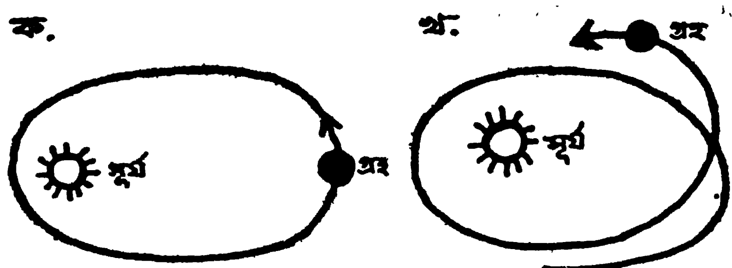
বলতে পারি, মহাকর্ষের ক্ষেত্রে সকল গতিই বক্ররেখায়। এ থেকে সমগ্রভাবে স্পেস-সময়ের বক্রতার কথা ওঠে।

কথাটার অর্থ ধরবার জন্য দুই-মাত্রার স্পেসের বক্রতা বিবেচনা করা যেতে পারে। দুই মাত্রার স্পেস মানে যে-কোনো একটি তল। মনে করা যাক কোনো একটি তলের ওপরে আমরা গোটাকতক ত্রিভুজ টেনেছি এবং তাদের কোণগুলির সমষ্টির মাপ নিচ্ছি। একটি এলাকায় এসে আমরা দেখতে পাই, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই-সমকোণের সমান নয়। তার মানে, স্পেস সেখানে আর ইউক্লিডীয় নয়। কল্পনা করা চলে, তলটি যেন দুমড়ে গিয়েছে। দুই-মাত্রার স্পেসের বেলায় এই বিকৃত চেহারা কল্পনা করা শক্ত নয়। কিন্তু তিন-মাত্রার স্পেসের বা চার-মাত্রার স্পেস-সময়ের বক্রতার চেহারা কল্পনা করা অসম্ভব। এ-কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করা যায় যদি আমরা কল্পনা করি, অতিক্রান্ত পথ ও অতিবাহিত সময়ের পটে আঁকা সমস্ত রেখাই বক্র। যেহেতু মহাকর্ষ এই বক্রতা ঘটাতে পারে, অতএব মহাকর্ষকে উপস্থিত করা চলে স্পেস-সময়ের বক্রতার প্রকাশ হিসেবে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে এই কাজটিই করা হয়েছে।

এই তত্ত্ব অনুসারে, মহাকর্ষের বল নির্ধারণ করতে হলে নির্ধারণ করতে হয় স্পেস-সময়ের বক্রতা। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র যদি না থাকে তাহলে স্পেস-সময়ের বক্রতা থাকে না এবং বস্তুর গতি হয় সরল-রেখায় ও সমবেগে। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র থাকলেই স্পেস-সময়ের বক্রতা ঘটে এবং বস্তুর গতি হয় বক্র।

এই তত্ত্বের ফল হিসেবে আইনস্টাইন নির্ধারণ করলেন সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলির পরিক্রমার পথ। নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র থেকে আমরা জেনেছিলাম, সূর্যের চারদিকে গ্রহের পরিক্রমা উপ-বৃত্তাকার কক্ষে। আইনস্টাইনের সূত্র থেকেও তাই—উপবৃত্তাকার কক্ষ। কিন্তু সামান্য একটু তফাৎ পাওয়া গেল এই যে নিউটন অনুসারে গ্রহের পরিক্রমার উপবৃত্তাকার কক্ষ স্থির, আইনস্টাইন অনুসারে গ্রহের পরিক্রমার উপবৃত্তাকার কক্ষ আবর্তনশীল। নিচের ছবি দেখলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

কিন্তু এই আবর্তনের মাত্রা এতই সামান্য যে অধিকাংশ গ্রহের বেলায় তা ধরাই যায় না। যেমন, পৃথিবীর কক্ষ আবর্তিত হয় প্রতি



(ক) নিউটনের সূত্র অনুসারে গ্রহের কক্ষ স্থির উপবৃত্ত
(খ) আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে গ্রহের কক্ষ আবর্তনশীল উপবৃত্ত

একশো বছরে মাত্র ৩৮ সেকেণ্ডের মাত্রায়। আমরা যদি মনে রাখি ৬০ সেকেণ্ডে এক-মিনিট, ৬০ মিনিটে এক ডিগ্রী, ৯০ ডিগ্রীতে এক সমকোণ. তাহলে হিসেব করলে দেখা যাবে ৩,২৪,০০০ সেকেণ্ডে এক সমকোণ হয়। তার মানে ৩৮ সেকেণ্ড হচ্ছে এক-সমকোণের প্রায় একলক্ষ-ভাগের এক-ভাগ। আর এই সামান্য পরিমাণ আবর্তনের জন্য সময় লাগে একশো বছর। তার মানে, পুরো একটি আবর্তনের জন্য (৩৬০ ডিগ্রী) সময় লাগার কথা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ বছর।

এই কারণে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের প্রমাণ পাবার জন্য এমন একটি গ্রহ পাওয়া দরকার ছিল যার কক্ষ আরো বেশি পরিমাণে আবর্তিত হয়। পৃথিবীর কক্ষের আবর্তন এমনিতেই কম, তার ওপরে পৃথিবীর কক্ষের চেহারা প্রায় বৃত্তের মতো—এই কারণে আবর্তন হচ্ছে কিনা তা ধারণাটাও শক্ত। আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে জানা গেল, কক্ষ-পরিক্রমায় যে-গ্রহের বেগ সবচেয়ে বেশি সেই গ্রহের কক্ষের আবর্তনও সবচেয়ে বেশি। আর কক্ষটি যতো উপবৃত্তাকার হয় ততোই কক্ষের আবর্তন ভালোভাবে ধরা পড়ে। দু-দিক থেকেই সবচেয়ে উপযুক্ত গ্রহ হচ্ছে বুধ। অনেক দিন থেকেই জানা ছিল বুধের কক্ষের আবর্তনের পরিমাণ প্রতি একশো বছরে প্রায় ৫৭৪ সেকেণ্ড। তার মধ্যে ৫৩১ সেকেণ্ডের

আবর্তন ঘটে অন্যান্য গ্রহের মহাকর্ষীয় ক্রিয়ার দরুন। বাকি থেকে যায় ৪৩ সেকেণ্ড। এই ৪৩ সেকেণ্ডের ব্যাখ্যা কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। একসময়ে ভাবা হয়েছিল, বুধ ও সূর্যের মধ্যে আরো একটি গ্রহ আছে যার দরুন বুধের কক্ষে এই ৪৩ সেকেণ্ডের আবর্তন ঘটছে। ইউরেনাসের কক্ষের আবর্তনের ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে, এমনিভাবেই আবিষ্কৃত হয় নেপচুন ও প্লুটো। শেষপর্যন্ত বুধের কক্ষের ৪৩ সেকেণ্ড পরিমাণ আবর্তনের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে।

মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে ঘড়ি আস্তে চলে

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে আরো জানা গিয়েছে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে ঘড়ি আস্তে চলে। একটি ঘড়ি যদি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে থাকে এবং অপর একটি ঘড়ি এমন কোনো জায়গায় যেখানে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র নেই, তাহলে দেখা যাবে প্রথম ঘড়িটি দ্বিতীয় ঘড়ির চেয়ে আস্তে চলছে। মহাকর্ষীয় ভর যার বেশি সেখানে রাখা ঘড়ি মহাকর্ষীয় ভর যার কম সেখানে রাখা ঘড়ির চেয়ে আস্তে চলে। একটি ঘড়ি পৃথিবীতে যেমন চলে, বৃহস্পতিতে চলে তার চেয়ে আস্তে, সূর্যে এমনকি তার চেয়েও আস্তে। আইনস্টাইন হিসেব করে দেখালেন, সূর্যের ঘড়ির ১ সেকেণ্ড পৃথিবীর ঘড়ির ১.০০০০০২ সেকেণ্ডের সমান। তার মানে, সূর্যের ঘড়ি ৫,০০,০০০ সেকেণ্ড পরে (৬ দিনের সামান্য কম সময়ে) পৃথিবীর ঘড়ির চেয়ে ১ সেকেণ্ড আস্তে হয়ে যায়।

বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বেও আমরা দেখেছি, সমবেগে গতিশীল ঘড়ি স্থিতিশীল দর্শকের কাছে মনে হয় আস্তে চলছে। মহাকর্ষীয়

ক্ষেত্রে ঘড়ি থাকা মানে সমান মাত্রায় ত্বরণশীল হওয়া। কাজেই সমান মাত্রায় ত্বরণশীল ঘড়িতেও একই লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে বলা হয়েছে, যে-কোনো মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে ঘড়ি আস্তে চলে।

কিন্তু সূর্যের ঘড়ি পৃথিবীর ঘড়ির চেয়ে যে আস্তে চলে, সেটা প্রমাণ করা যায় কি করে? সত্যিকারের একটা ঘড়ি সূর্যে নিয়ে বসানো গেল, তা তো আর সম্ভব নয়। কিন্তু অন্য উপায় আছে। সূর্যে পাওয়া যায় বহু 'পারমাণবিক ঘড়ি'। ব্যাপারটা এই যে সূর্যে আছে বহু বিভিন্ন ধরনের স্পন্দনশীল পরমাণু, যার ফলে সূর্য থেকে আলো আসে। যন্ত্রের সাহায্যে এই স্পন্দনের কম্পন নির্ধারণ করা চলে, তা থেকে প্রতি স্পন্দনের সময়। এবার পৃথিবীতে অনুরূপ স্পন্দনশীল পরমাণুর কম্পন ও প্রতি স্পন্দনের সময়ের মাপ নেওয়া যেতে পারে। এই দুয়ের তুলনা করলে দেখা যাবে, একই পরমাণু সূর্যে স্পন্দিত হলে তার কম্পন পৃথিবীতে স্পন্দিত হলে তার কম্পনের চেয়ে কম। তার মানে, প্রতি স্পন্দনের সময় সূর্যে বেড়ে গিয়েছে। তার মানে, সূর্যের সময় আস্তে হয়ে গিয়েছে।

তাহলে কথাটা এই যে সূর্যের আলোর কম্পন কমে যায়। তাই যদি হয় তাহলে আশা করা চলে, সূর্যের আলোর কম্পনগুলো দৃশ্যমান বর্ণালির * লাল প্রান্তের দিকে সরে যাবে, কেননা লাল রঙের কম্পন বর্ণালির অন্যান্য রঙের কম্পনের চেয়ে কম। কম্পনগুলো লালের দিকে সরে যাওয়াকে বলা হয় 'লাল অপসরণ' (red shift)। লাল অপসরণ অন্য নানা কারণেও ঘটতে পারে, কিন্তু ওপরে আলোচিত কারণে যখন ঘটে তখন তাকে বিশেষভাবে

* বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ যখন অঙ্গীভূত তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলিতে বা কম্পন-গুলিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে তখন যে ফল পাওয়া তার নাম বর্ণালি। দৃশ্যমান এলাকায় সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্তটি পাওয়া যায় একটি ত্রিশিরা কাঁচ বা প্রিজমের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো চালিত করলে। সাদা আলো সাতটি রঙে ভেঙে পড়ে—লাল, কমলা, হলদে, সবুজ, আসমানী, নীল ও বেগুনী। কম্পনের দিক থেকে লালে কম, তারপরে বাড়তে বাড়তে বেগুনীতে বেশি। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিক থেকে লালে বেশি, তারপরে কমতে কমতে বেগুনীতে কম।

চিহ্নিত করার জন্য বলা হয় 'আপেক্ষিক অপসরণ' বা 'আইনস্টাইন অপসরণ'।

সূর্যের বেলায় আইনস্টাইন অপসরণ এতই কম যে তার মাপ নেওয়াটা সহজ ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কালে এই মাপ আরো সহজে নেওয়া গিয়েছে একশ্রেণীর তারার বেলায়, যাদের নাম 'সাদা বামন'।* একটি বামনকে পাওয়া যায় লুব্ধক তারার সঙ্গী হিসেবে (লুব্ধক আসলে যুগল তারা)। এই সাদা বামনটি আকারে ছোট (তার ব্যাস সূর্যের ব্যাসের ৩ শতাংশ মাত্র), কিন্তু তার ঘনত্ব সূর্যের ঘনত্বের চেয়ে ২৫,০০০ গুণ বেশি। এই সাদা বামনে আইনস্টাইন অপসরণ হওয়া উচিত সূর্যের চেয়ে ত্রিশগুণ বেশি। ১৯২৫ সালের একটি পরীক্ষাকার্য সাদা বামনের আইনস্টাইন অপসরণ মাপা সম্ভব হল এবং দেখা গেল সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে।

তবে তারার বেলায় এই কথাটি বলা যেতে পারে যে তারার লাল অপসরণ নানাবিধ কারণে হতে পারে, অতএব আইনস্টাইন অপসরণই হচ্ছে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এদিক থেকে ১৯৬০ সালে অপর যে পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয়েছে তা যেমন সুন্দর, তার ফলও তেমনি চমৎকার।

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৪ ফুট (২২·২ মিটার) উঁচু একটি স্তম্ভ আছে। তার মানে, আমরা বলতে পারি, স্তম্ভের নিচের দিক স্তম্ভের ওপরের দিকের চেয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রের আরও ৭৪ফুট নিকটতর। তার মানে, স্তম্ভের নিচের দিকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র স্তম্ভের ওপরের দিকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের চেয়ে সামান্য বেশি জোরালো। কিছুকাল আগেও মানুষের হাতে এমন কোনো যন্ত্র ছিল না যা দিয়ে এই দুই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সামান্য হেরফের (১০ কোটি-কোটির একভাগ) ধরা যেতে পারত। কিন্তু হালে কোয়ান্টাম আলোকবিদ্যার কল্যাণে তাও

---

* একধরনের ছোট ও অতিমাত্রায় ঘন তারা। এই তারায় হাইড্রোজেনের প্রায় সবটাই খরচ হয়ে গিয়েছে এবং সংকুচিত হতে হতে খুবই ছোট হয়ে গিয়েছে। বলা যেতে পারে, তারায় অবশেষ। আকার ছোট ও উপরিতলের তাপমাত্রা উচ্চ হওয়ার দরুন সাদা দেখায়।

মানুষের হাতে এসেছে। তারপরে যে পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয়েছে তাতে আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণী অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের অভ্রান্ততা যাচাই করার জন্য আইনস্টাইন তিনটি ব্যাপারের উল্লেখ করেছিলেন—(১) সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে তারার আলোর বক্রতা, (২) লাল অপসরণ এবং (৩) বুধের অনুসূরের অগ্রগমন। তিনটি ব্যাপারেই বাস্তব পরীক্ষাকার্য হয়ে গিয়েছে এবং প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নির্ভুল।

আপেক্ষিকতা ও বিশ্বতত্ত্ব

আমরা এতক্ষণ পৃথক পৃথক মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছি। যেমন, আমরা দেখেছি সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে তারার আলো বেঁকে যায়। কিন্তু এই মহাবিশ্বে বস্তু রয়েছে অজস্র—গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু, নীহারিকা, কোটি-কোটি কোটি-কোটি তারা। তাদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের জ্যামিতিতে তারা বাঁধা পড়েছে। তৈরি হয়েছে নানা রকমের জোট—তারামণ্ডল, গ্যাসের মেঘ, তারা-জগৎ। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, যে স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতায় এই জোটগুলোর অবস্থান তার সামগ্রিক জ্যামিতিটি কী? অর্থাৎ, সহজ ভাষায়, মহাবিশ্বের আকার ও চেহারা কি-রকম? একালে এই প্রশ্নের সমস্ত জবাবই পাওয়া গিয়েছে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে।

আইনস্টাইনের আগে বিশ্ব সম্পর্কে সাধারণত ধারণা করা হত যে বিশ্ব হচ্ছে অসীম মহাশূন্যের কেন্দ্রে একটি বস্তুপুঞ্জ। নিউটন গোড়ায়

ধারণা করেছিলেন, বিশ্ব হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্পেসে সমভাবে ছড়ানো-ছিটানো নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তু। তিনি নিজেই এই ধারণা বাতিল করে দিলেন। কেননা, এই যদি বিশ্ব হত, তাহলে প্রত্যেকটি কণিকার পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণ থাকার ফলে সমস্ত বস্তু একসঙ্গে দানা বেঁধে যেত। অর্থাৎ, বিশ্বের চেহারাটা দাঁড়াত এই রকম যে নির্দিষ্ট স্পেসের কেন্দ্রে থাকত বিশ্বের সকল বস্তুর একটি একীভূত গোলক।

নিউটন তখন বিশ্বের এক নতুন চেহারা উপস্থিত করলেন। বিশ্ব অসীম আর বিশাল মহাশূন্যে অনেক দূরে দূরে ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য বস্তুপুঞ্জ – তারা, তারাজগৎ।

কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ভিত্তিতে আইনস্টাইন দেখালেন, নিউটনের এই বিশ্ব আদৌ নম্ভব নয়। অঙ্কের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করলেন, নিউটনের এই বিশ্বে বস্তুর গড় ঘনত্ব হওয়া উচিত শূন্য।

আইনস্টাইন বললেন, মুশকিল এই যে নিউটনের সূত্রগুলো উপস্থিত করা হয়েছিল এই কথাটি ধরে নিয়ে যে আলো সরলরেখায় চলে। আমরা ধরেই নিই, আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে পৃথিবীর যে জ্যামিতি প্রকাশ পায়, বিশ্বের জ্যামিতিও বুঝি তাই। যেমন, আমাদের ধারণা, দুটি সমান্তরাল আলোকরশ্মি অনন্তকাল ধরে মহাশূন্যে ধাবিত হতে পারে, কিন্তু তারা কখনো ছেদ করে না। কথাটা ঠিক নয়। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে আলো বেঁকে যায়, অতএব দুই সমান্তরাল রশ্মি অবশ্যই মিলিত হতে পারে। আমাদের ধারণা, দুই বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্বের পথ হচ্ছে সরলরেখা। আলো সরলরেখায় চলে। কথাটা ঠিক নয়। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে দুই বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্বের পথ হচ্ছে জিওডেসিক, আলো এই বক্র পথে চলে। তেমনি আমরা দেখেছি, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে ত্রিভুজের তিন-কোণের সমষ্টি দুই-সমকোণ নয়, বৃত্তের পরিধি তার ব্যাসের পাই-গুণ নয়। অর্থাৎ, ইউক্লিডীয় জ্যামিতি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে অচল।

আইনস্টাইন বললেন, ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সীমাবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে দেখি বলেই আমাদের বিচার অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে।

আইনস্টাইন বিচার করলেন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ভিত্তিতে। গোড়ায় তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল এই যে আমাদের বিশ্ব হচ্ছে নির্দিষ্ট ও অসীম (finite and unbounded)।*

আইনস্টাইনের এই বিশ্বকে তুলনা করা চলে একটি গোলকের দুইমাত্রার উপরিতলের সঙ্গে, যা নির্দিষ্ট ও অসীম। আমরা যদি একটি গোলকের উপরিতল দিয়ে (পৃথিবী একটি গোলক, ধরা যাক পৃথিবীর উপরিতল দিয়ে) সরলরেখা ধরে হাঁটতে থাকি তাহলে আমরা শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছব যেখান থেকে রওনা হয়েছি সেখানে। তখনো আমাদের ধারণা, আমরা সরলরেখা ধরেই হেঁটেছি, অথচ আমরা জানি পৃথিবীর উপরিতল গোল। বক্রতা এতই সামান্য যে চোখের দেখায় আমরা তা ধরতে পারি না।

অন্যদিকে স্পেসের এলাকায় আলোর রশ্মি যে-পথ ধরে চলে সেটাই আমাদের কাছে সরলরেখা। এখন ব্যাপারটা এই যে আলোর রশ্মির পথ থেকে মহাকর্ষীয় ভর যদি অনেক দূরে থাকে তাহলে অবশ্য আলোর রশ্মির ওপরে মহাকর্ষীয় ভরের কোনো ক্রিয়া

---

* বিশ্ব হতে পারে (১) নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ এবং (২) নির্দিষ্ট ও অসীম। মনে করা যাক একটি সরলরেখার ওপর দিয়ে একটি পিঁপড়ে হাঁটছে। পিঁপড়ের কাছে এটি একমাত্রার নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ বিশ্ব। নির্দিষ্ট এই কারণে যে সরলরেখাটি নির্দিষ্ট। একমাত্রার এই কারণে যে তার হাঁটা একই দিকে, ডাইনে-বাঁয়ে বা ওপরে-নিচে সম্ভব নয়। সীমাবদ্ধ এই কারণে যে পিঁপড়ে শুধু হেঁটেই চলবে, তা সম্ভব নয়। একসময়ে তাকে থামতেই হয়, তারপরে বড়ো জোর সে পিছিয়ে আসতে পারে। এবারে মনে করা যাক, পিঁপড়ে একটি বৃত্তের পরিধির ওপর দিয়ে হাঁটছে। তার কাছে পরিধির এই বিশ্ব একমাত্রার এবং নির্দিষ্ট ও অসীম। অসীম এই কারণে যে পিঁপড়ে হেঁটেই চলতে পারে, কখনো তাকে থামতে হয় না। এবারে কল্পনা করা চলে, একটি বর্গক্ষেত্রের বিশ্ব পিঁপড়ের কাছে দুই মাত্রার এবং নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ, একটি গোলকের উপরিতলের বিশ্ব দুই মাত্রার এবং নির্দিষ্ট ও অসীম। এমনিভাবে একটি ফাঁপা গোলকের অভ্যন্তরের বিশ্ব হতে পারে তিনমাত্রার এবং নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। তিনমাত্রার এবং নির্দিষ্ট ও অসীম বিশ্বও কল্পনা করা চলে।

নেই। কিন্তু যদি কাছাকাছি থাকে তাহলে, আমরা জানি, আলোর রশ্মি মহাকর্ষীয় ভরের দিকে বেঁকে যায়। এ থেকেই স্পেসের বক্রতা* কথাটা এসেছে।

মহাকর্ষীয় ভর আলোর রশ্মিকে বেঁকিয়ে দেয়, আর এই কারণেই আমাদের বিশ্ব অসীম। স্পেসের যে এলাকায় কাছাকাছি কোনো মহাকর্ষীয় ভর নেই সেখানে আলোর রশ্মি সরলরেখায় চলে। কিন্তু তারার কাছে এসে সেই রশ্মি বাঁক নেয়। পর-পর এমনি কয়েকটি বাঁক নেবার পরে সম্পূর্ণ ঘুরে যেতেও পারে এবং যেখান থেকে রওনা হয়েছে সেখানেই ফিরে আসে (পৃথিবীর উপরিতল দিয়ে সরলরেখায় হাঁটতে হাঁটতে যেমন আবার রওনা হবার জায়গাতেই ফিরে আসতে হয়)। স্পেসের একজন যাত্রী যদি পৃথিবী থেকে রওনা হয় তাহলে সে নিজে যদিও মনে করে সে সরলরেখাতেই চলছে, আসলে কিন্তু সে বিশাল একটি বৃত্ত ঘুরে সেই পৃথিবীতেই ফিরে আসে। স্পেসে আলোর রশ্মির যে-পথ তারও সেই পথ। এই পথ হতে পারে সিধে বা বাঁকা বা দুই-ই। সরলরেখা বলতে আমরা যা বুঝি তা কোনো-মতেই নয়। ভূ-গোলকে দ্রাঘিমা রেখার চেহারা যেমন, যাকে বলা হয় জিওডেসিক, স্পেসে আলোর রশ্মির পথও তেমনি। স্পেসের জ্যামিতিতে এই জিওডেসিকই সরলরেখার স্থান নিচ্ছে।

আইনস্টাইনের এই বিশ্ব নির্দিষ্ট, কেননা জিওডেসিকে ধরে রওনা হয়ে যাত্রীকে আবার রওনা হবার জায়গাতেই ফিরে আসতে হয়। সে অতিক্রম করে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্পেস, যা পরিমাপসাধ্য।

কেমন চেহারা এই বিশ্বের? ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী স্যার জেমস জীনস আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে উদ্‌ঘাটিত এই বিশ্বকে তুলনা করেছেন সাবানের ফেনার বুদ্‌বুদের সঙ্গে। বুদ্‌বুদের উপরিতল মসৃণ নয়, ভাঁজবিশিষ্ট। এই বুদ্‌বুদের উপরিতল হচ্ছে বিশ্ব। তবে দুইমাত্রার নয়, চারমাত্রার—স্পেসের তিন মাত্রা ও সময়ের এক মাত্রা।

---

* স্পেস বেঁকে যাচ্ছে, দুমড়ে যাচ্ছে, বক্র হচ্ছে, এসব কথা সারা বই জুড়ে আমরা অনেক বার বলেছি। তাই বলে, 'বেঁকে যাওয়া' বলতে আমরা যে অর্থ করি সেই অর্থে কথাটা ধর্তব্য নয়। অর্থ এই যে স্পেসের মধ্যে আছে বস্তু বা মহাকর্ষীয় ভর, যার কাছাকাছি হলে আলো বেঁকে যায়।

বুদবুদ তৈরি হয় সাবানের ফেনার পর্দা দিয়ে আর আইনস্টাইনের বিশ্ব তৈরি হয়েছে স্পেস ও সময়ের যৌগ দিয়ে।

স্যার জেমস জীন্‌সের তুলনা সত্ত্বেও আইনস্টাইনের এই নির্দিষ্ট ও বর্তুল বিশ্বকে ধারণায় আনা অসম্ভব। কিন্তু গণিতের সাহায্যে তার লক্ষণ ধরা যেতে পারে। এমনিভাবেই বিশ্বের আকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমে জানা দরকার স্পেসের বক্রতার মাপ। আইনস্টাইন দেখালেন, স্পেসের বস্তুর পরিমাণের ওপরে নির্ভর করে স্পেসের বক্রতা। মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাব্‌ল-এর গবেষণা থেকে জানা গেল সমগ্রভাবে এই বিশ্বে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে বস্তুর পরিমাণ $১০^{-৩০}$ গ্রাম (অর্থাৎ, ১-এর পরে ত্রিশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়, এক গ্রামের ততো ভাগের এক-ভাগ)। এ থেকে হিসেব করে বার করা হল, আইনস্টাইনের বিশ্বের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৩৫ শত-কোটি আলো-বছর। নির্দিষ্ট বটে কিন্তু এমনই বিরাট তার প্রসার যে তার মধ্যে স্থান হতে পারে কোটি কোটি তারা সমন্বিত শত-শত কোটি তারাজগতের ও অন্য আরও অনেক কিছুর। এই বিশ্বকে পুরো একটি বেড় দিয়ে চক্কর দিতে সেকেণ্ডে তিনলক্ষ কিলোমিটার বেগের আলোর রশ্মির সময় লাগার কথা ২০০ শত-কোটি বছর।

ক্রমপ্রসারমান বিশ্ব

আইনস্টাইন এই যে বিশ্বের ছাঁচ বা মডেল উপস্থিত করলেন সেটি কিন্তু টিকল না—যদিও তার গাণিতিক বনিয়াদ যথেষ্ট দৃঢ় ছিল। ১৯২৯ সালে এমন কিছু নতুন ঘটনা ঘটল যার ফলে সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেল আইনস্টাইনের বিশ্ব। এই ১৯২৯ সালেই জ্যোতির্বিজ্ঞানী

হাব্‌ল* ঘোষণা করলেন, পরীক্ষাকার্য থেকে মনে হয় বাইরের দিকের সমস্ত গ্যালাক্সি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তার মানে, আমাদের এই বিশ্ব প্রসারিত হয়ে চলেছে। বিশ্বের যে মডেল আইনস্টাইন উপস্থিত করেছিলেন তাতে ক্রমপ্রসারমানতার কোনো কথা ছিল না—এই অর্থে সেই বিশ্ব ছিল স্থির বা অবিচল।

আমরা যে তারাজগতে (গ্যালাক্সি) বাস করি তার নাম মিল্‌কি ওয়ে বা ছায়াপথ। এই শতকের গোড়ার দিকেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হাতে এমন কোনো সাক্ষ্য ছিল না যা থেকে মনে হতে পারত আকাশে দৃশ্যমান কোনো কিছু ছায়াপথের বাইরে থাকতে পারে। আবছা আলোর ছোপের মতো নীহারিকা তাঁরা দেখতেন, কিন্তু ভাবতে পারতেন না তাঁরা আসলে দেখছেন হাজার-হাজার কোটি তারা সমন্বিত পৃথক এক তারাজগৎ। এমনকি এই ছায়াপথের তারা থেকে তারার মধ্যবর্তী স্পেসে যে গ্যাসের মেঘ তাঁরা দেখতেন তাকে মনে করতেন নীহারিকা। তখনো পর্যন্ত

* এডউইন পোয়েল হাব্‌ল (১৮৮৯-১৯৫৩): নীহারিকা জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার জন্য স্মরণীয়। কর্মজীবন শুরু করেছিলেন আইনজীবী হিসেবে (অক্সফোর্ড কুইন্‌স কলেজ থেকে আইনবিদ্যায় স্নাতক), অবসর সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করতেন। ইয়ের্কেস মানমন্দির থেকে গবেষণার ডাক পেয়ে আইনচর্চা ছেড়ে দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যোগ দেন মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে এবং নীহারিকা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করতে থাকেন। ১৯২৩-২৪ সালে আন্‌ড্রোমিডা ও আরো দু-একটি নীহারিকা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হন এবং সেগুলোর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে তারার সন্ধান পান। নীহারিকাগুলোর দূরত্ব নিরূপণ করেন এবং সুনিশ্চিতভাবে এই মত প্রতিষ্ঠিত করেন যে কুণ্ডলী নীহারিকাগুলোর অস্তিত্ব আমাদের নিজস্ব তারাজগতের বাইরে। তারপরের কয়েক বছরে অধিকাংশ দৃশ্যমান নীহারিকার দূরত্ব অবগত হন এবং ১৯২৯ সালে ঘোষণা করেন যে আমাদের গ্যালাক্সির বাইরের অধিকাংশ নীহারিকা আমাদের গ্যালাক্সি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—যতো বেশি দূরে ততো বেশি বেগে (হাব্‌ল-এর সূত্র)। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর দুটি বিখ্যাত বইয়ের নাম: **The Observational Approach to Cosmology (1937)** এবং **The Realm of the Nebulae (1936)**।

জোরালো দূরবীন তাঁদের হাতে আসেনি। নীহারিকাগুলো যে ছায়াপথের বাইরে রয়েছে তা প্রথম জানালেন হারভার্ডের দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী (হেনরিয়েটা লিয়াভিট ও এইচ শাপ্‌লি)। তারপর ১৯১২ সালে, লোয়েল মানমন্দিরের ভি এম স্লাইফার* লক্ষ করলেন দূরের এই গ্যালাকসিগুলোর আলোয় লাল অপসরণ ঘটছে। তারপরে ১৯২৯ সালে হাব্‌ল দেখালেন যে এই লাল অপসরণ একটি অতি সরল নিয়ম মেনে চলে। গ্যালাক্‌সি যতো দূরের তার লাল অপসরণ ততো বেশি। অর্থাৎ, লাল অপসরণ ও দূরত্বের মধ্যে সরাসরি একটা সম্পর্ক এসে যাচ্ছে। আমরা জানি দূরে সরে যাওয়া বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোতে ডপ্‌লার লাল অপসরণ** ঘটে।

* ভেস্টো মেলভিন স্লাইফার (আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জন্ম ১৮৭৫)। গবেষণা করেছেন যেমন সৌরমণ্ডল নিয়ে, তেমনি বিশ্বের গড়ন নিয়ে। বৃহস্পতি ও শনির যে বর্ণালি-চিত্র তুলেছিলেন তা থেকে জানা গিয়েছিল এই দুটি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রচুর অ্যামোনিয়া ও মিথেন আছে। নীহারিকা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনিই প্রথম অ্যান্‌ড্রোমিডা নীহারিকার ক্ষেত্রে ডপ্‌লার ক্রিয়া প্রয়োগ করেন (তখনো পর্যন্ত জানা ছিল না যে এই নীহারিকাটি আমাদের তারাজগতের বাইরে)। তারপরে অন্যান্য নীহারিকার ক্ষেত্রে। দেখতে পান, অধিকাংশ নীহারিকা পৃথিবী থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। তখন থেকেই 'লাল অপসরণ' কথাটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে খুবই চালু হয়ে যায়। এই 'লাল অপসরণ' ব্যবহার করেই হাব্‌ল ক্রমপ্রসারমান বিশ্বের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

** ডপ্‌লার লাল অপসরণ : শব্দ বা বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণের উৎস যদি গতিশীল থাকে তাহলে পর্যবেক্ষকের মনে হয় সেই শব্দ বা বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণের কম্পন পরিবর্তিত হচ্ছে। এরই নাম ডপ্‌লার ক্রিয়া। বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের দিকে এগিয়ে আসে তাহলে পর্যবেক্ষকের কাছে সেই বস্তু থেকে নিঃসৃত শব্দের কম্পন বেড়ে যায়। বস্তু যদি পর্যবেক্ষক থেকে দূরে সরে তাহলে পর্যবেক্ষকের কাছে সেই বস্তু থেকে নিঃসৃত শব্দের কম্পন কমে। আলোর বেলায়, দূরে সরে যেতে থাকা বস্তু থেকে নিঃসৃত আলো পর্যবেক্ষকের কাছে আরো লাল দেখায়। (অন্যান্য রঙের চেয়ে লাল আলোর কম্পন আরো কম)। দূরের গ্যালাক্‌সির আলোয় লাল অপসরণ ঘটার অর্থ, সেই গ্যালাক্‌সি আরো দূরে সরে যাচ্ছে।

অতএব এমন অনুমান স্বাভাবিক যে দূরের গ্যালাক্সিগুলো আমাদের কাছ থেকে আরো দূরে সরে যাচ্ছে, যতো বেশি দূরে ততো বেশি দ্রুত।

ব্যাপারটা অসাধারণ। এর ফলে বিশ্বতত্ত্বে প্রচুর জটিলতা এসে যাচ্ছে। বাইরের গ্যালাক্সিগুলো আরও দূরে সরে যাচ্ছে—বর্ণালি বিশ্লেষণের এই সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে, যে বেগে এই গ্যালাক্সিগুলো আরও দূরে সরছে তা অবিশ্বাস্য। কুড়িলক্ষ আলো-বছর দূরের গ্যালাক্সি যেখানে ধাবিত হয় সেকেণ্ডে মাত্র ১৬০ কিলোমিটার বেগে, সেখানে ২৫ কোটি আলো-বছর দূরের গ্যালাক্সির বেগ সেকেণ্ডে ৪০,০০০ কিলোমিটার (আলোর বেগ সেকেণ্ডে তিনলক্ষ কিলোমিটার)। সমস্ত গ্যালাক্সিই আমাদের থেকে এবং পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাহলে, দূরে যখন সরছে, একটা সময় ছিল যখন এই সমস্ত গ্যালাক্সি প্রচণ্ড একটা গোলার মতো একজোট হয়ে ছিল। আমরা জানি, স্পেসের জ্যামিতি রূপায়িত হয় তার বস্তু দিয়ে। তাহলে, কল্পনা করা চলে, সেই দূর অতীতে বিশ্ব ছিল প্রচণ্ড ভাঁজ পড়া ও ঠাসা একটা আধারের মতো। গ্যালাক্সিগুলোর দূরে সরে যাওয়ার বেগ থেকে হিসেব করে ধারণা করা হয়েছে আদি সেই গোলা থেকে গ্যালাক্সিগুলোর যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রায় ১৩ শত-কোটি বছর আগে।

ক্রমপ্রসারমান বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য কয়েকটি তত্ত্ব উপস্থিত করা হয়েছে। বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ধর্মযাজক লিমেত্র্*

* জর্জেস এডুয়ার্দ লিমেত্র্ (বেলজিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জন্ম ১৮৯৪)। জ্যোতিঃ-পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স অব টেক্‌নোলজিতে। হাব্‌ল যে-সময়ে ক্রমপ্রসারমান বিশ্বের ধারণা উপস্থিত করেন সে-সময়ে তিনিও তাঁর বিশ্বতত্ত্ব রূপায়িত করে তোলেন। গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে, এটা ধরে নিয়ে যদি সময়ের দিক থেকে পিছিয়ে যাওয়া যায় তাহলে গ্যালাক্সিগুলো আরো কাছাকাছি চলে আসে। যতো বেশি পিছনে ততো বেশি কাছাকাছি। এমনি পিছিয়ে যেতে যেতে একটা সময় নিশ্চয়ই পাওয়া যায় যখন গ্যালাক্সিগুলো সবই একটি দলায় পিণ্ড পাকানো। সেই অতি-পরমাণুর মধ্যেই ছিল বিশ্বের তাবৎ বস্তু। তারই মধ্যে ঘটেছিল প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ (বিগ ব্যাঙ্গ)।

প্রস্তাব করেছেন, বিশ্বের উদ্ভব বিশাল এক আদি পরমাণু থেকে। একসময়ে এই পরমাণুর মধ্যে একটি বিস্ফোরণ ঘটে, চারদিকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে থাকে অজস্র টুকরো। এই ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া বা ক্রমপ্রসারমানতাকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জর্জ গ্যামো* একই ধরনের তত্ত্ব উপস্থিত করে তার নাম দিয়েছেন 'বিগ ব্যাঙ্গ' (big bang)। বাংলায় বলা যেতে পারে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

তারপরে এই তত্ত্বটিকে দাঁড় করাবার জন্য বহু বিজ্ঞানী কাজ করেছেন। মোটামুটি একটি ছবিও পাওয়া যাচ্ছে। সেই আদি পরমাণুতে বস্তু কী অবস্থায় ছিল, বিস্ফোরণ ঘটার পরে কী কী অবস্থা পার হয়ে কি-ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে তার একটা ছক তাঁরা হিসেব করে দেগে দিতে পেরেছেন। আদি সেই পরমাণুর তাপমাত্রা ছিল অতি প্রচণ্ড। তার ধারেকাছে যেতে পারে এমন তাপমাত্রা আজকের দিনে এমনকি কোনো তারার ভিতরেও পাওয়া সম্ভব নয় (আমাদের সূর্য একটি মাঝারি তারা, তার তাপমাত্রা উপরিতলে সাড়ে-পাঁচহাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট, ভিতরে চারকোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)। আর আদি সেই পরমাণুর ভিতরে বিস্ফোরণ** ঘটার এক-শতাংশ সেকেণ্ড পরে তাপমাত্রা ছিল দশহাজার-কোটি

* জর্জ গ্যামো (১৯০৪-১৯৬৯)। আমেরিকান বিজ্ঞানী। জন্ম রুশদেশের ওদেসায়। শিক্ষালাভ লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও ডক্টরেট) ও গোয়েটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ কোপেনহেগেনে নীল্‌স বোরের সঙ্গে ও কেমব্রিজে রাদারফোর্ডের সঙ্গে। নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও জীববিদ্যায় তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্বগত অবদান রেখেছেন। সাধারণবোধ্য বিজ্ঞানের বইয়ের লেখক হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয় এবং ১৯৫৬ সালে য়ুনেস্কো-র কলিঙ্গ পুরস্কার প্রাপক।

"** পৃথিবীতে আমরা যে বিস্ফোরণ দেখি, যা শুরু হয় নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে এবং তারপরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমন বিস্ফোরণ এ নয়। এই বিস্ফোরণ ঘটছে একই সঙ্গে সব জায়গায়, সমস্ত স্পেস জুড়ে, প্রত্যেকটি কণিকাকে অন্য প্রত্যেকটি কণিকা থেকে দূরের দিকে ছুটিয়ে।

ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই তাপমাত্রায় সাধারণ বস্তুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না—সাধারণ বস্তুর নয়, অণুর নয়, পরমাণুর নয়, এমনকি পরমাণুর নিউক্লিয়াসেরও নয়। থাকতে পারত প্রাথমিক কণিকাগুলো—ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো ও ফোটোন। কণিকাগুলো অনবরত সৃষ্টি হচ্ছিল (শক্তি থেকে) ও অনবরত ধ্বংস হচ্ছিল। এই সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে একটা মাত্রা বজায় ছিল। ফলে প্রাথমিক কণিকাগুলোর সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। এ-থেকেই হিসেব করে বার করা হয়েছে, দশহাজার-কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সেই আদি পরমাণুর ঘনত্ব ছিল জলের চেয়ে চারশো-কোটি গুণ বেশি। তার মধ্যে থেকে গিয়েছিল কিছু সংখ্যক আরো ভারী কণিকা—প্রোটোন ও নিউট্রন। আমরা জানি, আজকের দিনের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে এই দুটিই উপাদান। অনুপাতটি হচ্ছে প্রতি শতকোটি ইলেকট্রন বা পজিট্রন বা নিউট্রিনো বা ফোটোন পিছু একটি প্রোটোন ও একটি নিউট্রন। এই অনুপাতটি বজায় থাকা চাই।

বিস্ফোরণ চলার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমতে থাকে। এক-দশমাংশ সেকেণ্ড পরে তাপমাত্রা হয় তিনহাজার-কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, এক সেকেণ্ড পরে হাজার-কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, চোদ্দ সেকেণ্ড পরে তিনশো-কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। শেষপর্যন্ত তিন মিনিট পরে তাপমাত্রা দাঁড়ায় শত-কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই তাপমাত্রায় একটি প্রোটোন ও একটি নিউট্রন যুক্ত হয়ে গঠিত হয় ভারী হাইড্রোজেন বা ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়াস, দুটি প্রোটোন ও দুটি নিউট্রন যুক্ত হয়ে হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস।

বিস্ফোরণ চলতে থাকে। তাপমাত্রা ও ঘনত্ব আরো কমে। কয়েক লক্ষ বছর পরে তাপমাত্রা আরো কমে। তখন ইলেকট্রন যুক্ত হয় নিউক্লিয়াসের সঙ্গে এবং গঠিত হয় হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরমাণু। এই গ্যাস মহাকর্ষের ক্রিয়ায় সংকুচিত হতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত দলা পাকায়। তা থেকেই কালক্রমে এখনকার বিশ্বের গ্যালাক্সি ও তারা।

ক্রমপ্রসারমান বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য এই হচ্ছে একটি তত্ত্ব—বিগ ব্যাঙ্গ বা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তবে এই একটিই নয়, আরো তত্ত্ব আছে। একটি তত্ত্বে বলা হয়েছে, এই বিশ্ব স্পন্দনশীল—পালাক্রমে তার প্রসারণ ও সংকোচন ঘটে। এখন চলছে প্রসারণ, পরে শুরু হবে গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে মহাকর্ষের ফলে সংকোচন। বস্তুর পরিমাণ যথেষ্ট হলে—অর্থাৎ, বস্তুর ঘনত্ব একটা নির্দিষ্ট মাত্রার ওপরে হলে—মহাকর্ষের দরুণ বস্তুর সংকোচন ঘটতেই পারে। গোটা বিশ্বের সংকোচন ঘটাবার জন্য বস্তুর যদি ঘাটতি থাকে তাহলে ধরে নেওয়া চলে, বিশ্বের কোথাও না কোথাও বস্তু তৈরি হয়ে চলেছে। আইনস্টাইনের শক্তি ও ভরের সমতুলতার তত্ত্ব থেকে আমরা জানি, তাও হতে পারে। অতএব যুক্তির দিক থেকে তত্ত্বটি অগ্রাহ্য করার নয়।

আর একটি তত্ত্বে বলা হয়েছে, এই বিশ্ব যেমন এখন, তেমনি বরাবর। বিশ্বে নিয়তই নতুন বস্তু তৈরি হচ্ছে, নতুন গ্যালক্সি, দূরের গ্যালাক্সি আরো দূরে বিলীয়মান। সব মিলিয়ে একটি অবিচল অবস্থা (steady state)।

নিয়ত বস্তু তৈরি হওয়ার তত্ত্ব অনেককাল পর্যন্ত টিকে ছিল। তারপরে দুটি আবিষ্কার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের তত্ত্বের পক্ষে চলে যায়। প্রথম আবিষ্কার ঘটে আমেরিকায় বেল ল্যাবরেটরিতে রেডিও অ্যান্‌টেনা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে। সেখানকার দুই বিজ্ঞানী—আর্নো পেন্‌জিয়াস ও রবার্ট উইলসন—এমন এক রেডিও অ্যান্‌টেনা তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন যা গোলমাল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু দেখা গেল, যতোই তাঁরা চেষ্টা করুন, একটা চাপা শিসের মতো আওয়াজ থেকেই যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত এই বিজ্ঞানীরা ধরতে পারলেন, চাপা শিসের আওয়াজটা হচ্ছে আদি বিশ্বের বিকিরণ যা পরবর্তী কালে স্পেসে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে একমাত্র যদি আদিতে একটি বিস্ফোরণ ঘটে থাকে। ১৯৬৫ সালের এই আবিষ্কারের জন্য উল্লিখিত দুই বিজ্ঞানী ১৯৭৮ সালে একযোগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

'বিগ ব্যাঙ্গ' তত্ত্বের অপর জোরালো সমর্থন পাওয়া গিয়েছে

'কোয়াসার'-এ।* আদি সেই বিস্ফোরণের আদি সাক্ষ্য এই কোয়াসার।

আধুনিক বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে এই সামান্য আলোচনা থেকে এটুকু অন্তত বোঝা গেল যে বিষয়টি অতি বিরাট ও জটিল। আর বোঝা গেল, সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে কত-কি জানা যেতে পারে। আধুনিক বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন আইনস্টাইন নিজেই, তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে। আর আজ সেই আলোচনাই কত অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। আইনস্টাইন নিজেও এতখানি কল্পনা করতে পারেননি।

কালো বিবর

সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বা আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় সূত্র থেকে আরো একটি ব্যাপার সম্পর্কে ধারণা করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত শুধু ধারণাই—কোনো বাস্তব সাক্ষ্য ধরা যায়নি। ব্যাপারটি হচ্ছে, যাকে বলা হয়, ব্ল্যাক হোল বা কালো বিবর। নামটি অর্থপূর্ণ, খানিকটা আলোচনা করলে বোঝা যাবে কেন এই নাম দেওয়া হয়েছে।

* কোয়াসার কথাটা এসেছে 'কোয়াসি-স্টেলার রেডিও সোর্স' থেকে। কোয়াসার তারার মতো, শতকোটি সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল, চোখে দেখা যায়। কোয়াসার থেকে উৎসারিত হচ্ছে অতি শক্তিশালী রেডিওতরঙ্গ। কোয়াসারের লাল-অপসরণ এত বেশি যে ধরে নিতে হয়, আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে কোয়াসারগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। তাহলে কোয়াসারের দূরত্ব দাঁড়ায় ১২০০ কোটি আলো-বছর। তার মানে কোয়াসার রয়েছে বিশ্বের একেবারে কিনার ঘেঁষে, কোয়াসার ছাড়িয়ে আর কিছু নেই। আজ পর্যন্ত প্রায় ২০০টি কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে।

মনে করা যাক, গোলকের মতো আকার বিশিষ্ট একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র রয়েছে, যেমন থাকতে পারে সূর্যের। এমনি একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ব্যাপার-স্যাপার আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় সূত্র দিয়ে বিচার করলে যা দাঁড়ায় আর নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র দিয়ে বিচার করলে যা দাঁড়ায়—এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ প্রকটভাবে ধরা পড়ে সেই গোলকাকার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কেন্দ্রের কাছাকাছি এলে। বিষয়টিকে বোঝার জন্য আমরা তাকে দেখব নিষ্ক্রমণ-বেগের দিক থেকে। নিষ্ক্রমণ-বেগ হচ্ছে সেই বেগ যে-বেগে ছুট দেওয়াতে পারলে একটি কণিকা মহাকর্ষীয় টান ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যেতে পারে। যেমন, পৃথিবীর উপরিতলে নিষ্ক্রমণ-বেগের মাপ সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার। অর্থাৎ, পৃথিবীর উপরিতল থেকে উৎক্ষিপ্ত রকেটকে এই বেগে ছুট দেওয়াতে পারলে সেই রকেট মহাশূন্যে উধাও হয়। নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র থেকে আমরা জানি, দূরত্ব যতো কমে মহাকর্ষীয় বল ততো বাড়ে। দূরত্ব শূন্য হলে মহাকর্ষীয় বল হয়ে দাঁড়ায় অসীম। তাহলে আমাদের সেই কণিকাটির রওনা হবার স্থান যতোই কেন্দ্রের কাছাকাড়ি হয় ততোই নিষ্ক্রমণ-বেগ বাড়ে। আর কণিকাটির রওনা হওয়ার স্থান কেন্দ্র হলে নিষ্ক্রমণ-বেগ অসীম। কিন্তু আপেক্ষিকতার সূত্র থেকে আমরা জানি, কোনো কিছুর পক্ষেই আলোর চেয়ে বেশি বেগে ছুট দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে নিষ্ক্রমণ-বেগ যেখানে আলোর বেগের চেয়ে বেশি সেখান থেকে সেই কণিকাটির কিছুতেই মহাশূন্যে উধাও হওয়া সম্ভব নয়।

মনে করা যাক, গোলকটিকে আমরা পর্যবেক্ষণ করছি অনেকটা দূর থেকে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে। সব জায়গাতেই একটি করে কণিকা গোলক থেকে নির্গত হোক এবং নিষ্ক্রমণ-বেগে ছুট দিয়ে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাক। তাহলে যেখানে এসে নিষ্ক্রমণ-বেগ আলোর বেগের সমান সেখানে কি এই ব্যাপারটি ঘটতে পারে? পারে যদি কণিকাটি হয় আলোর, অর্থাৎ ফোটন। কেননা ফোটনের বেগ আলোর বেগ। কিন্তু আরও ভিতরের দিকে কী ঘটে? সেখানে নিষ্ক্রমণ-বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশি, ফলে এমনকি ফোটন পর্যন্ত নির্গত হতে পারে না। তাহলে, আমরা বলতে পারি, মহাকর্ষীয়

গোলকে একটা বিশেষ দূরত্ব পর্যন্ত সবকিছুই থাকে যবনিকার আড়ালে, এমনকি আলো পর্যন্ত তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এই দূরত্বকে বলা হয় শোয়াৎর্স্‌শিল্‌ট (Schwarz-schild) ব্যাসার্ধ।*

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এমনি যবনিকার আড়ালে থাকা কোনো বস্তুর অস্তিত্ব কি প্রকৃতই আছে? তার মানে, প্রশ্নটা দাঁড়ায়, বাস্তবের কোনো বস্তুর ব্যাসার্ধ কি শোয়াৎর্স্‌শিল্‌ট মাত্রার হতে পারে? হতে পারে যদি বস্তুটি হয় খুবই সংকুচিত এবং গোটা বস্তুটি ওই নির্দিষ্ট মাত্রার মাপের মধ্যে এঁটে থাকে। আমাদের সৌরমণ্ডলের কোনো বস্তু বা সাধারণ কোনো তারা এক্ষেত্রে ধর্তব্যই নয়, কেননা এদের ব্যাসার্ধ শোয়াৎর্স্‌শিল্‌ট ব্যাসার্ধের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। যেমন, সূর্যের কথাই ধরা যাক। সূর্যের ব্যাসার্ধ প্রায় সাতলক্ষ কিলোমিটার। আর এই সূর্যেরই শোয়াৎর্স্‌শিল্‌ট ব্যাসার্ধ হচ্ছে তিন-কিলোমিটারেরও কম। তার মানে, সূর্যের পুরো বস্তু যদি তিন-কিলোমিটারেরও কম ব্যাসার্ধের এলাকায় চেপে দেওয়া যেত তাহলে সূর্য হয়ে উঠত যবনিকার আড়ালে থাকা তারা।

সূর্যের বিপুল বস্তুকে এই যৎসামান্য এলাকায় চেপে ধরলে অবস্থাটা কী দাঁড়ায় অনুমান করা চলে। এই প্রচণ্ড চাপে সূর্যের ঘনত্ব গিয়ে দাঁড়ায় জলের ঘনত্বের চেয়ে শত-কোটি কোটি গুণ অধিক। এই প্রচণ্ড চাপে বস্তুর ভিতরকার ইলেকট্রন ও প্রোটোন একসঙ্গে মিশে গিয়ে নিউট্রন হয়ে ওঠে। এমনি নিউট্রন তারার অস্তিত্ব বাস্তবে প্রকৃতই আছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু ১৯৬৮ সালে 'পাল্‌সার' আবিষ্কৃত হবার পরে ধারণা করা হচ্ছে নিউট্রন তারার অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। পাল্‌সার সম্ভবত দ্রুত-আবর্তনশীল নিউট্রন তারা।

এতদিন পর্যন্ত সাদা বামন তারাকে মনে করা হত আকাশের

* শোয়াৎর্স্‌শিল্‌ট ব্যাসার্ধের মাপ হচ্ছে $\frac{2GM}{c^2}$ (G মহাকর্ষীয় নিত্য-সংখ্যা, M মহাকর্ষীয় বস্তুর ভর, c আলোর বেগ)।

সবচেয়ে ঘন বস্তু। সাদা বামনের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চেয়ে দশলক্ষ গুণ অধিক। নিউট্রন তারার ঘনত্বের তুলনায় এটা এমন কিছু নয়। শোয়াৎ´স্‌শিল্‌ট ব্যাসার্ধের বস্তুর অস্তিত্ব নিয়েও তখন কোনো কথা ওঠেনি। কিন্তু এখন উঠছে যখন জানা গিয়েছে নিউট্রন তারার অস্তিত্ব থাকতে পারে। তখন প্রশ্ন ওঠে, যদি থাকেও তাহলে নিউট্রন তারা হিসেবে থেকে যেতে পারে কি? নিউট্রন তারার ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চেয়ে শত-কোটি কোটি গুণ অধিক। এই প্রচণ্ড ঘনত্বের বস্তুর মহাকর্ষীয় বলও হয়ে ওঠে প্রচণ্ড। সেটা বিপর্যয়কর হয়ে ওঠে যদি মোট বস্তুর ভর একটা বিশেষ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। হিসেব থেকে জানা যায়, ঘনত্ব যদি হয় জলের ঘনত্বের চেয়ে শতকোটি কোটি গুণ অধিক, আর ভর যদি হয় সূর্যের ভরের ৭০ শতাংশ, তাহলেই বিপর্যয়টি ঘটে যেতে পারে। শুরু হয় নিজের মহাকর্ষীয় টানের মধ্যে পড়ে নিজেরই ভাঙন। এ এক অদ্বিতীয় অবস্থা।

আর এই অদ্বিতীয় অবস্থাটি যদি ঘটে শোয়াৎ´স্‌শিল্‌ট ব্যাসার্ধের মধ্যে থেকে তাহলে তার নাম কালো বিবর। আমরা আগেই বলেছি, শোয়াৎ´স্‌শিল্‌ট ব্যাসার্ধে পৌঁছবার পরে কোনো বস্তু থেকে কোনো রকম বিকিরণ নির্গত হয় না, কোনো বস্তু উৎক্ষিপ্ত হয় না। বাইরের দর্শকের কাছে এই বস্তু সম্পূর্ণ অদৃশ্য, এবং এই বস্তু থেকে কোনো রকম খবর পাবারও কোনো উপায় নেই। তার চেয়েও ভয়ংকর কথা, এই কালো বিবরের সংস্পর্শে যে আসে, কালো বিবর তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেয়। কালো বিবরকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু কাছের বস্তুর ওপরে কালো বিবরের মহাকর্ষীয় টান ধরা যেতে পারে, তা থেকে কালো বিবরের অস্তিত্ব। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, আমাদের গ্যালক্‌সির কেন্দ্রে বিশাল এক কালো বিবর আছে। অন্যত্রও থাকতে পারে। সৌরমণ্ডলের কাছাকাছি কালো বিবর নেই বলেই মনে হয়। তবে এসে যেতে পারে এবং কালো বিবরের গ্রাসেই সৌরমণ্ডল বিলুপ্ত হবে, এমন আশঙ্কার কথাও কেউ কেউ বলেছেন। যাই হোক, সাধারণ আপেক্ষিকতা মানলে কালো বিবর মানতেই হয়, কালো বিবর মানলে এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় তাও মানতে হয়।

অল্প কথায় বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে এইভাবে বলা চলে।

পরম গতি ধরা যায় না। আমরা ধরতে পারি শুধু আপেক্ষিক গতি। এখানে পর্যবেক্ষকরা রয়েছে পরস্পরের আপেক্ষিকে সমবেগে গতিশীল অবস্থায়। ঘটনাসমূহ তারা কি-রকম দেখছে তাই হচ্ছে বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের বলার বিষয়। এই দেখাটা তিন-মাত্রার স্পেসে নয়, চার মাত্রার স্পেস-সময় নিরবচ্ছিন্নতায়। তত্ত্বটিকে গড়ে তোলার জন্য দুটি স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেওয়া হয়েছে (১) প্রকৃতির নিয়ম সকল পর্যবেক্ষকের কাছে অভিন্ন, (২) আলোর বেগ সকল পর্যবেক্ষকের কাছে নিত্য (তাদের নিজস্ব বেগ যাই হোক না কেন)। এই তত্ত্ব থেকে তিনটি বিষয় জানা গিয়েছে : (ক) বেগের সঙ্গে ভরের সম্পর্ক, (খ) শক্তি ও ভর—একটির অপরটিতে রূপান্তর, (গ) গতির দিকে বস্তুর সংকোচন (ফিৎস্‌জেরাল্‌ড-লোরেন্‌ৎস সংকোচন)।

সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে পর্যবেক্ষকরা রয়েছে পরস্পরের আপেক্ষিকে সমবেগে গতিশীল অবস্থায় নয়—ত্বরণশীল গতিতে। এ থেকে পাওয়া গিয়েছে অভিনব এক মহাকর্ষের তত্ত্ব। বলা হয়েছে, বস্তুর অবস্থিতির ফলে স্পেস বক্র হয়, এমনভাবে যাতে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র গড়ে ওঠে (চুম্বক থাকার জন্য যে-ভাবে চৌম্বকীয় ক্ষেত্র গড়ে ওঠে—বস্তু চুম্বকের সঙ্গে তুলনীয়)। অর্থাৎ, মহাকর্ষ স্পেসেরই ধর্ম।

মহাকর্ষ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন সেই বিশেষজ্ঞরা ক্রমাগতই প্রমাণ পাচ্ছেন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি কত সঠিক ও যথাযথ। তাঁরা যে কালো বিবরের মতো আশ্চর্য ব্যাপারকে ধারণায় আনতে পেরেছেন তাও এই তত্ত্বের জন্যই। 'বিগ ব্যাঙ্গ' তত্ত্বের পথ তৈরি করেছিল এই তত্ত্ব। ১৯১৬ সালে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশিত হবার এক বছর পরে আইনস্টাইন নিজেই ধরতে পেরেছিলেন, সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব মানতে হলে এক গতিশীল বিশ্ব মানতে হয়। কিন্তু তিনি নিজে সেটা মানেননি। তিনি উপস্থিত করেছিলেন এক অবিচল বিশ্বের চিত্র। পরে ১৯২৯ সালে হাব্‌ল-এর পরীক্ষাকার্য থেকে জানা যায়, এই বিশ্ব ক্রমপ্রসারমান।

বিজ্ঞানীরা এখন প্রশ্ন তুলছেন, সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে এই যে ক্রমপ্রসারমান বিশ্বের ধারণা পাওয়া গিয়েছিল, পরীক্ষাকার্যে যা সমর্থিত হয়েছে, তা কি চিরকাল চলতে থাকবে? নাকি, এক-সময়ে সংকোচন শুরু হবে, সংকোচন চলতে চলতে আবার ফিরে আসবে সেই আদি উত্তপ্ত গোলকের অবস্থা?

বিশ্বতত্ত্বকে পুরোপুরি দাঁড় করাতে হলে এমনি অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া চাই। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব হাতে আসার ফলে সব প্রশ্নেরই জবাব দেবার মতো পারঙ্গমতা তাঁরা পেয়ে গিয়েছেন।

আইনস্টাইন একসময়ে বলেছিলেন, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আর কিছুই নয়, ক্ষেত্রতত্ত্বেরই ফল এবং তার আরও উন্নতি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপেক্ষিকতার তত্ত্বে তিনি পৌঁছলেন কি করে? জবাবে বলেছিলেন, বিশ্বের সার্বিক সমন্বয় সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় অতি দৃঢ় ছিল বলেই তিনি আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

ইনফেল্ড বলছেন, মহাকর্ষের সমস্যার যে সমাধান আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে উপস্থিত করেছেন তাকে তিনি মনে করেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কীর্তি। ইনফেল্ডকে আইনস্টাইন বলেছিলেন (ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, প্রিন্সটনে, ইন্‌ফলড যখন ছিলেন আইনস্টাইনের সহকারী), 'বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এতদিনে নিশ্চয়ই আবিষ্কার হয়ে যেত—আমিই করতাম, বা অন্য কেউ। সমস্যাটি পরিপক্ব ছিল। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সম্পর্কে একথা বলা চলে।' ইনফেল্ড বলছেন, কথাটির মধ্যে আইনস্টাইন এই বিষয়ের ওপরে জোর দিতে চেয়েছেন যে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে যে-সব সমস্যার সমাধান করা হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানীদের আগ্রহ তা থেকে অনেক দূরে ছিল।

আইনস্টাইনের জীবনীকার বানেশ হফ্‌মান ও অন্যরাও বিশেষ করে এই কথাটির ওপরে জোর দিয়েছেন। বিশেষ আপেক্ষিকতার

-তত্ত্বের জমি তৈরি ছিল—তার জন্য আটকাত না। আইনস্টাইন না হলে অন্য কেউ এই তত্ত্ব উপস্থিত করতে পারতেন। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব? বস্তুর অবস্থিতির জন্য স্পেস বক্র হয়—এই অভাবিতপূর্ব আবিষ্কার? তার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আইনস্টাইনের নিজস্ব।

অন্যদিকে, সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিষ্কার না করলেও তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন—১৯০৫ সালে জার্মান বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'আনালেন ডেয়ার ফিজিক'-এ প্রকাশিত তাঁর চারটি গবেষণামূলক নিবন্ধের জন্য। আইনস্টাইন শতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি স্মারকগ্রন্থে সি পি স্নো লিখছেন, 'এই চারটির মধ্যে তিনটি পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ।' আইনস্টাইন কিন্তু তারপরেও বিজ্ঞানীমহলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ১৯০৭ সালে উপস্থিত করেছিলেন তাঁর অমর সূত্র $E=mc^2$। অতঃপর যদি আর কিছু নাও করতেন তাহলেও এই সূত্রের গৌরবে চিরভাস্বর হয়ে থাকতেন। সমকালীন বিজ্ঞানী ভালটের নার্নস্ট বলেছিলেন, $E=mc^2$-এর মতো এমন এক বিরাট আবিষ্কার করার পরে অবসর নিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। বাকিটা জীবন এই আবিষ্কারের গৌরব নিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যেত। কথাটা শুনে আইনস্টাইন বলেছিলেন, যে যাই বলুক, কাউকে খুশি করে চলার কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই। চলেনও নি। ১৯০৮ সাল থেকেই, তখনো তিনি পেটেন্ট অফিসের সাধারণ একজন কর্মচারী, ভাবিত হলেন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে। সে ছিল অসাধারণ এক ভাবনা। মহাকর্ষ নিয়ে যে ভাবনার কিছু আছে এই কথাটাও তখন অন্য কোনো পদার্থবিজ্ঞানীর মাথায় ছিল না। আইনস্টাইন ছিলেন একলা চলার যাত্রী।

তাই বলে কথাটা এই নয় যে আইনস্টাইনের সঙ্গে অন্য কোনো বিজ্ঞানীর সম্পর্ক নেই, তাঁর কাজ একেবারেই তাঁর একার। আইনস্টাইন বলেছেন, যেমন অন্যত্র তেমনি বিজ্ঞানে 'কোনো মানুষই নিজের মধ্যে সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত দ্বীপ নয়।' তিনি বারে বারে লোরেন্‌ৎস-এর কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। আরও বলেছেন, 'যে চারজন

মানুষ পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, যার ওপরে আমি আমার তত্ত্ব গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছি, তাঁরা হলেন—গ্যালিলিও, নিউটন, ম্যাক্‌সওয়েল ও লোরেন্‌ৎস।' তাঁর ভাষায়, 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে····ব্যক্তিমানুষের কাজ তাঁর বৈজ্ঞানিক পূর্বগামীদের ও সমসাময়িকদের কাজের সঙ্গে এমনই গ্রথিত হয়ে থাকে যে সেই কাজকে মনে হয় তাঁর প্রজন্মের নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টি।'

বিষয়গত ব্যক্তি-বহির্ভূত জগতের স্বীকৃতি

১৯০৫ সালকে বলা চলে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে 'বিস্ময়ের বছর'। এই ১৯০৫ সালে 'আনালেন ডেয়ার ফিজিক' পত্রিকায় আইনস্টাইনের চারটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই চারটি নিবন্ধের প্রত্যেকটিই পৃথক পৃথক দিক থেকে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা বদলে দিয়েছে। প্রথম নিবন্ধ ছিল কোয়ান্‌টাম পদার্থবিদ্যার ভিত্তি (বিষয়টি নিয়ে একটু পরেই আমরা আলোচনা তুলব)। এই গবেষণার জন্য তিনি ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার পান। দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল ব্রাউনীয় বিচলন—তরল পদার্থের মধ্যে নিমজ্জমান আণুবীক্ষণিক কণিকার অবিরাম সঞ্চলন। শেষ দুটি নিবন্ধ বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিষয়ে। বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে তিনি যদি কোনো গবেষণা নাও করতেন এবং প্রথম দুটি নিবন্ধের যে-কোনো একটি লিখতেন তাহলেও তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত। এ-সম্পর্কে মাক্‌স বর্ন লিখছেন (১৯৪১ সালে):

> আমার মনে হয় সমগ্র বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে একটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খণ্ড হচ্ছে 'আনালেন ডেয়ার ফিজিক' পত্রিকার খণ্ড ১৭ (চতুর্থ পর্যায়) সাল ১৯০৫। এই খণ্ডে আছে আইনস্টাইনের তিনটি নিবন্ধ···আজকের

দিনে প্রত্যেকটি নিবন্ধের স্বীকৃতি শ্রেষ্ঠরচনা হিসেবে, পদার্থবিজ্ঞানের নতুন শাখার উৎস হিসেবে। পৃষ্ঠার অনুক্রমে এই তিনটি বিষয় হচ্ছে—ফোটনের তত্ত্ব, ব্রাউনীয় বিচলন ও আপেক্ষিকতা।

আপেক্ষিকতা সবার শেষে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে সে-সময়ে স্পেস ও সময় এবং যুগপত্তা ও বিদ্যুৎগতিবিদ্যা আইনস্টাইনের সম্পূর্ণ চিন্তা জুড়ে ছিল না। আমি মনে করি, আইনস্টাইন যদি আপেক্ষিকতা সম্পর্কে একলাইনও না লিখতেন তাহলেও তিনি হয়ে থাকতেন চিরকালের একজন শ্রেষ্ঠ তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী।

• প্রুশীয় বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য হবার পরে আকাদেমির অধিবেশনে ১৯১৪ সালে আইনস্টাইন যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার বিষয় ছিল 'তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র'। এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানীকে কী করতে হয় ও কতখানি হতে হয়।

তত্ত্ববিদের পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সাধারণ স্বীকার্যগুলোকে বা 'সূত্রগুলোকে' ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারার ব্যাপারটি, যা থেকে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তগুলো টানেন। এমনিভাবে তার কাজ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। তিনি প্রথমে অবশ্যই আবিষ্কার করবেন তাঁর সূত্র, তারপর টানবেন সেই সিদ্ধান্ত যা সেই সূত্র থেকে বেরিয়ে আসে।

একই ভাষণে আরো বলছেন, যথেষ্ট অধ্যবসায় ও মেধা থাকলে তবেই তত্ত্ববিদ সফল হতে পারেন। পদ্ধতিটি এমন তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায় না যে সেটি শিখে নেওয়া চলে ও নিয়মমাফিক প্রয়োগ করে যাওয়া চলে। ঘটমান তথ্যের জটিল সমাহারকে অবলোকন করে বিজ্ঞানী এই সাধারণ সূত্রগুলো প্রকৃতি থেকে আহরণ করেন।

এই বিচারে আইনস্টাইন একজন শ্রেষ্ঠ তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী।

আইনস্টাইন তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখায় বলেছেন, তাঁর জীবনের মৌল ও মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল বিষয়গত ব্যক্তি-বহির্ভূত জগতের স্বীকৃতি।

বাহির সন্নিকটে ছিল এই বিশাল জগৎ, যার অস্তিত্ব আমরা মানুষরা আছি কি নেই তার ওপরে নির্ভরশীল নয়, যা আমাদের সামনে রয়েছে বিরাট ও অনন্ত এক ধাঁধার মতো, যার অন্তত কিছুটা আমাদের পর্যবেক্ষণ ও চিন্তনের কাছে প্রকাশমান। এই জগতের অনুধ্যান ডাক দিল মুক্তির মতো এবং আমি শীঘ্রই লক্ষ করলাম যে যাঁদের আমি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করতে শিখেছি তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই জগতের প্রতি

অনুগত নিয়োজনে খুঁজে পেয়েছেন অভ্যন্তরিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা। লব্ধ সম্ভাবনার কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি-বহির্ভূত এই জগতের মানসিক উপলব্ধি আমার মনশ্চক্ষুর সামনে অর্ধ-সচেতন ও অচেতনভাবে ভাসতে লাগল সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসেবে। এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত বর্তমানের ও অতীতের মানুষরা, এবং তাঁরা যা অর্জন করেছেন সেই অন্তর্দৃষ্টি—তারা আপন, তাদের কিছুতেই হারানো চলে না। এই স্বর্গের পথ ধর্মীয় স্বর্গের পথের মতো আরামদায়ক ও মোহময় নয়, কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে তেমনই নির্ভরযোগ্য। এই পথ বেছে নিয়েছি বলে আমি কখনো অনুতাপ করিনি।

মানুষ আছে কি নেই, তার ওপরে কিছুমাত্র নির্ভর না করে এই যে বিশাল জগতের অস্তিত্ব—সেটি আইনস্টাইনের কাছে এসেছিল অনুসন্ধানের একটি বিষয় হিসেবে। আর তাই নিয়েই তিনি ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন অনুভূতি ও বিশ্বাসের দ্বারা আরোপিত সীমানা। ইন্দ্রিয়লব্ধ ধারণা থেকে গড়ে তোলা শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে এই জগৎ তখন অগ্রহণীয় হয়ে যায়। জগৎ সম্পর্কে সহজাত যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান লাভ করার সম্ভাবনা বর্জনীয় হয়ে পড়ে। এই অবস্থান থেকে বিশ্লেষণ করলে এমন সব পরিমাপের সন্ধান করতে হয় যা প্রকৃতির নিয়ম যাচাই করার জন্য প্রয়োগ করলে সকল নির্দেশতন্ত্রে একই রকম।

আইনস্টাইনের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে জাগতিক বাস্তবতার সকল নিয়মকে একটি একীভূত কাঠামোর মধ্যে ধরা সম্ভব। আত্মজীবনীতে তিনি লিখছেন,

> আমার মতো মানুষের বিকাশলাভে একটি যুগান্তকারী ঘটনা এই যে প্রধান আগ্রহ ধীরে ধীরে ও বহুল মাত্রায় যা-কিছু ক্ষণিক ও যা-কিছু নিছক ব্যক্তিগত তা থেকে বিমুক্ত হয় এবং সব জিনিসকে মনে মনে আয়ত্ত করার দিকে নিবদ্ধ হয়।

এই সঙ্গে আরো জানিয়েছেন,

> যে আদর্শ আমার পথকে উদ্ভাসিত করেছে, এবং বারে বারে আমাকে দিয়েছে আনন্দের সঙ্গে জীবনের মুখোমুখি হবার নতুন সাহস, তা হচ্ছে করুণা, সৌন্দর্য ও সত্য। সমমনোভাবাপন্ন মানুষদের সঙ্গে আত্মীয়তার বোধ যদি না থাকে, বাস্তব জগতের সঙ্গে এবং শিল্প ও বৈজ্ঞানিক প্রয়াসে

ক্ষেত্রে চির-অলভ্যের সঙ্গে নিয়োজন যদি না থাকে, তাহলে জীবন আমার কাছে শূন্য বোধ হয়।

সবকিছুকে মনে মনে আয়ত্ত করার এই আগ্রহ থেকেই আইনস্টাইন যে-কোনো একটি সমস্যা নিয়ে বছরের পর বছর চিন্তা করে যেতে পারতেন। প্রায় এক দশকের চিন্তার ফসল হচ্ছে বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। তারপরে প্রায় সাত বছরের চিন্তার ফসল সাধারণ আপেক্ষিকতা ও মহাকর্ষের তত্ত্ব। তারপরে তিরিশ বছরেরও বেশি সময় চিন্তা করে গিয়েছেন একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব (Unified Field Theory) নিয়ে, যে তত্ত্বে তিনি আশা করেছিলেন মহাকর্ষ ও বিদ্যুৎচুম্বকত্বকে একসঙ্গে মেলাবেন।*

* আমাদের এই বিশ্বে একটি মৌলিক ব্যাপার হচ্ছে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু অন্য প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে। ব্যাপারটিকে নিউটন একটি গাণিতিক সূত্রে প্রকাশ করেছেন : $F = G\frac{mm'}{r^2}$ (m ও m' দুই বস্তুর ভর, r দুই বস্তুর মধ্যেকার দূরত্ব, G মহাকর্ষীয় ধ্রুবক)। অন্যদিকে, আমরা জানি, পজিটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ নেগেটিভ বৈদ্যুতিক চার্জকে আকর্ষণ করে। সূত্রটি এই : $F = C\frac{qq'}{r^2}$ (q ও q' পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ, r দুয়ের মধ্যেকার দূরত্ব, C ধ্রুবক)। তেমনি দুই বিপরীত চৌম্বক মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সূত্র : $F = K\frac{MM'}{r^2}$ (M ও M' দুই বিপরীত মেরুর প্রাবল্য, r দূরত্ব, K ধ্রুবক)। একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বে আইনস্টাইন সন্ধান করছিলেন বিদ্যুৎচুম্বকত্ব ও মহাকর্ষের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক। তিনি অনুভব করছিলেন, এই হবে ইলেকট্রন থেকে গ্রহ পর্যন্ত বিশ্বের সবকিছুর আচরণ নির্দেশ করার সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। তিনি চাইছিলেন বস্তু ও বলের নিখিল ধর্মকে একটিমাত্র সমীকরণে বা সূত্রে সম্পর্কিত করতে। তিন দশকেরও বেশি কাল, আইনস্টাইনের বাকি জীবন, এই একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের নিষ্ফল সন্ধানে কেটেছিল।

পরবর্তী কালে, ১৯৭৯ সালে নোবল পুরস্কারপ্রাপ্ত (আরও দুই বিজ্ঞানীর সঙ্গে একযোগে) পাকিস্তানের পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস্ সালাম **প্রকৃতিজগতের দুটি বলকে যুক্ত করে একটি সূত্র উপস্থিত করেছেন এবং একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্পর্কে আইনস্টাইনের চিন্তাকে অংশত প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।**

আইনস্টাইনের গোড়ার দিকের নিবন্ধগুলিতে এই চিন্তার প্রক্রিয়াকেও যেন ধরতে পারা যায়। যেমন, তিনি লিখছেন, 'চারবছর আগে প্রকাশিত একটি ইতিবৃত্তে আমি চেষ্টা করেছিলাম এই প্রশ্নের জবাব দিতে যে আলোর চলন মহাকর্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয় কিনা। বিষয়টিতে আমি ফিরে আসতে চাই, কেননা বিষয়টিকে আগে যে-ভাবে উপস্থিত করেছিলাম তাতে আমি সন্তুষ্ট নই।' বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ সাধারণত লেখা হয় জ্যামিতির উপপাদ্যের মতো নৈর্ব্যক্তিক ধরনে। কিন্তু আইনস্টাইনের এই সমস্ত লেখা পড়ে আমরা সবসময়ে অনুভব করি এ-লেখা একজন মানুষের। বিশ্বপ্রকৃতির হেঁয়ালি ও রহস্য নিয়ে এই মানুষটির ব্যক্তিগত সংগ্রাম আমরা দেখতে পাই।

গোড়ার দিকের নিবন্ধগুলো সম্পর্কে আরো একটি বিষয় লক্ষ করার আছে। নিবন্ধগুলোতে গণিতের ওপরে নির্ভরতা কম, গাণিতিক সূত্রের উপস্থিতিও কম। ১৯০৫ সালের বিশেষ আপেক্ষিকতা

প্রকৃতিজগতে মূলগত বল আছে চারটি—মহাকর্ষ, বিদ্যুৎচুম্বক, নিউক্লিয়ার কণিকাদের প্রবল আন্তঃক্রিয়া ও দুর্বল আন্তঃক্রিয়া। প্রথম দুটি বলের ক্রিয়া মহাবিশ্ব জুড়ে, শেষের দুটি বলের ক্রিয়া পরমাণুর অভ্যন্তরে। এই চারটির মধ্যে সবচেয়ে জোরালো বল হচ্ছে নিউক্লিয়ার কণিকাদের প্রবল আন্তঃক্রিয়া। যদি তার মাপ ধরে নেওয়া হয় ১, তাহলে সেই কণিকাদের মধ্যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের মাপ হবে $১০^{-২}$, দুর্বল বলের $১০^{-৫}$, এবং মহাকর্ষের বলের $১০^{-৩৯}$। মহাকর্ষের বলের জোর সবচেয়ে কম। এই চারটি বলের একটি সাধারণ ভিত্তি তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করছিলেন। আইনস্টাইনের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল মহাকর্ষ ও বিদ্যুৎচৌম্বক বলের একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব। আইনস্টাইনের পরে অন্য পদার্থবিজ্ঞানীরাও একই প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু কেউ-ই সফল হননি। তবে, মহাকর্ষ ও বিদ্যুৎচুম্বকত্বকে যুক্ত করা না গেলেও, অধ্যাপক সালাম বিদ্যুৎচুম্বকত্ব ও দুর্বল আন্তঃক্রিয়াকে যুক্ত করতে পেরেছেন। এবং তার নাম দিয়েছেন বৈদ্যুৎ-দুর্বল (electro-weak)। তিনি দেখিয়েছেন, নিউক্লিয়াসকে ধরে রাখে যে বিদ্যুৎচৌম্বক বল, এবং তেজস্ক্রিয়তা ঘটিয়ে থাকে যে নিউক্লিয়ার আন্তঃক্রিয়া—এই দুটি অভিন্ন। অর্থাৎ, দুর্বল নিউক্লিয়ার বলও যা, বিদ্যুৎচৌম্বক বলও তাই। অতএব প্রকৃতিজগতের মূলগত বল এখন আর চারটি নয়—তিনটি। এ-ঘটনা অবশ্যই ব্যাপকতর অর্থে আইনস্টাইনের একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের পক্ষে প্রথম ধাপের সাফল্য।

বিষয়ক নিবন্ধে গাণিতিক সূত্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং সেগুলো পর-পর সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত নয় (সাধারণ আপেক্ষিকতার নিবন্ধে পর-পর সংখ্যায় চিহ্নিত পঁচাত্তরটি সমীকরণ আছে)। নিবন্ধগুলো পড়লে মনে হয় প্রচুর ধ্যানধারণা মুখের কথায় প্রকাশ করা হচ্ছে। আইনস্টাইন যেন তাঁর চিন্তার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আগে থেকেই ধরে নিতে পেরেছেন ফল কী হওয়া উচিত। এ থেকে বোঝা যায় চিন্তার কী অসাধারণ ক্ষমতা। কেমনভাবে চিন্তা করতেন আইনস্টাইন ? তিনি নিজেই বলছেন,

'চিন্তা' আসলে কী ? অনুভূতির ছাপ থেকে যখন স্মৃতিচিত্র বেরিয়ে আসে তখনো সেটা 'চিন্তা' নয়। এবং এমনি সব চিত্র যখন পর্যায় গঠন করে, একটি চিত্র অপর চিত্রকে জাগিয়ে তোলে, তখনো সেটা 'চিন্তা' নয়। কিন্তু যখন কোনো একটি চিত্র এমনি অনেকগুলো পর্যায়ে প্রকাশ পায়, তখন—সঠিকভাবে বলতে হলে, এমনি ফিরে আসার মধ্যেই—তা হয়ে ওঠে এমনি পর্যায়ের পক্ষে এক বিন্যাসকারী উপাদান, কেননা পারস্পরিক অ-সম্পর্কিত পর্যায়গুলোকে তা সম্পর্কিত করে। এমনি এক উপাদান হয়ে ওঠে একটি হাতিয়ার—একটি ধারণা। আমি মনে করি, অবাধ সংমিশ্রণ বা 'স্বপ্ন দেখা' থেকে চিন্তায় উত্তরণের লক্ষণ হচ্ছে 'ধারণার' কম-বেশি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ। এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে ধারণাকে সম্পর্কিত হতে হবে এমন কোনো চিহ্নের সঙ্গে (কথা) যা ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা যায় ও পুনরায় ব্যক্ত করা চলে। কিন্তু ঘটনাটি যদি তাই হয় তাহলে তার দরুণই চিন্তা হয়ে ওঠে প্রতিবেদনীয়।...

আমার কাছে এটা কোনো সন্দেহের বিষয় নয় যে আমাদের চিন্তা বহুলাংশেই চলে চিহ্নের (কথা) ব্যবহার ছাড়া, এবং তার বাইরে প্রভূত পরিমাণে অচেতনভাবে। নইলে এমন কি করে ঘটে যে কোনো কোনো অভিজ্ঞতা নিয়ে কখনো কখনো সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমরা 'অবাক হই' ? মনে হয়, এই 'অবাক হওয়ার' ব্যাপারটা ঘটে যখন আমাদের মধ্যে আগে থেকেই যথেষ্ট শক্তভাবে নিবদ্ধ ধারণার জগতের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সঙ্ঘর্ষ ঘটে। এমনি সঙ্ঘর্ষ জোরালো ও তীব্রভাবে অনুভূত হলে তা ফিরে এসে আমাদের চিন্তার জগতের ওপরে নির্ধারকরূপে সক্রিয় হয়। এক অর্থে এই চিন্তাজগতের বিকাশ হচ্ছে 'অবাক হওয়া' থেকে অনবরত সরে-যাওয়া।

বৈজ্ঞানিক কোনো সমস্যা নিয়ে যে-কেউ কাজ করেছেন তাঁরই

এই অভিজ্ঞতা হয়েছে—'অবাক হওয়া' থেকে সরে যাওয়া। তবে নতুন কোনো তত্ত্ব যিনি সৃষ্টি করতে চান তাঁকে অবশ্যই ব্যাপারকে স্থাপন করতে হবে এমন এক বিন্যাসের মধ্যে যার পাঠ একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। এই বিন্যাসের রূপায়ণে থাকে একধরনের অনুভূতি—একটা স্বপ্ন—এই জগৎ কেমন হওয়া উচিত তার ধারণা। আইনস্টাইন ছিলেন এই অর্থে অসাধারণ অনুভূতিশীল ও স্বপ্নদর্শী।

ব্রাউনীয় বিচলন

১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের দ্বিতীয় নিবন্ধটি ছিল, যাকে বলা হয় ব্রাউনীয় বিচলন, তাই নিয়ে। নিবন্ধটির বিশেষ গুরুত্ব এই কারণে যে এই নিবন্ধের পরে পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্ব চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করেছিল। পরমাণুর অস্তিত্বে অবিশ্বাসীর সংখ্যা এমনকি ১৯০৫ সালেও নিতান্ত কম ছিল না।

রবার্ট ব্রাউন (১৭৭৩-১৮৫৮) ছিলেন একজন স্কটদেশীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী। ১৮২৭ সালে তিনি কতকগুলো পরীক্ষাকার্য করেন, যা পরে তাঁর নামে পরিচিত হয়েছে। খুবই সরল ধরনের পরীক্ষাকার্য। জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদের পরাগরেণু সাধারণ একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখতে পান রেণু বা কণিকা অবিরাম নড়াচড়া করছে। তার মধ্যে কোনো একটা নিয়ম আছে বলে মনে হয় না, একেবারেই এলোমেলো। জল সম্পূর্ণ স্থির, অতএব এই নড়াচড়া জলের স্রোতের জন্য নয়। ব্রাউন বললেন, এই নড়াচড়া কণিকার মধ্যেই কিছু একটা হওয়ার জন্য। তিনি এই কণিকার নাম দিলেন 'সক্রিয় অণু'। দেখা গেল, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয় এমন ক্ষুদ্র কণিকা যদি জলে বা যে-কোনো তরল পদার্থে নিমজ্জিত থাকে তাহলে সেই কণিকা অবিরাম নড়াচড়া করে চলে। এই ব্যাপারটাকে বলা হল ব্রাউনীয়

বিচলন (Brownian motions)। তারপরেও এই নিয়ে পরীক্ষাকার্য চলতে লাগল এবং আরো প্রায় পঞ্চাশবছর পরে একদল বিজ্ঞানী ব্রাউনীয় বিচলনের মোটামুটি সঠিক একটি ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁরা বললেন, জল বা তরলপদার্থ অণু দিয়ে গঠিত। জল বা তরলপদার্থের অণুগুলো বড়োই অস্থির। এই অস্থিরতাই প্রকাশ পায় জল বা তরলপদার্থে নিমজ্জিত কণিকার মধ্যেও।

এই ব্যাখ্যা আমাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু তখনো পর্যন্ত পরমাণুর ধারণা সাধারণভাবে গ্রাহ্য ছিল না। পরমাণুকে ধরে নিলে রাসায়নিক ক্রিয়াগুলোর ব্যাখ্যা সহজ হয়, এই পর্যন্ত। কিন্তু ধরে নেওয়াটা তো আর প্রমাণ নয়। পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হলে পরমাণুকে চোখে দেখানো চাই, কিংবা এমন কোনো ক্রিয়াকে যা ঘটে থাকে পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্ব থাকার জন্য। অস্ট্রিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী লুডভিক বোল্‌ৎসমান (১৮৪৪-১৯০৬) ধরে নিয়েছিলেন গ্যাসীয় পদার্থ পরমাণু দিয়ে গঠিত এবং এই অনুমানের ভিত্তিতে গ্যাসীয় পদার্থের আচরণ ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তাঁর এই মতের ওপরে আক্রমণ শুরু হতে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরেও বলা হয়েছিল পরমাণুর ধারণা একটা অনুমান মাত্র। কোনো কোনো ব্যাপারের ব্যাখ্যা দেবার জন্য এই অনুমানের প্রয়োজন হয়—তার বেশি কিছু নয়। উনিশ শতক পার হবার পরেও পরমাণুতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। ১৯০৫ সালেও এই ছিল অবস্থা।

ব্রাউনীয় বিচলনের বিচারে আইনস্টাইন শুধু অনুমান নয়, অঙ্কের প্রমাণ উপস্থিত করলেন যে ব্রাউনীয় বিচলন ঘটে থাকে অণুর গতির জন্য। আইনস্টাইন নির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ব্রাউনীয় বিচলনের মাত্রা কতখানি হতে পারে। হিসেবের সুবিধের জন্য আইনস্টাইন ধরে নিলেন ব্রাউনের কণিকাগুলো (পরাগরেণু) ক্ষুদে গোলকবিশেষ, যার ব্যাসার্ধ এক-সেন্টিমিটারের দশহাজার-ভাগের একভাগ। আর যে তরলপদার্থের মধ্যে কণিকাগুলো নিমজ্জিত সেই তরলপদার্থের অণুর ব্যাসার্ধ এক-সেন্টিমিটারের দশ-

কোটি-ভাগের একভাগ। এই অণুগুলো সবসময়ে সমস্ত দিক থেকে কণিকাগুলোকে ধাক্কা দিচ্ছে আর কণিকাগুলো ছিটকে ছিটকে নড়াচড়া করছে। আইনস্টাইন দেখালেন, কণিকাগুলোর ছিটকে সরে যাওয়ার গড় দূরত্ব অতিবাহিত সময়ের বর্গমূল অনুসারে বাড়ে। তার মানে, একটি কণিকা এক-সেকেণ্ডে যতোটা সরে যায়, চার-সেকেণ্ডে সরবে তার চারগুণ নয়—তু'গুণ। আইনস্টাইন হিসেব দিলেন, একটি কণিকা এক-সেকেণ্ডে এক-সেন্টিমিটারের দশহাজার-ভাগের একভাগ পরিমাণ গড় দূরত্বে সরে যায়।

তারপরে ১৯০৮ সালে বিখ্যাত ফরাসী পরীক্ষামূলক পদার্থ-বিজ্ঞানী জে বি পেরাঁ তাঁর পরীক্ষাকার্যে আইনস্টাইনের সূত্র যাচাই করলেন এবং প্রমাণ পেলেন যে সূত্রটি সম্পূর্ণ নির্ভুল।

অতঃপর পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ থাকল না। পরমাণুতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক দিক থেকে গ্রাহ্য হল।

এখানে তুজন বিজ্ঞানীর নাম করা চলে যাঁরা আগে পরমাণুর অস্তিত্ব মানতেন না, পরে ব্রাউনীয় বিচলন সম্পর্কে আইনস্টাইনের বিচার থেকে মেনেছেন। একজন হচ্ছেন আধুনিক ভৌত রসায়ন-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, জার্মান ভৌত রসায়নবিজ্ঞানী ভিল্‌হেল্‌ম ওস্টভালট্‌। অপরজন মাখ্‌।

কোয়ানটাম তত্ত্ব

আমরা যখন কোনো জিনিস দেখি—কেন দেখি? এই কারণে যে সেই জিনিস ও আমাদের চোখের মধ্যে আলোর যোগসূত্র আছে। আলো আছে বলেই জিনিসটি আমরা দেখি, অন্ধকারে দেখতে পাই না।

কোনো জিনিসের খবর আমাদের চোখে পৌঁছে দেবার জন্য আলো কি করে মাঝখানের শূন্যস্থান পার হয় তা ব্যাখ্যা করতে

দুটি পৃথক তত্ত্বের উদ্ভব হল। একটি তত্ত্বে বলা হল আলো হচ্ছে কণিকা। অপর তত্ত্বে বলা হল আলো হচ্ছে ঢেউ। একটি তত্ত্বে আলো কণিকার মতো চারদিকে বর্ষিত হয়, অপর তত্ত্বে আলো ঢেউয়ের মতো চারদিকে বয়ে চলে।

ঢেউ বললেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, কিসের মধ্যে ঢেউ? যেমন, ঢেউ হতে পারে জলের মধ্যে বা বাতাসের মধ্যে। আলোর ঢেউ কিসের মধ্যে? বাতাসের মধ্যে হতে পারে না, কারণ বাতাস না থাকলেও, অর্থাৎ ভ্যাকুয়ামে বা শূন্যস্থানেও আলো চলাচল করতে পারে। তখন কল্পনা করা হল যে বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এমন একটি মাধ্যম যাতে আলোর ঢেউ ওঠে। এই মাধ্যমটির নাম দেওয়া হল ইথার। একটি মাধ্যম পাওয়া গেলে আলোকে ঢেউ হিসেবে মেনে নিতে আর কোনো বাধা থাকে না।

তাহলে আলো সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছে। একটিতে আলো কণিকা, অপরটিতে আলো ঢেউ। কোন্‌টি ঠিক?

নিউটন তাঁর বারোবছর সময়ের গবেষণার মধ্যে কিছুটা সময় দিয়েছিলেন আলোকবিদ্যার গবেষণাতেও। তাঁর সমর্থন ছিল কণিকার দিকে। আলো যদি ঢেউ হবে তাহলে আলো কেন বরাবর সিধে পথে চলে, কেন সামনে আড়াল থাকলে বাঁক ঘুরে যেতে পারে না? আলো সম্পর্কে সমকালীন যতো কিছু প্রশ্ন ছিল কণিকাতত্ত্বের সাহায্যেই নিউটন তার জবাব দিলেন।

নিউটনের মৃত্যুর পরে কিন্তু হাওয়া ঘুরে গেল। আলো সম্পর্কে আরো যে-সব নতুন ব্যাখ্যা জানা গেল তার ব্যাখ্যা আলোকে কণিকা ধরে নিলে পাওয়া শক্ত। আলো যদি কণিকা হবে তাহলে দুই আলোর রশ্মি পরস্পরের দিকে ধাবিত হলে ধাক্কাধাক্কি হয়ে আলোর হানি ঘটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কই, তা তো হয় না। সামনে আড়াল পড়লে আলো কি বাঁক ঘুরতে পারে? তাও পারে। মনে রাখা দরকার, আলোর ঢেউয়ের চুড়ো থেকে চুড়োর মাপ (তরঙ্গদৈর্ঘ্য) এক-সেন্টিমিটারের কুড়িহাজার-ভাগের এক-ভাগ। তাই যদি হয়—তখন? আড়ালের যে-ছায়াটি পড়ে তার কিনার যদি হয় ঝাপসা তাহলে প্রমাণ হয়ে যায় যে আলো ঢেউ। বাস্তবে

দেখা গেল, প্রকৃতই তাই ঘটছে। খুব ছোট মাপের আড়াল (যেমন, চুল বা তার) আলোর সামনে ধরলে তার ছায়াটি হয় ঝাপসা কিনারওলা। তার মানে আলো হচ্ছে ঢেউ।

নিউটনের মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যেই আরো একটি ব্যাপার ঘটল যেটিকে বলা চলে আলোর ঢেউ-তত্ত্বের পক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ। শূন্যস্থানে আলোর বেগ সেকেণ্ডে তিনলক্ষ কিলোমিটার। কণিকা-তত্ত্বের সমর্থক নিউটন বলেছিলেন, জলের মধ্যে আলোর বেগ আরো বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু ঢেউ-তত্ত্বের সমর্থকরা বলতেন, আরো কম। তারপরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্যের সাহায্যে প্রকৃতই যখন জলের মধ্যে আলোর বেগের মাপ নিতে পারা গেল, সেটি হয়ে দাঁড়াল আরো কম—ঢেউ-তত্ত্ব অনুসারে যতোখানি হওয়া উচিত ততোখানি কম। আলো যে ঢেউ তার সপক্ষে এটি হয়ে দাঁড়াল মস্ত একটি প্রমাণ।

এই সময়ে ঢেউতত্ত্বের পক্ষে আরো বড়ো সমর্থন পাওয়া গেল বিদ্যুৎ ও চুম্বকবিদ্যার গবেষণা থেকে। ফ্যারাডে আবিষ্কার করলেন বিদ্যুৎচৌম্বক আবেশ ও ডায়নামো। এই দুটি আবিষ্কার থেকেই পরবর্তীকালে বিদ্যুৎ-প্রযুক্তিবিদ্যার বিপুল সাফল্য।

ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য ফ্যারাডে কল্পনা করেছিলেন, বলের কতকগুলো নল যেন ছড়িয়ে পড়েছে—যেন অক্টোপাসের শুঁড়। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে এই শুঁড় দিয়ে।

তারপরে বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল সর্বপ্রথম ফ্যারাডের এই সমস্ত আবিষ্কারকে একটা গাণিতিক তত্ত্বের মধ্যে তুলে ধরতে পারলেন, এতদিন যার অভাব ছিল। এই তত্ত্ব থেকে জন্ম নিল পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন একটি ধারণা—ফিল্ড বা ক্ষেত্র। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি।

মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই ক্ষেত্রটির জন্যও চাই একটি আসন। বিজ্ঞানীরা আবার কল্পনার আশ্রয় নিলেন। আলোর ঢেউ ওঠার জন্য যেমন ইথারের কল্পনা করা হয়েছিল, এবারেও তাই। নাম দেওয়া হল বিদ্যুৎচৌম্বক ইথার। প্রথমটি ছিল আলো-ধারক ইথার, দ্বিতীয়টি বিদ্যুৎচৌম্বক ইথার।

ফ্যারাডের ধারণাকে গাণিতিক তত্ত্বে প্রকাশ করতে গিয়ে ম্যাক্সওয়েল এমন আরো কতকগুলো সূত্রের সন্ধান পেলেন যা থেকে যুগান্তকারী কতকগুলো সিদ্ধান্তও করতে হল। তিনি বললেন, এমন একটা ব্যাপার থাকা উচিত যাকে বলা চলে বিদ্যুৎচৌম্বক ঢেউ। এই ঢেউয়ের বেগ হওয়া উচিত আলোর বেগের সমান এবং এই ঢেউয়ের প্রকৃতি হওয়া উচিত মোটামুটি আলোর প্রকৃতির অনুরূপ।

কিন্তু গাণিতিক সূত্র থেকে সিদ্ধান্ত করা আর বাস্তবে তার প্রমাণ পাওয়া এক কথা নয়। ল্যাবরেটরির পরীক্ষাকার্যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ঢেউ তৈরি হলে তবেই তার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া চলে।

ম্যাক্সওয়েলের মৃত্যুর সাতবছর পরে বিজ্ঞানী হার্ৎস ল্যাবরেটরির পরীক্ষাকার্যেই প্রমাণ উপস্থিত করলেন যে বিদ্যুৎচৌম্বক ঢেউ প্রকৃতই হতে পারে। বিশেষ একটি যন্ত্রে দুটি তারের কুণ্ডলীর মধ্যেকার শূন্য স্থানে তৈরি হওয়া স্ফুলিঙ্গ থেকে এই ঢেউয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হল। তিনি আরো প্রমাণ দিলেন, এই ঢেউয়ের বেগ আলোর বেগের সমান, এবং ম্যাক্সওয়েল যেমনটি বলেছিলেন, এই ঢেউয়ের প্রকৃতি আলোর প্রকৃতির অনুরূপ।

কথাটার তাৎপর্য সামান্য নয়। ধরে নিতে হয় যে বিদ্যুৎচৌম্বক ঢেউ বা বেতারের ঢেউ ও আলোর ঢেউ একই ব্যাপার। পরের গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে, আসলে তাই। তফাৎটা এসে যাচ্ছে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাপের কম-বেশিতে। ধরা যাক একটি ত্রিশিরা কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো ফেলা হল। তখন স্পষ্ট সাতটি রঙ বেরিয়ে আসে—একদিকে বেগুনী, অন্যদিকে লাল, মাঝখানে আরো পাঁচটি। কিন্তু এইটুকুই সব নয়, একদিকে লাল ছাড়িয়ে ও অন্যদিকে বেগুনী ছাড়িয়ে থেকে যায় আরো অনেক আলো। মানুষের চোখে শুধু এইটুকুই দৃশ্যমান—লাল আলোর ·০০০০৮ সেন্টিমিটার (এক-সেন্টি-মিটারের একলক্ষ-ভাগের আটভাগ) তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে বেগুনী আলোর ·০০০০৪ সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যন্ত। লাল আলো ছাড়িয়ে যা আছে সেগুলো আমরা চোখে দেখি না। আছে ·০০০০৮ থেকে ·১ সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অবলোহিত রশ্মি (infra-red ray),

·১ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার মাপের ও আরো বড়ো মাপের রেডিও তরঙ্গ। বেগুনী ছাড়িয়ে আছে ·০০০০৪ থেকে ০০০০১ সেন্টিমিটার মাপের অতিবেগুনী রশ্মি (ultra-violet ray). ·০০০০১ থেকে ·০০০০০১ সেন্টিমিটার মাপের এক্স-রশ্মি ও আরো ছোট মাপের গামা রশ্মি।

তফাৎ শুধু মাপে, নইলে সবই এক। চোখের দেখায় আমরা দেখতে পাই অতি সামান্য অংশ মাত্র—সেন্টিমিটারের লক্ষভাগের আট থেকে চারভাগ পর্যন্ত। আর এই গোটা ব্যাপারটি বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্বের ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ও সাধারণ বলবিদ্যার নিয়মকানুনের অধীন।

আলোর কণিকাতত্ত্ব অনেক আগেই মরতে বসেছিল, এবারে মনে হতে লাগল যে তার শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে।

কিন্তু একই সঙ্গে আরো একটি ঘটনা ঘটল। যে পরীক্ষাকার্যের সাহায্যে হার্ৎস ম্যাক্সওয়েলের ঢেউয়ের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করেছিলেন, সেই একই পরীক্ষাকার্যে আরো একটি ব্যাপার লক্ষ করা গেল। হার্ৎস দেখলেন, যন্ত্রের ওপরে যদি অতিবেগুনীরশ্মি এসে পড়ে তাহলে তারের দুই কুণ্ডলী-প্রান্তের মাঝখানের শূন্যস্থানে স্ফুলিঙ্গ যেন একটু জোরালো হয়ে ওঠে।

হার্ৎস ভাবতেও পারেন নি, এই যে সামান্য ব্যাপারটি তিনি লক্ষ করছেন সেটাই এখনো পর্যন্ত 'কোয়ান্টাম'-এর অস্তিত্বের সপক্ষে সবচেয়ে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ব্যাপারটি ঘটেছিল ১৯০০ সালে, যখন মোটামুটি মনে করা হচ্ছিল যে নিউটনের সূত্র অনুযায়ী ও সাধারণ বলবিদ্যার নিয়মগ্রাহ্য এই জগতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাটি বিজ্ঞান দিতে পেরেছে। এই ১৯০০ সালেই মাক্স প্লাঙ্ক উপস্থিত করলেন তাঁর 'কোয়ান্টাম' তত্ত্ব। জগৎ-ব্যাপারে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা থেকে বিজ্ঞান এই প্রথম বিচ্যুত হল।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূলে ছিল বিকিরণের পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত কিছু সমস্যা। একটা জানা ঘটনা এই যে কোনো বস্তু উত্তপ্ত হয়ে জ্বলতে শুরু করলে তা থেকে নির্গত হয় প্রথমে লাল আভা, তারপরে

কমলা, তারপরে হলুদ, এবং খুব বেশি উত্তপ্ত হলে সাদা। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছিলেন একটা নিয়ম খুঁজে বার করতে যা থেকে ধারণা হয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও উত্তাপের ভিন্নতা ঘটলে কি-ভাবে বিকিরিত শক্তির পরিমাণে ভিন্নতা ঘটে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফল হচ্ছিল যতোদিন-না মাক্স প্লাঙ্ক গণিতের পথ ধরে একটা সমীকরণের সন্ধান পেয়ে যান। দেখা গেল এই সমীকরণ পরীক্ষাকার্যের ফলসম্মত। তবে সমীকরণটিকে দাঁড় করাবার জন্য অসাধারণ একটি অনুমানের আশ্রয় নিতে হল। সেটি এই—বিকিরিত শক্তি নিঃসরিত হয় অবিচ্ছিন্ন ধারায় নয়, বিচ্ছিন্ন টুকরোয় বা অংশে। এই টুকরো বা অংশগুলোর নাম তিনি দিলেন কোয়ান্টা (একটি বোঝাতে কোয়ান্টাম, একাধিক বোঝাতে কোয়ান্টা)। তাঁকে সিদ্ধান্ত করতে হল, প্রতিটি কোয়ান্টামে নিহিত থাকে কিছু পরিমাণ শক্তি, যা সমীকরণের দ্বারা নির্ধারিত। সমীকরণটি প্রকাশ করছে নিঃসৃত শক্তির পরিমাণের সঙ্গে বিকিরণের কম্পাঙ্কের একটা সম্পর্ক। দেখা গেল সম্পর্কটি নিশ্চিতরূপেই একটি ধ্রুবক, বলা হয়ে থাকে প্লাঙ্কের ধ্রুবক (Planck's Constant)—নিঃসৃত শক্তির পরিমাণকে বিকিরণের কম্পাঙ্ক দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায়। সংখ্যাটি খুবই ছোট—দশমিক বিন্দুর পরে ছাব্বিশটি শূন্য বসিয়ে তারপরে ৬৬২৪। সংখ্যাটি ঠিক এই কেন তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু এই ধ্রুবকটিকে ধরে নিয়েই পরমাণু-পদার্থবিদ্যার সমস্ত হিসাব-নিকাশ চলছে।

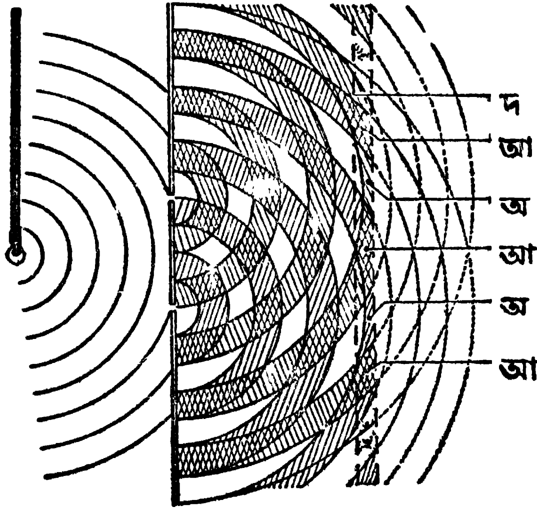
প্লাঙ্কের কোয়ানটাম তত্ত্বের তাৎপর্য যে কতখানি তা বোঝা গেল ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন আসার পরে। আইনস্টাইন বললেন, সকল প্রকার বিকিরিত শক্তি—তা আলো হোক, উত্তাপ হোক, এক্স-রশ্মি হোক—সবই শূন্যে (স্পেসে) ধাবিত হয় পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কোয়ানটামে। আগুনের সামনে বসলে আমরা যে উত্তাপ অনুভব করি তা এই কারণে যে বিকিরিত উত্তাপের অজস্র কোয়ান্টা আমাদের চামড়ার ওপরে বর্ষিত হচ্ছে।

আইনস্টাইন এই ধারণা প্রকাশ করলেন আলোকবিদ্যুৎ ফল নামে পরিচিত একটি বিভ্রান্তিকর ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি সূত্র রচনা করতে গিয়ে। ব্যাপারটি এই—বিশুদ্ধ বেগুনী

আলোর এক ফলক যদি একটি ধাতুর পাতের ওপরে বিকীর্ণ হয় তাহলে পাত থেকে একঝাঁক ইলেকট্রন নির্গত হয়ে থাকে। যদি নিম্নতর কম্পাঙ্কের আলো (যেমন, হলুদ বা লাল) পাতের ওপরে আপতিত হয় তাহলেও ইলেকট্রন নির্গত হয় কিন্তু তার বেগ হয় আরও কম। ধাতুর পাত থেকে কতখানি বেগে ইলেকট্রন নির্গত হবে তা নির্ভর করে একমাত্র আলোর রঙের ওপরে, আলোর তীব্রতার ওপরে আদৌ নয়। আলোর উৎসকে যদি অনেক দূরে সরিয়ে নেওয়া যায়, প্রায় দেখা যায় না এমন দূরেও, তখন ধাতুর পাত থেকে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা অনেক কমে যায় বটে কিন্তু নির্গমনের বেগ কমে না। এই ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হত। আইনস্টাইন সিদ্ধান্ত করলেন, এই অদ্ভুত ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করা যায় একমাত্র এই অনুমানের ওপরে দাঁড়িয়ে যে পৃথক পৃথক কণা বা শক্তির দানা দিয়ে সকল আলো গঠিত। এই কণা বা দানাগুলোর নাম তিনি দিলেন ফোটোন। একটি ফোটোন যখন একটি ইলেকট্রনকে আঘাত করে তার ফল দাঁড়ায় দুটি বিলিয়ার্ড-বলের ধাক্কা খাওয়ার মতো। আইনস্টাইন বললেন, বেগুনী ও অতি-বেগুনী ও অন্যান্য উচ্চতর কম্পাঙ্কের বিকিরণের ফোটোনের মধ্যে আছে লাল বা অবলোহিত ফোটোনের চেয়ে আরও বেশি শক্তি। ধাতুর পাত থেকে নির্গত ইলেকট্রনের বেগ নির্ভর করে যে-ফোটোনটি তাকে আঘাত করছে সেই ফোটোনের মধ্যে নিহিত শক্তির ওপরে। এই সূত্রগুলোকে তিনি কতকগুলো ঐতিহাসিক সমীকরণে প্রকাশ করলেন। এই কৃতিত্বের জন্যই ১৯২১ সালে পদার্থবিদ্যায় তাঁর নোবেল পুরস্কার লাভ। পরবর্তী কালের কোয়ানটাম পদার্থবিদ্যা ও বর্ণালিবিদ্যার ওপরে আইনস্টাইনের আলোকবিদ্যুৎ সূত্রের বিপুল প্রভাব ছিল।

তবুও কিন্তু দেখা গেল আলোর আচরণে এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে যার ব্যাখ্যা করতে হলে ধরে নিতেই হয় আলো হচ্ছে তরঙ্গ। এমন একটি ব্যাপার হচ্ছে ব্যবর্তন (diffraction)। অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে যে আলো আসে তা ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে— যেমনটি একমাত্র তরঙ্গের বেলাতেই হওয়া সম্ভব। এমনি আরেকটি

ব্যাপার ব্যতিচার (interference)। অতি সূক্ষ্ম ঝাঁঝরি দিয়ে যে আলো আসে তা পরপর কতকগুলো সাদা-কালো রেখায় ফুটে



একটি বাতির আলো দুটি ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসছে। বেরিয়ে আসার পরে আবার ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এই হচ্ছে আলোর ব্যবর্তন। দুটি ছিদ্র থেকে আলোর যে দু-প্রস্থ নতুন ঢেউ তৈরি হল তা এসে পড়ছে একটি দেওয়ালের (চিত্রে **দ**) ওপরে। যেহেতু একই বাতি থেকে একই সময়ে ছিদ্রদুটিতে আলো এসে পৌঁছচ্ছে, অতএব নিঃসৃত আলো হবে একই তালের। দেওয়ালের গায়ে যেখানে দুই আলোর তাল একই দিকে সেখানে আরো আলো (চিত্রে **আ**), যেখানে বিপরীত দিকে সেখানে অন্ধকার (চিত্রে **অ**)। এই হচ্ছে আলোর ব্যতিচার।

ওঠে —যেমনটি একমাত্র তরঙ্গের বেলাতেই হওয়া সম্ভব। আলোর ব্যবর্তনও আছে, ব্যতিচারও আছে। অতএব আলো তরঙ্গও বটে।

আলো তবে কী? কণিকা? না, তরঙ্গ? স্বীকার করতে হয় আলো দুই-ই।

১৯১১ সালে আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের পরীক্ষাকার্য থেকে পরমাণুর গঠন জানা গিয়েছিল। পরমাণুর কেন্দ্রে আছে একটি নিরেট এলাকা, নাম 'নিউক্লিয়াস', আর তাকে ঘিরে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণ্যমান গ্রহের মতো ইলেকট্রন।

কিন্তু ম্যাক্স্ওয়েলের সূত্রের সঙ্গে পরমাণুর এই চিত্রকে খাপ খাওয়ানো গেল না। ম্যাক্স্ওয়েলের সূত্র অনুসারে বলতে হয়, ইলেকট্রনের উচিত পাক খেতে খেতে এবং সেই সঙ্গে আলো বিকীর্ণ করতে করতে পরমাণুর কেন্দ্রে নেমে পড়া। অর্থাৎ, ম্যাক্স্ওয়েলের সূত্রে অনুসারে পরমাণুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

এই দুরূহ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ আবিষ্কার করলেন নীল্স বোর। প্লাঙ্ক অনুসরণে তিনিও ধরে নিলেন আলো কোয়ান্টায় গঠিত, এবং দেখলেন ইলেকট্রন পাক খেতে খেতে ভিতরে নামতে পারে না, এক কক্ষ থেকে অপর কক্ষে ঝাঁপ দিতে পারে মাত্র। ইলেকট্রন থেকে আলো নিঃসরিত হতে পারে অভঙ্গ তরঙ্গে নয়, একক একটি দমকের পুরো কোয়ান্টামে। দেখলেন, সর্বনিম্ন একটি কক্ষ আছে যাকে ছাড়িয়ে আরও ভিতরে যাওয়া ইলেকট্রনের পক্ষে অসম্ভব। স্বাভাবিক অবস্থার একটি পরমাণুতে সকল ইলেকট্রন থাকে সর্বনিম্ন কক্ষে।

এই স্বাভাবিক অবস্থার পরমাণুকে আলোর একটি কোয়ান্টাম যদি ঘা দেয় তাহলে কোয়ান্টামটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। তখন ইলেকট্রন ঝাঁপ দেয় নতুন এক কক্ষে। এখন এই পরমাণুটিকে যদি কোনো প্রকারে ব্যাঘাত করা না হয় তাহলে কি সেই ইলেকট্রন নিজের থেকেই পুরনো কক্ষে ফিরে আসবে? বাহ্যত ফিরে আসার পক্ষে কোনো কারণ নেই। আইনস্টাইন আবিষ্কার করলেন ইলেকট্রন ফিরে আসবেই। কিন্তু পদার্থবিদ্যার সূত্র থেকে কিছুতেই হদিশ পেলেন না ফিরে আসতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে।

ইলেকট্রনের আচরণ নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানী নতুন এক সমস্যায় পড়লেন। কোনো উপায়েই ইলেকট্রন সম্পর্কে এমন যথেষ্ট জানা যাচ্ছে না যাতে সঠিকভাবে বলা সম্ভব ইলেকট্রন কখন ঝাঁপ দেবে। পদার্থবিজ্ঞানী বড়ো জোর সম্ভাব্যতার হিসেব করতে পারেন।

পৃথক একটি ইলেকট্রনকে নির্দিষ্টভাবে ধরার চেষ্টা যতো সতর্কভাবেই করা হোক না কেন তার ফলেই ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে যায়। পদার্থ-বিজ্ঞানী বড়ো জোর বহুসংখ্যক ইলেকট্রনকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে পারেন।

তারপরে পরপর অনেকগুলো রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেল। ১৯২৫ সালে লুই দ্য ব্রগলী নামে একজন তরুণ ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী মতপ্রকাশ করলেন: বস্তু ও বিকিরণের পারস্পরিক ক্রিয়া সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় যদি ইলেকট্রন বিবেচিত হয় পৃথক পৃথক কণিকা হিসেবে নয়, তরঙ্গ-ব্যবস্থা হিসেবে।

কথাটা চমকে ওঠার মতো। গত দুই দশক ধরে কোয়ান্টাম গবেষণায় পদার্থবিজ্ঞানীরা বস্তুর কতকগুলো প্রাথমিক কণিকা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা করে নিয়েছিলেন। পরমাণুর মডেল ছিল একটি ক্ষুদে আকারের সৌরমণ্ডল—কেন্দ্রে একটি নিউক্লিয়াস, তাকে ঘিরে এক বা একাধিক আবর্তনশীল ইলেকট্রন। দেখা গেল সব ইলেক-ট্রনেরই সমান ভর ও সমান বৈদ্যুতিক চার্জ। তাহলে এই ইলেক-ট্রনই হচ্ছে বিশ্বের চূড়ান্ত ভিত্তিপ্রস্তর। আর এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক যে তার আকার হবে কঠিন নমনীয় গোলকের মতো। কিন্তু ইলেকট্রন এত সহজে ধরা দিল না। ইলেকট্রনকে পর্যবেক্ষণ করা ও ইলেকট্রনের মাপজোখ নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হতে লাগল।

অল্প কিছুকাল পরেই ভিয়েনার পদার্থবিজ্ঞানী এরভিন শ্রোয়ে-ডিংগার এই একই ধারণা গাণিতিক আকারে উপস্থিত করলেন। পরীক্ষাকার্য থেকেও প্রমাণ পাওয়া গেল ইলেকট্রন প্রকৃতই তরঙ্গের চরিত্রবিশিষ্ট। পরবর্তী পরীক্ষাকার্য ছিল আরো চমকপ্রদ। দেখা গেল, গোটা পরমাণু ও এমনকি অণু থেকেও তরঙ্গের চরিত্র প্রকাশ পাচ্ছে। এমনিভাবে বস্তুর মৌল ইউনিট থেকে তার সারভাগ খসে পড়ল। সাবেকী আমলের গোলকাকার ইলেকট্রন হয়ে দাঁড়াল বৈদ্যুতিক শক্তির স্পন্দনশীল চার্জ মাত্র। পরমাণু হয়ে দাঁড়াল নিহিত এক তরঙ্গ-ব্যবস্থা। এ থেকে অবধারিত সিদ্ধান্ত করতে হয় যে সকল বস্তু তরঙ্গ দিয়ে তৈরী, আমরা বাস করি এক তরঙ্গের জগতে।

এই অবস্থা অবশ্যই গোলমেলে। কেননা, বস্তু বলতে বোঝাচ্ছে তরঙ্গ, আলো বলতে কণিকা। দুয়ের মধ্যে একটা সেতু রচনা করলেন দুই জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী—ভের্নার হাইজেনবার্গ ও মাক্স বর্ন। তাঁরা এমন এক গাণিতিক ব্যবস্থা খাড়া করলেন যার সাহায্যে, কি তরঙ্গ কি কণিকা, যেটিকে খুশি ধরে নিয়ে কোয়ান্টাম ব্যাপারের নির্ভুল বর্ণনা দেওয়া চলে। তাঁরা বললেন, একটি একক ইলেকট্রনের চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামানো পদার্থবিজ্ঞানীর পক্ষে অর্থহীন। ল্যাবরেটরিতে তাঁকে কাজ করতে হয় ইলেকট্রনের ফলক বা ঝাঁক নিয়ে, যার প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে কোটি কোটি পৃথক কণিকা (বা তরঙ্গ)। অতএব তাঁর পক্ষে অবহিত হবার বিষয় হচ্ছে সামগ্রিক আচরণ, সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার পরিসংখ্যান ও সূত্র। কাজেই পৃথক পৃথকভাবে ইলেকট্রনগুলো কণিকা না তরঙ্গব্যবস্থা তাতে কিছু যায় আসে না। সামগ্রিকভাবে তাদের যে-কোনো একটি হিসেবে ধরে নেওয়া চলে। তরঙ্গের রূপ নির্দেশ করার জন্য শ্রোয়েডিঙ্গার যে গাণিতিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন সেই একই ভাষা ব্যবহার করে বর্ন দেখালেন তা হচ্ছে পরিসংখ্যানগত অর্থে একটা "সম্ভাব্যতা", হাইজেনবার্গ ও বর্নের সমীকরণ যে চিত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। আমরা ভাবতে পারি আমরা বাস করছি তরঙ্গের বিশ্বে, কিংবা কণিকার বিশ্বে।

এমনিভাবে পারমাণবিক জগতের সকল ব্যাপারে একটা অনিশ্চয়তা এসে যাচ্ছে। মাপজোখের ব্যবস্থা আরো যতোই উন্নত হোক না কেন এই অনিশ্চয়তা যাবার নয়। এই কথাটাই ১৯২৭ সালে হাইজেনবার্গ উপস্থিত করলেন তার 'অনিশ্চয়তার নীতি' নামে পরিচিত সূত্রে। একজন পদার্থবিজ্ঞানীর হাতে যতোই শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্র থাকুক না কেন তাঁর পক্ষে পৃথক একটি ইলেকট্রনের অবস্থান ও গতি নির্ণয় করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি বড়ো জোর বহুসংখ্যক ইলেকট্রনকে সামগ্রিকভাবে বিচার করার পরে বিবেচনাধীন ইলেকট্রনের সম্ভাব্য অবস্থানের নিশানা পেতে পারেন মাত্র।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা এমনিভাবে সনাতন পদার্থবিদ্যার দুটি স্তম্ভ চূর্ণ করে দিল। একটি হচ্ছে কারণতা (Causality), অপরটি

নির্ধারণীয়তা (Determinism)। বিচারের অবলম্বন যদি হয় পরিসংখ্যান ও সম্ভাব্যতা তাহলে এমন ধারণা ত্যাগ করতেই হয় যে প্রকৃতির তাবৎ ঘটনাবলী কার্যকারণের পরিণতি। সাবেকী বিজ্ঞানের যুগে সেই যে ধারণা ছিল যে বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর বর্তমান অবস্থা ও গতি যদি জানা থাকে তাহলে বিশ্বের গোটা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব—তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জগতে দাঁড়িয়ে প্রকৃত বাস্তবকে অবলোকন করার প্রয়াস প্রায় এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেননা এই প্রয়াসই প্রকৃত বাস্তবকে বিকৃত করে তোলে। এ যেন অন্ধ মানুষের পক্ষে হাতের স্পর্শে তুষারের পরত অবলোকন করা—কেননা হাতের স্পর্শেই তুষার গলে যায়। পদার্থবিজ্ঞানীরও এই দশা। প্রকৃত বাস্তবকে যতোই তিনি ধরার চেষ্টা করেন ততোই তা ফসকে যায়, হাতে পড়ে থাকে কিছু গাণিতিক পরিকল্পনা মাত্র। ইলেকট্রন হোক, ফোটোন হোক, সম্ভাব্যতার তরঙ্গ হোক, কোনো কিছুই ধরা যায় না—সেগুলো গাণিতিক সম্পর্ক প্রকাশের প্রতীক মাত্র।

আইনস্টাইন এই অনিশ্চয়তাকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি মনে করতেন, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার পরিসংখ্যান পদ্ধতি শেষপর্যন্ত একটা সাময়িক উপায় হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বললেন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে এই জগৎ নিয়ে ঈশ্বর পাশা খেলেন।'

অথচ আইনস্টাইনই প্রথম সম্ভাব্যতার কথা তুলেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে একটু পরে আবার আমরা আলোচনা তুলব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আইনস্টাইন খোলাখুলি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন তিনি। যতো শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইতেন। তাই যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারে যোগ দিয়েছিলেন, শান্তিবাদের সমর্থনে আইন-অমান্য সমর্থন করেছিলেন।

এই মর্মে প্রচার চালিয়েছিলেন যে সৈন্যদলে নাম লেখাবার ডাকে কেউ যেন সাড়া না দেয়। ভেবেছিলেন, অল্পসংখ্যক লোকও যদি সৈন্যদলে নাম লেখাবার ডাক অগ্রাহ্য করে তাহলে গভর্নমেণ্টের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

আইনস্টাইনের কথা তখন কেউ শোনেনি। সারা দেশে যুদ্ধের পক্ষে একটা উন্মাদনা ছিল। আপন প্রিয়জনদের যুদ্ধের সাজ পরিয়ে রণক্ষেত্রে মরতে পাঠাতেও কারও কোনো আপত্তি ছিল না। আইনস্টাইন হতাশ হয়েছিলেন। বছর কুড়ি পরে কিন্তু এই আইনস্টাইনই মত বদলিয়েছিলেন এবং হিটলার ও নাৎসীদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশের ও সশস্ত্র প্রতিরক্ষার ডাক দিয়েছিলেন।

সে-সময় আইনস্টাইন তাঁর শান্তিবাদী মনোভাব থেকে আরও চেয়েছিলেন বিশ্বের জাতিতে জাতিতে ভালো সম্পর্ক স্থাপিত হোক। যুদ্ধের শেষে পরাজিত জার্মানির অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল, জার্মানিতে দেখা দিয়েছিল প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে এককাঁড়ি নোট না ঢাললে মুদির দোকানের সামান্য কোনো সওদাও পাওয়া যেত না। মুদ্রাস্ফীতির চাপে জার্মানির বহু মানুষের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছিল। আর সেই দুঃখের সঙ্গে সমবেদনায় আইনস্টাইন অনুভব করেছিলেন, তিনিও জার্মান। ১৯২০ সালে স্বেচ্ছায় আবার জার্মান নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন।

সে-সময়ে আইনস্টাইনের জীবনও কষ্টের ছিল। তিনি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। মুদ্রাস্ফীতির দরুন তাঁর মাইনের টাকার দাম কুড়িভাগের একভাগ হয়ে গিয়েছিল। ফলে অভাবের মধ্যেই থাকতেন। তার ওপরে সুইজারল্যাণ্ডে টাকা পাঠাতে হত প্রথম স্ত্রী ও দুই ছেলের ভরণপোষণের জন্য। জার্মানির আবহাওয়া তাঁর পক্ষে পীড়াদায়কই ছিল। তবুও তিনি বার্লিনেই থেকে গেলেন। বার্লিনে ছিলেন মাক্স প্লাঙ্ক, বার্লিনে প্রায়ই আসতেন মাক্স বর্ন। বার্লিন আকাদেমিতে তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ হত। বার্লিনে থাকার পক্ষে আইনস্টাইনের কাছে এও মস্ত আকর্ষণ। ১৯৩২ পর্যন্ত আইনস্টাইন বার্লিনেই ছিলেন। হিটলারের ক্ষমতা দখলের পরে চিরকালের জন্য দেশ ছাড়েন।

কুড়ির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বার্লিন হয়ে উঠেছিল তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। বার্লিনে তখন ছিলেন আইনস্টাইন, ছিলেন প্লাঙ্ক, ছিলেন এরভিন শ্রোয়েডিঙ্গার। ছিলেন আরো বহু প্রখ্যাত পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানী ও রসায়নবিজ্ঞানী। তখনকার বার্লিনে পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক যে সাপ্তাহিক আলোচনা সভা বসত, আর তাতে যে-সব বিজ্ঞানীর সমাবেশ হত তার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না।

মাক্স বর্নের একটি লেখায় প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইনকে বড়ো সুন্দরভাবে পাওয়া যাচ্ছে। সেটি এই :

> বার্লিন আকাদেমিতে প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইনের মধ্যে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ হত। দুজনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা শুধু বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার বিনিময় নয়, তা ছাড়িয়েও অনেকখানি। অথচ, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দুটি মানুষের মতো এত পৃথক দুটি মানুষ খুঁজে পাওয়া শক্ত। আইনস্টাইন বিশ্ব-নাগরিক, নিজের চারদিকের মানুষজনের সঙ্গে অতি সামান্যই তাঁর যোগ, যে-সমাজে তাঁর বাস তার ভাবগত পটভূমি থেকে তিনি স্বতন্ত্র। প্লাঙ্ক গভীরভাবে প্রোথিত তাঁর পরিবার ও জাতির ঐতিহ্যের মধ্যে, তিনি একাগ্র দেশপ্রেমিক, জার্মান ইতিহাসের মহত্ত্ব নিয়ে গর্বিত, রাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে সচেতনভাবেই প্রুশীয়। কিন্তু দুজনের মধ্যে মিল এত বেশি যে এই সমস্ত পার্থক্যে কিছুই যায় আসে না। মিল ছিল প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে মুগ্ধ আগ্রহে, অভিন্ন দার্শনিক প্রত্যয়ে, সঙ্গীতের প্রতি গভীর ভালোবাসায়। দুজনে প্রায়ই একসঙ্গে সঙ্গীতচর্চা করতেন। প্লাঙ্ক বাজাতেন পিয়ানো, আইনস্টাইন বেহালা। দুজনেই মগ্ন ও আনন্দিত হয়ে উঠতেন। প্লাঙ্ক পিয়ানো বাজাতেন খুবই চমৎকার। শুনতে চাইলে ক্লাসিকাল যে-কোনো সুর বাজিয়ে দিতেন—অনেক সুরই তাঁর মুখস্থ ছিল। তাছাড়া, কোনো একটি বিষয় পেলে তার ওপরে, কিংবা তাঁর অতি প্রিয় প্রাচীন জার্মান লোকসঙ্গীতের ওপরে সুর বসাতে ভালোবাসতেন।

জার্মানিতে নাৎসীবাদের বিপদ ঘনিয়ে আসছে এ-বিষয়ে আইনস্টাইন কুড়ির দশকের গোড়া থেকেই সচেতন ছিলেন, যখন জার্মানিতে ইহুদী-বিরোধিতা প্রথম একটা সংগঠিত চেহারা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু প্লাঙ্ক তাঁর দেশপ্রেমের জন্যই হোক বা বার্ধক্যের

জন্যই হোক, এতটা ভাবতে পারতেন না। জার্মানির নাৎসী আন্দোলনের ক্ষমতা ও স্থায়িত্বকে তিনি খাটো করে দেখতেন। নাৎসীদের ঘৃণা করতেন, তবুও তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে নাৎসীদের আধিপত্য ক্ষণস্থায়ী। ১৯৩৩ সালের কোনো এক সময়ে স্বয়ং হিটলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারও হয়েছিল। তিনি গিয়েছিলেন ইহুদী সহকর্মী ও প্রখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী ফ্রিংস হাবের-এর* চাকরি বাঁচাবার জন্য ওকালতি করতে। কথাটা শুনেই হিটলার প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়েছিল। প্লাঙ্ক আর একটিও কথা বলতে পারেননি। তারপর থেকে প্লাঙ্ক হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন, শাসন-ব্যবস্থার বদল হবে এমন আশা পোষণ করতেন না। শুধু ভাবতেন, কি-করে যতোটা সম্ভব ভালোয় ভালোয় জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দেবেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিমান-আক্রমণে তাঁর বাড়ি ও লাইব্রেরি ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৪৪ সালের জুলাইয়ে হিটলার-বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত থাকার জন্য তাঁর ছেলে এরভিনের প্রাণদণ্ড হয়। প্লাঙ্কের বাকি জীবন কাটে গোয়েটিঙ্গেনে। সেখানে ৮৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

আইনস্টাইন ইচ্ছে করলে তখন বার্লিন ছেড়ে হল্যাণ্ডে চলে যেতে পারতেন—হল্যাণ্ডের লীডেন-এ। সেখানে থাকতেন তাঁর প্রিয় বন্ধু পাউল এরেনফেস্ট। এরেনফেস্টের জন্ম ভিয়েনায়, ১৮৮০ সালে। আইনস্টাইনকে প্রথম দেখেন প্রাগে, ১৯১২ সালে। দেখে এমন মুগ্ধ হন যে জুরিখে বদলি হবার চেষ্টা করতে থাকেন, আইনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবার জন্য। এরেন-ফেস্টের মধ্যে আইনস্টাইন পেয়েছিলেন উৎসাহী, সৎ ও কঠোর সমালোচক এক বিজ্ঞানীকে। দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

আইনস্টাইন প্রায়ই আসতেন লীডেনে, ১৯১৬ সালে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে চূড়ান্ত রূপ দেবার পরেও এসেছিলেন।

* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই রসায়নবিজ্ঞানী বিস্ফোরকের উৎপাদন বিষয়ক আবিষ্কার করেছিলেন—তারই জন্য জার্মানি লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল।

আইনস্টাইনের ইচ্ছে ছিল শুধু এরেনফেস্টের সঙ্গে নয়, লোরেনৎসের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলার। লোরেন্‌ৎস তখন ষাট পেরিয়েছেন, কাগজে-কলমে অবসরপ্রাপ্ত, কিন্তু গবেষণা থেকে ক্ষান্ত হননি। দুই বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকারের একটি অসাধারণ বিবরণ দিয়েছেন এরেনফেস্ট।

সান্ধ্য আহারের সময়ে লোরেন্‌ৎস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধরনে প্রথমেই ব্যবস্থা করলেন আইনস্টাইন যেন অনুভব করতে পারেন মানবিক সহানুভূতির উষ্ণ ও আনন্দপূর্ণ আবহাওয়ায় তিনি পরিবৃত হয়ে আছেন। তারপরে, ধীরেসুস্থে আমরা উঠে গেলাম লোরেন্‌ৎস-এর আরামপ্রদ ও সাদাসিধে পাঠঘরে। সম্মানিত অতিথির জন্য সবচেয়ে ভালো ইজিচেয়ারটি সযত্নে রাখা হল বড়ো কাজের টেবিলের ঠিক পাশটিতে। শান্তভাবে, ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে তার জন্য, অতিথিকে দেওয়া হল একটি চুরুট। আর একমাত্র তখনই স্থিরভাবে লোরেন্‌ৎস শুরু করলেন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে আলোর বক্রতা সম্পর্কিত আইনস্টাইনের তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর পরিশীলিত প্রশ্নের উপস্থাপনা। ইজিচেয়ারে আরামে বসে থাকতে থাকতে, ধূমপান করতে করতে, আর আনন্দে মাথা নাড়তে নাড়তে আইনস্টাইন শুনছেন আর এই ভেবে খুশি হয়ে উঠছেন যে তাঁর রচনাবলী অধ্যয়ন করে লোরেন্‌ৎস পুনরাবিষ্কার করেছেন সেই সব বিপুল দুরূহতা···কিন্তু লোরেন্‌ৎস যতোই কথা বলে চলেছেন আইনস্টাইন ততোই চুরুটে টান দিতে ভুলে যাচ্ছেন, ততোই তাঁর আরামকেদারায় আরো সিধে হয়ে বসছেন, আরো উন্মুখ হয়ে উঠছেন। লোরেন্‌ৎস যখন তাঁর কথা শেষ করলেন, আইনস্টাইন ঝুঁকে রয়েছেন একটুকরো কাগজের ওপরে—যে কাগজে লোরেন্‌ৎস তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কতকগুলো গাণিতিক সূত্র লিখে রেখেছিলেন। চুরুট নিভে গিয়েছে, আইনস্টাইন চিন্তান্বিতভাবে তাঁর ডান কানের ওপরে একগুচ্ছ চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছেন। অন্যদিকে লোরেন্‌ৎস কিন্তু হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন গভীর চিন্তায় সম্পূর্ণ ডুবে থাকা আইনস্টাইনের দিকে, ঠিক যেমনভাবে পিতা থাকিয়ে থাকেন তাঁর বিশেষ প্রিয় পুত্রের দিকে—এই নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে যে যে-সমস্যার জট পুত্রের হাতে দেওয়া হয়েছে তা সে খুলতে পারবে। তবে পিতার আগ্রহ রয়েছে দেখতে কেমনভাবে পুত্র এই জট খোলে। বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে যাবার পরে আইনস্টাইন উদ্ভাসিত মুখে মাথা তুললেন—তিনি জট খুলতে পেরেছেন। তারপরেও চলল কিছু দেওয়া নেওয়া, একে অপরকে বাধাদান,

কিছুটা মতানৈক্য, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার নিষ্পত্তি, সম্পূর্ণ পারস্পরিক সমঝোতা, নতুন তত্ত্বের বিচ্ছুরিত সম্পদ নিয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে উভয়ের সম্ভোগ।

এই ঘটনার বারোবছর পরে লোরেন্‌ৎস মারা যান। লোরেন্‌ৎস-এর সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন, লোরেন্‌ৎস হচ্ছেন 'আমাদের কালের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম মানুষ।' লোরেন্‌ৎস-এর প্রতিভা 'পথ রচনা করেছে ম্যাক্‌সওয়েলের কর্ম থেকে একালের পদার্থবিজ্ঞানের সিদ্ধি পর্যন্ত'। পরে লিখেছেন, 'আমার জীবনের পথে যতো মানুষের সংস্পর্শে এসেছি তাঁদের মধ্যে লোরেন্‌ৎস ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে যতোখানি তেমন আর কেউ নয়।'

১৯১৯ সালে এরেনফেস্ট একটি চিঠিতে আইনস্টাইনের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, আইনস্টাইন ইচ্ছে করলে লীডেন-এ চলে আসতে পারেন। বেতন বাবদ যা পাবেন তাতে তাঁর কোনো আর্থিক অসচ্ছলতা থাকবে না; ধরাবাঁধা কোনো কাজ নেই, যেমন খুশি গবেষণায় সময় কাটাতে পারবেন।

দিনকয়েক পরে আইনস্টাইন জবাব দিলেন, এরেনফেস্টের প্রস্তাব পেয়ে তিনি অভিভূত হয়ে গিয়েছেন। লীডেন-এ যাওয়াটা তাঁর পক্ষে আনন্দেরই হত, কিন্তু পরিস্থিতি এতটা সরল নয় যে তিনি যেমনটি চান করতে পারেন। যখন জুরিখে ছিলেন তখন একটি চিঠি পেয়েছিলেন প্লাঙ্কের কাছ থেকে। সেই চিঠি পেয়ে প্লাঙ্ককে কথা দিয়েছিলেন বার্লিন তিনি ছাড়বেন না যদি-না অবস্থা একেবারেই অসহ্য হয়ে ওঠে। বার্লিনে আর্থিক সংকট এখন চরমে, তারই মধ্যে বার্লিনে তাঁর নিজের খরচ ও জুরিখে তাঁর পরিবারের খরচ চালানো যে কী কষ্টকর তা এরেনফেস্ট কল্পনাও করতে পারবেন না। তবুও বার্লিন ছেড়ে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে এখন খুবই হীন কাজ হবে। ঠিক যে-সময়ে তাঁর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপ নিচ্ছে তখন তিনি কিছুতেই অ-প্রয়োজনে এবং অংশত বৈষয়িক সুবিধালাভের জন্য সেই মানুষদের কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারেন না যাদের কাছ থেকে পেয়েছেন এতবেশি ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব।

আইনস্টাইন বার্লিনেই থেকে গেলেন। তবে লীডেনে গ্রহণ

করলেন বিশেষ অধ্যাপনার পদ। সেজন্য বছরে কয়েক সপ্তাহ লীডেনে কাটিয়ে যেতে পারতেন।

এই চিঠিতেই খোঁজ করেছিলেন, ইংরেজদের সূর্যগ্রহণ অভিযানের কোনো খবর এরেনফেস্ট পেয়েছেন কিনা। চিঠির তারিখ ছিল ১২ সেপ্‌টেম্বর ১৯১৯। আর পক্ষকাল পরে স্বয়ং লোরেন্‌ৎসের কাছ থেকে খবর পেয়েছিলেন বাস্তব পরীক্ষাকার্যে তাঁর তত্ত্ব সমর্থিত হয়েছে।

পরীক্ষাকার্যের ফল প্রকাশিত হবার পরে আইনস্টাইন রাতারাতি বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। আর তখনই শুরু হয়ে গেল আপেক্ষিকতার তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথম সুসংগঠিত রাজনৈতিক ও ইহুদী-বিরোধী আক্রমণ।

এই সময়েই, ১৯২০ সালে, জার্মানিতে গঠিত হয় আইনস্টাইন-বিরোধী লীগ। ২৪ আগস্ট ১৯২০ তারিখে বার্লিন ফিলহার্মোনিক হলে লীগের পক্ষ থেকে যে সভা ডাকা হয়, যে-সভায় আইনস্টাইন নিজে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে স্বস্তিকা ও ইহুদী-বিরোধী পুস্তিকা প্রচার করা হয়েছিল। পুস্তিকায় তীব্র আক্রমণ ছিল আইনস্টাইন ও তাঁর রচনার বিরুদ্ধে। আইনস্টাইনের কয়েকজন সহকর্মীও তাতে সাড়া দিয়ে 'বের্লিনেয়ার টাগেব্লাট' পত্রিকায় চিঠি লেখেন। দিন কয়েক পরে আইনস্টাইন নিজেও একটি রাগী চিঠি লিখে বসেন, চিঠিটি একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আইনস্টাইনের এই কাজটি কেউ কেউ পছন্দ করেননি, বিশেষ করে এরেনফেস্ট। তিনি মনে করতেন, আইনস্টাইনের উচিত এই সমস্ত ব্যাপারকে আদপেই আমল না দেওয়া। আইনস্টাইন জার্মানি ছেড়ে চলে যান ১৯৩২ সালে, ততোদিন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে ও তাঁর কাজের বিরুদ্ধে আক্রমণের মাত্রা চড়তেই থাকে। ফিলিপ লেনার্ড সমানে বক্তৃতা ও লেখা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি বলতেন, আপেক্ষিকতা কোনো নতুন কথা নয়, আইনস্টাইন তার ওপরে শুধু রঙ ও গণিত চাপিয়েছেন। আসলে এটা অতি বিপজ্জনক ইহুদী চক্রান্ত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্ভব পুরোপুরি ভাবেই আর্য। কথা শেষ করতেন হাইল্ হিটলার বলে।

১৯৩৯ সালের মধ্যে জার্মানির বিজ্ঞান ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বড়ো বিজ্ঞানীরা সবাই—কি ইহুদী, কী অ-ইহুদী—দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রবীণদের মধ্যে দু-একজন যাঁরা থেকে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র মাক্‌স ফন লাউয়ে* খোলাখুলি নাৎসী-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও টিকে থাকতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে হাইজেনবার্গ ও ভাইৎসেকারের মতো বিজ্ঞানীরাও দরকার হলে আপোস করে চলতেন। একবার, ১৯৪৩ সালে, ফন লাউয়ে আপেক্ষিকতা সম্পর্কে সুইডেনে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতার জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল। শীর্ষস্থানীয় এই পদার্থবিজ্ঞানীকে শীর্ষস্থানীয় নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী ভাইৎসেকার উপদেশ দিয়েছিলেন এই বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে যে আপেক্ষিতার জনক হচ্ছেন দুই আর্য বিজ্ঞানী—লোরেন্‌ৎস ও পোঁয়াকারে। ফন লাউয়ে এই উপদেশ শোনেননি।

এই সময়ে বহু রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রশ্নে আইনস্টাইনের বিচার বদলে গিয়েছিল। ঘোরতর শান্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও তিনি

* মাক্‌স ফন লাউয়ে রঞ্জনরশ্মি নিয়ে কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ছাত্রজীবন শেষ হবার পরে ও ডক্টরেট লাভ করার পরে ১৯০৫ সালের শরৎকালে তিনি বার্লিনে আসেন ও প্লাঙ্কের সহকারী হন। সেই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় আইনস্টাইনের রচনা 'গতিশীল বস্তুর বিদ্যুৎ-গতিবিদ্যা বিষয়ে', যা থেকে আপেক্ষিকতার তত্ত্বের শুরু। বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার আলোচনা-সভায় প্লাঙ্ক এ-বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মাক্‌স ফন লাউয়ে সেই বক্তৃতা শোনেন, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব তাঁর খুবই ভালো লেগে যায়। তারপর থেকে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হলেই তিনি চলে যেতেন সুইজারল্যাণ্ডে এবং বার্নে আইনস্টাইনের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আসতেন। পঞ্চাশ বছর ধরে এই দুই বিজ্ঞানীর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। আইনস্টাইনের বয়স যখন উনসত্তর তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'এমন কোনো জার্মান ব্যক্তি আছেন কি যাঁর প্রতি আপনি সশ্রদ্ধ? এমন কোনো জার্মান যিনি আপনার একান্ত ব্যক্তিগত বন্ধু?' আইনস্টাইন জবাব দিয়েছিলেন, 'প্লাঙ্ককে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রকৃত কোনো জার্মানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই, মাক্‌স ফন লাউয়ে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলেন।'

ইউরোপীয় দেশগুলির উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছিলেন তারা যেন অস্ত্রসজ্জা শুরু করে। ১৯৩৩ সালে একজন ফরাসী শান্তিবাদীর কাছে লিখেছিলেন :

আমি আপনাকে যে-কথা বলব তা আপনাকে খুবই অবাক করবে। অল্প কিছুকাল আগেও আমরা ভাবতে পারতাম যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরোধেও সমরবাদের ওপরে কার্যকর আক্রমণ ঘটতে পারে। আজ আমাদের সামনে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি। ইউরোপের মধ্যস্থলে রয়েছে এক শক্তি - জার্মানি — যে স্পষ্টতই সম্ভাব্য সকল উপায়ে যুদ্ধের দিকে তেড়ে অগ্রসর হচ্ছে…একবার ভাবুন, আজকের জার্মানি বেলজিয়াম দখল করেছে! …আমি যদি বেলজিয়ান হতাম তাহলে এই পরিস্থিতিতে সৈন্যদলে যোগ দিতে অস্বীকার করতাম না। বরং আনন্দের সঙ্গেই যোগ দিতাম এই বিশ্বাস নিয়ে যে সৈন্যদলে যোগ দিয়ে আমি ইউরোপীয় সভ্যতাকে বাঁচাতে সাহায্য করছি।

আইনস্টাইন মনেপ্রাণে আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন। কিন্তু জার্মানিতে, বিশেষ করে ১৯৩৩ সালের পরে, ইহুদীদের ওপরে যে নির্যাতন চলছিল তাই দেখে তাঁর আপনজন এই ইহুদীদের প্রতি তাঁর টান বেড়েছিল। ইহুদীদের সাহায্য করার জন্য চ্যারিটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, বিদেশে সফর করেছিলেন ও আরো নানাভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত প্রকাশ্যেই জিওনিজমের* সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন। জিওনিজমের আন্দোলনকে মনে করতেন ইউরোপের ইহুদীদের টিকে থাকার পথ ও আশা। আইনস্টাইন জিওনিস্ট ছিলেন সাধারণ মানবতাবাদী কারণে, জাতীয়তাবাদী কারণে মোটেই নয়। তাঁর ধারণা হয়েছিল, ইউরোপে ইহুদী-সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে জিওনিজম। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আগেও তাঁর এই ধারণা হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে

* ইহুদীদের জন্য জাতীয় সুযোগসুবিধা এবং নিজস্ব অঞ্চল (বিশেষ করে প্যালেস্টাইন) আদায় করার আন্দোলনকে বলা হয় জিওনিজম, আর এই আন্দোলনের সমর্থককে জিওনিস্ট।

তো বটেই। এই মনোভাব নিয়ে কিছুটা সময়ের জন্য তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্যালেস্টাইনে ইহুদী ও আরবদের বিবাদের জন্য ব্রিটিশরাই বহুলাংশে দায়ী। তেমনি বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট না থাকলে ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো গণ্ডগোল হত না।

ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রতিও আইনস্টাইন সহানুভূতিশীল ছিলেন। নিজের উইলে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে মার্গোট আইনস্টাইন (সৎ-কন্যা) ও হেলেন ডুকাসের (সেক্রেটারি ও গৃহকর্ত্রী) মৃত্যুর পরে তাঁর ব্যক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক কাগজপত্র যেন ইজরাইলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৫২ সালে ইজরাইলের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ডঃ ভাইৎসমান মারা যান। তখন ওয়াশিংটনে ইজরাইলের রাষ্ট্রদূত আইনস্টাইনের কাছে খোঁজ করতে আসেন তিনি ইজরাইলের প্রেসিডেণ্ট হতে রাজী আছেন কিনা। আইনস্টাইন রাজী হননি। প্রেসিডেণ্ট পদের জাঁকজমক, আনুষ্ঠিকতা ও আদবকায়দা মেনে চলার মতো মানুষ আইনস্টাইন আদপেই ছিলেন না। তাছাড়া তাঁর গবেষণার কাজেও বিঘ্ন ঘটত।

ঈশ্বরের পাশা

এই শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে পদার্থবিদ্যার চিন্তায় সমগ্র বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা ছিল আইনস্টাইনের। এই সময়ে আপেক্ষিকতা আবিষ্কার অবশ্যই তাঁর যুগান্তকারী কাজ। তা ছাড়া অন্য যা-কিছু করেছিলেন তাও যুগান্তকারী। তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন (১৯২১) বিকিরণের কোয়ান্টাম্ তত্ত্বের জন্য। সেখানে আপেক্ষিকতার তত্ত্বে তাঁর বিপুল অবদানের বিষয়টি যদি বিবেচিত নাও হয়ে থাকে তাহলেও এই স্বীকৃতি যথার্থ ছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে পদার্থবিদ্যার চিন্তাকে তিনি নতুন রূপ দিয়েছিলেন—

১৯০০ সালের সনাতন পদার্থবিদ্যার পরিণতি থেকে ১৯২৫ সালের কোয়ান্টাম্ বলবিদ্যার সূচনায়। পদার্থবিজ্ঞানীরা যে-কারণে সম্ভাব্যতার ভাষায় ভাবতে শুরু করেছিলেন তা বহুলাংশে তাঁরই সৃষ্টি। তার কৃতিত্ব অন্য সকলের চেয়ে তাঁরই সবচেয়ে বেশি প্রাপ্য।

কাজটি তিনি শুরু করেছিলেন গোড়ার দিকে তাপ-গতিবিদ্যা বিষয়ক গবেষণায়, তারপরে ১৯০৫ সালের দুই বিরাট রচনায়—একটি ব্রাউনীয় বিচলন সম্পর্কে, অপরটি বিকিরণ সম্পর্কে। দ্বিতীয়টি ছিল বিকিরণ সম্পর্কে তাঁর প্রথম রচনা এবং এই রচনাতেই উপস্থিত করেছিলেন আলোর কোয়ান্টা বা ফোটোন সম্পর্কিত ধারণা। তারপর বিকিরণ সম্পর্কে আরো বড়ো রচনা উপস্থিত করেন ১৯১৭ সালে, যাকে বলা হয় বিকিরণের কোয়ান্টাম্ তত্ত্ব।

এই রচনায় যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা আজও প্রচলিত—প্রায় সেই একই আকারে। অনেকেরই হয়তো জানা নেই আইনস্টাইন এই পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তক। উল্লিখিত রচনায় আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন কোয়ান্টামের দুই অবস্থার মধ্যে রূপান্তরণের সম্ভাব্যতা কতখানি। তারপর থেকে কোয়ান্টাম্ তত্ত্বের অস্তিত্বই ছিল এই সম্ভাব্যতার বিচার করার জন্য।

১৯১৭ সালের এই রচনায় আইনস্টাইন বিশেষ করে আরো একটি প্রক্রিয়ার বিষয়ে বলেছিলেন যার নাম উদ্দীপিত নিঃসরণ। এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেই পাওয়া যায়, যাকে বলা হয় মেসার (micro-wave amplification of stimulated emission of radiation)। এই মেসার বা লেসার আলোর বিশেষ গুণ এই যে এটি চলে ঠিক একটি ফলকের আকারে—অন্য আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে না। এমনকি পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে পাঠালেও ঠিক সেই ফলকের আকারেই চাঁদের গায়ে পড়ে, সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার সেই ফলকের আকারেই পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই আলোর সাহায্যে হীরকের মধ্যেও সরু সুতোর মতো ফুটো করা সম্ভব হয়েছে। বাষট্টি বছর আগে প্রকাশিত আইনস্টাইনের রচনার মধ্যেই এই অসাধারণ আলোর বিষয়টি নিহিত ছিল। আইনস্টাইনের

রচনায় সম্ভবত এমন বহু সম্পদ নিহিত আছে যার সন্ধান এখনো ধরা পড়েনি।

কুড়ির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আইনস্টাইন কোয়ান্টাম তত্ত্বে মৌল অবদান রেখেছিলেন। এমন কথাও বলা চলে যে বস্তুকে তরঙ্গ হিসেবে ভাবনার ভিত্তি তিনিই স্থাপন করে গিয়েছেন। তাঁর ১৯২৪ সালের রচনা বিচার করলে এই কথাই বলতে হয়। এমন কথাও বলা চলে, তারপর থেকে কোয়ান্টাম তত্ত্বে যা-কিছু ঘটেছে সবই আইনস্টাইনের শ্রমের ফসল। কিন্তু ১৯২৫ সালের পরে যখন হাইজেনবার্গ, পাউলি, বর্ন, বোর, ডিরাক, শ্রোয়েডিঙ্গার ও অন্যান্য বিজ্ঞানীর হাতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠল তখনই আইনস্টাইন তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। আইনস্টাইনের বিরোধিতা সঠিক কিনা তা ভবিষ্যতের পদার্থবিজ্ঞানীরাই বলতে পারবেন।

কুড়ির দশকে আইনস্টাইনের বিরাট কাজের বিষয় ছিল গ্যাসের কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান—যাকে এখন বলা হয় বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান। ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইংরেজিতে লেখা ছোট একটি নিবন্ধ পাঠিয়েছিলেন আইনস্টাইনের কাছে—'প্লাঙ্ক সূত্র ও কোয়ান্টাম প্রকল্প'। প্রবন্ধটি পড়ে আইনস্টাইন মুগ্ধ হলেন। নিজেই সেটি জার্মানভাষায় অনুবাদ করে পাঠিয়ে দিলেন পদার্থবিদ্যার সম্ভ্রান্ত জার্মান পত্রিকা 'ৎসাইট্-শ্রিফ্ট ফ্যুর ফিজিক'-এ। সঙ্গে মন্তব্য জুড়ে দিলেন, 'আমার মতে আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটি জটিল সমস্যার এ এক মূল্যবান যোজনা।' ঘটনাটি অসাধারণ—স্বয়ং আইনস্টাইন একটি নিবন্ধ অনুবাদ করছেন এবং মন্তব্য সহ সেটি প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছেন!

সত্যেন্দ্রনাথ বসু আবিষ্কার করেছিলেন কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান সম্পন্ন করার নতুন এক পদ্ধতি। এবং সেটি প্রয়োগ করেছিলেন প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্রের নতুন এক সংজ্ঞা দেবার জন্য। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন এই পদ্ধতি সাধারণ গ্যাসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলে। তবে তাই যদি করা হয় তাহলে তা থেকে অন্য একটি অর্থও দাঁড়িয়ে যেতে পারে—পরিসংখ্যানের দিক থেকে সেই সাধারণ

গ্যাসের কণিকাগুলোর আচরণ হয়ে ওঠা উচিত আলোর কোয়ান্টার মতো—অতএব তরঙ্গের লক্ষণবিশিষ্ট।

আইনস্টাইন যখন এই সমস্ত হিসেব করছিলেন তখনই তাঁর হাতে দ্য ব্রগলীর ডক্টরেট নিবন্ধের একটি কপি আসে। অন্য কারণ দেখিয়ে দ্য ব্রগলীও একই ধারণায় পৌঁছেছিলেন এবং আইনস্টাইনের মতে, 'বিশাল আচ্ছাদনের একটি কোণ তুলে ধরেছিলেন'। ১৯২৫ সালের মধ্যেই আইনস্টাইন এই তত্ত্বে অনেকখানি আস্থাশীল হয়ে উঠতে পারলেন এবং স্পষ্টই লিখলেন, 'গ্যাসের অণুর একটি ফলক যদি একটি ফুটোর মধ্যে দিয়ে পার হয় তাহলে ব্যবর্তন (diffraction) ঘটে, যেমন ঘটে আলোর রশ্মির বেলায়।'* তাই যে ঘটে ১৯২৭ সালে তার প্রমাণ পাওয়া গেল সি জে ডেভিসন ও এল এইচ জার্মারের পরীক্ষাকার্যে এবং জি পি টমসনের পরীক্ষাকার্যে। তার মানে, স্বীকার করতে হয়, যেমন আলোর মধ্যে তেমনি ইলেকট্রনের মতো কণিকার মধ্যেও প্রকাশ পাচ্ছে তরঙ্গের ও কণিকার লক্ষণ।

১৯২৫ সালে শ্রোয়েডিঙ্গার ও হাইজেনবার্গ তাঁদের তত্ত্ব উপস্থিত করলেন এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দিকে বড়োরকমের পা ফেললেন। প্রথমে মনে হয়েছিল দুটি বুঝি আলাদা তত্ত্ব, কিন্তু শ্রোয়েডিঙ্গার প্রমাণ করলেন গণিতের দিক থেকে তারা অভিন্ন। তিনি সেই সমীকরণ আবিষ্কার করলেন যা দিয়ে দ্য ব্রগলীর তরঙ্গের আচরণ ব্যাখ্যা করা চলে। এই আবিষ্কারের জন্য আইনস্টাইন শ্রোয়েডিঙ্গারকে অভিনন্দন জানালেন।

তারপরে এগিয়ে এলেন বর্ন ও তাঁর এক সহকর্মী। তাঁরা

* দ্য ব্রগলী পরে লিখেছেন, 'বৈজ্ঞানিক জগৎ সে-সময়ে আইনস্টাইনের প্রত্যেকটি কথার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। আইনস্টাইন তখন ছিলেন খ্যাতির শীর্ষে। তরঙ্গ-প্রকরণের ওপরে জোর দিয়ে তার বিকাশকেই ত্বরান্বিত করতে এই খ্যাতকীর্তি বিজ্ঞানী বড়ো রকমের কাজ করলেন। তাঁর নিবন্ধটি না থাকলে আমার তত্ত্বটির স্বীকৃতি লাভ করতে হয়তো আরো অনেক দেরি হয়ে যেত।'

দেখাতে চাইলেন দ্ব্যর্থবাচকতা তরঙ্গের চলার পথের চেহারাটি কেমন দাঁড়াতে পারে। সনাতন পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুসারে চেহারাটি হওয়া উচিত ট্র্যাজেক্টরির। বর্ন ও তার সহযোগী বললেন, তা নয়, চেহারাটি ঠিক কেমন দাঁড়ায় তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়, হিসেব করা যেতে পারে বড়ো জোর তার সম্ভাব্যতা—তার বেশি কিছু নয়। এই বক্তব্যকে আইনস্টাইন ও শ্রোয়েডিঙ্গার দুজনেই অগ্রাহ্য করলেন।

বর্ন ও তাঁর সহকর্মীর বক্তব্যকে আরো একটু স্পষ্ট করা যাক। আমরা জানি, সরু ছিদ্র পার হয়ে আলোর একটি রশ্মি যদি উলটো-দিকের পর্দার ওপরে এসে পড়ে তাহলে আলোর ব্যতিচার (interference) ঘটে এবং তার দরুন পর্দার ওপরে বাবর্তনের একটি প্যাটার্ন ফুটে ওঠে। এখানে অনিশ্চয়তা কিছু নেই, নির্দিষ্টভাবেই বলে দেওয়া চলে কী ঘটতে চলেছে। এবারে একের পর এক আলোর কোয়ান্টাম সেই ছিদ্র পার হয়ে পর্দার ওপরে এসে পড়ুক। এবারে কিন্তু আর নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয় আলোর পৃথক পৃথক কোয়ান্টাম ছিদ্র পার হবার পরে ঠিক কেমন আচরণ করবে, পর্দার কোন্ জায়গায় ঘা দেবে। অর্থাৎ, নিউটন থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত যে কড়াকড়ি নির্ধারণীয়তা বজায় ছিল তা এবারে বর্জন করতে হল। আইনস্টাইন তা স্বীকার করলেন না, বললেন, 'ঈশ্বর এই জগৎকে নিয়ে পাশা খেলেন না।'

তারপরে এগিয়ে এলেন হাইজেনবার্গ ও বোর (কোপেনহেগেনে নীল্‌স বোরের ইনস্টিটিউটে প্রায়ই অতিথি হয়ে যেতেন হাইজেনবার্গ)। তাঁরা বললেন, কণিকা-তরঙ্গ দ্বৈত চরিত্র শুধু পারমাণবিক পদার্থ-বিদ্যার লক্ষণ নয়, প্রকৃতিজগতেরই মূলগত ব্যাপার। সেটা বোঝা যায় যদি পরমাণুর ভিতরকার মাপজোখ নেবার চেষ্টা হয় ও তার অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়। হাইজেনবার্গ এই অর্থকেই ধরতে চাইলেন তাঁর 'অনিশ্চয়তার নীতির' মধ্যে। ধরা যাক, পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের অবস্থান নির্ধারণের চেষ্টা হচ্ছে। সেটা ব্যর্থ হতে বাধ্য এই কারণে যে তার ফলে ইলেকট্রনকে ঠেলে বার করে দেওয়া হবে। কাজেই পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের কক্ষ বলে কোনো

কিছুর ধারণা করতে যাওয়াটা অর্থহীন। ধারণা হতে পারে বড়ো জোর পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনের অবস্থানের সম্ভাব্যতা নিয়ে।

অনিশ্চয়তার নিয়মকে আইনস্টাইন গোড়া থেকেই বর্জন করলেন। শুধু বর্জন করেই ক্ষান্ত থাকলেন না, এই নিয়মের ভিতরকার নিয়মকে খুঁজে বার করতে লাগলেন। বোরও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনিও পাল্টা জবাব দিয়ে চললেন। অবস্থা দেখে মনে হতে লাগল, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই বোর ভাবতে বসেন আইনস্টাইনের কোন কথার জবাবে তিনি কী বলেছেন, ভবিষ্যতে আইনস্টাইন আর কী বলতে পারেন, জবাবে তিনি আর কী বলবেন।

১৯২৭ সালের পঞ্চম সোল্‌ভে কংগ্রেসে ও ১৯৩০ সালের ষষ্ঠ সোল্‌ভে কংগ্রেসে অন্য সমস্ত আলোচনা ছাপিয়ে এই আলোচনাই প্রাধান্য পেল—কণিকা, না, তরঙ্গ? একটি কণিকার সঠিক অবস্থান কি নির্ধারণ করা সম্ভব? বা, বিশেষ একটি মুহূর্তে সেই কণিকার শক্তি?

১৯৩০ সালের কংগ্রেসে আইনস্টাইন একটি কাল্পনিক পরীক্ষা-কার্যের প্রস্তাব করলেন। মনে করা যাক, আয়না-বসানো একটি বাক্‌সের মধ্যে আলো আবদ্ধ রয়েছে। বাক্‌সটির ওজন নেওয়া হল। তারপরে সময়-নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়-ভাবে একটি ফোটোন বাক্‌স থেকে মুক্ত করা হল। এখন যদি আরেক বার বাক্‌সটির ওজন নেওয়া হয় তাহলে জানা যায় মুক্ত-ফোটোনের ভর। আর ভর জানা গেলেই আইনস্টাইনের সূত্র অনুসারে তা থেকে শক্তি। অর্থাৎ, অনিশ্চয়তা বলে কিছু থাকছে না। নীল্‌স বোর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না, সারা রাত অস্থিরভাবে শুধু ভাবলেন। অবশেষে ধরতে পারলেন, জবাব রয়েছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বেই। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে ঘড়ি আস্তে চলে—অতএব সেই অনিশ্চয়তাই এসে যাচ্ছে।

তিরিশবছর ধরে এই বিতর্ক চলেছিল—প্রায় দুই দৈত্যের লড়াই চলার মতো। কোনো পক্ষই এতটুকু টলেননি। নীল্‌স বোর

এমনকি আইনস্টাইনের মৃত্যুর পরেও এই লড়াই .চালিয়ে গিয়েছেন।*

১৯৪৮ সালে মাক্স বর্ন লিখেছেন, 'পদার্থবিদ্যার সূত্রের পরিসংখ্যানগত পটভূমিটি তিনি (আইনস্টাইন) পূর্বগামীদের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। কোয়ান্টাম ব্যাপারের ঊষরতা জয় করার সংগ্রামে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তবুও, পরবর্তীকালে, যখন তাঁর কাজ থেকে বেরিয়ে এল পরিসংখ্যানগত ও কোয়ান্টাম নিয়মের সংশ্লেষণ, যা প্রায় সকল পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে গ্রহণীয় মনে হল, তখনই তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন ও সন্দেহবাদী হয়ে উঠলেন। আমরা অনেকেই এ-ঘটনাকে ট্র্যাজেডি বলে মনে করি—ট্র্যাজেডি তাঁর পক্ষে যিনি একা-একা পথ হাতড়াচ্ছেন, ট্র্যাজেডি আমাদের পক্ষে যারা আমাদের নেতা ও পতাকাবাহককে হারিয়েছি।'

তার আগে আইনস্টাইনের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন বর্ন, চিঠিতে লেখা—'বৈজ্ঞানিক প্রত্যাশার দিক থেকে আমরা রয়েছি দুই বিপরীত মেরুতে। আপনার বিশ্বাস পাশা খেলেন যিনি সেই ঈশ্বরে, আমার বিশ্বাস প্রকৃত বস্তু হিসেবে অস্তিত্বশীল জিনিসের জগতের নিখুঁত নিয়মে—যা আমি আয়ত্ত করতে চেষ্টা করি দুরন্ত কাল্পনিক উপায়ে।'

* এরেনফেস্ট দুজনকেই ভালোভাবে চিনতেন—আইনস্টাইন ও নীল্‌স বোর। সামনে বসে দুজনের আলোচনা ও বিতর্ক বহুবার শুনেছেন। কিন্তু নিজে কিছুতেই ঠিক করতে পারতেন না কে ঠিক। এই নিয়ে মনে মনে খুবই কষ্ট পেতেন। অনেকের ধারণা, ১৯৩৩ সালে এই কারণেই এরেনফেস্ট আত্মহত্যা করেন।

মধ্য জীবন

১৯১৯ সালের সূর্যগ্রহণের সময়ে ব্রিটিশ অভিযান থেকে যখন জানা গেল তারার আলো সূর্যের মহাকর্ষে সত্যিই বেঁকে যায় তখন প্রায় রাতারাতি আইনস্টাইন বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করলেন। বিজ্ঞানে যিনি বিপ্লব ঘটিয়েছেন, সেই মানুষটিকে একবার দেখার জন্য লোকের সে কী আগ্রহ। সাংবাদিকরা ভিড় করে আসতে থাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে, তাঁর কাহিনী শুনতে। যেখানেই তিনি বক্তৃতা করতে যান হলঘরে তিলধারণের স্থান থাকে না, যদিও তাঁর বক্তৃতার বিষয়—অর্থাৎ, আপেক্ষিকতা—সবাই বুঝতে পারে এমন কথা বলা চলে না।* আপেক্ষিকতার অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য শত শত বই লেখা হল। প্যারিসে ইউজিন হিগিন্স নামে একজন আমেরিকান

* বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড বলতেন, বৈজ্ঞানিক কোনো আবিষ্কার যদি-না পানশালার পরিচারিকার কাছে বোধগম্য করে তোলা যায় তাহলে সেই আবিষ্কারের কোনো গুণ নেই। আইনস্টাইনের বেলায় এই উক্তি খাটে না। তিনি যখন আপেক্ষিকতা ব্যাখ্যা করতেন তখন, সাধারণ মানুষ দূরের কথা, পুরোদস্তুর বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত কিছুই বুঝতে না পেরে খেপে যেতেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এইচ লেভি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ১৯১২ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত লেভি ছিলেন গোয়েটিঙ্গেনে গবেষক ছাত্র। গোয়েটিঙ্গেন তখন বিপুল বৈজ্ঞানিক তৎপরতার কেন্দ্র—ক্লাইন, হিলবার্ট, মাক্স বর্ন্ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা সেখানে আছেন। এমনি সময়ে আইনস্টাইন গোয়েটিঙ্গেনে এলেন আপেক্ষিকতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতায় অবশ্যই তাঁকে উল্লেখ করতে হল স্পেস-সময়, স্পেস-সময়ের জ্যামিতি, স্পেস-সময়ের বক্রতা, স্পেস-সময় ও জিওডেসিকে মহাকর্ষের ব্যাখ্যা ইত্যাদি। এসব কথা শুনে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপকরা একেবারে আঁতকে উঠলেন। একজন তো হল-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময়ে বলতে বলতে গেলেন, 'ডাস ইস্ট আব জোলুট ব্লোয়েড্ জিন' (এসব কথা একেবারেই গাঁজাখুরি)।

'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকার মারফৎ পাঁচহাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করলেন। তিনহাজার শব্দের মধ্যে যিনি আপেক্ষিকতার সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, পুরস্কারটি তাঁর প্রাপ্য। আইনস্টাইন বললেন, 'গোটা বন্ধুমহলে একমাত্র আমিই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিইনি। আমি পারব বলে মনে হয় না।' (পুরস্কারটি পেয়েছিলেন ব্রিটিশ পেটেন্ট অফিসের সিনিয়র পরীক্ষক লিনডন বটন।)

আইনস্টাইন যে খ্যাতি পেয়েছিলেন তার কোনো তুলনা নেই। কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষে এমন খ্যাতি অভাবনীয়, এমনকি কোনো অভিনেতা বা খেলোয়াড় বা মুষ্টিযোদ্ধার পক্ষেও এমন স্থায়ী খ্যাতি অকল্পনীয়।

আইনস্টাইন কিন্তু কোনোদিন খ্যাতি আশা করেননি, খ্যাতি চাননি। এই খ্যাতির জন্য তাঁর শান্তি বিঘ্নিত হত। তিনি বলতেন, 'সবচেয়ে সাধারণ একজন শ্রমিককে আমার হিংসে হয়, সেও আড়াল রাখতে পারে।' ইনফেল্ড লিখছেন, 'আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে খ্যাতি যতোটা অনভিপ্রেত ও অর্থহীন এমন আর কারও ক্ষেত্রে নয়।'

খ্যাতিকে ঠেকানো শক্ত, খ্যাতিতে প্রভাবান্বিত না হওয়া আরো শক্ত। কিন্তু আইনস্টাইনের বেলায় কোনোটাই ঠিক নয়। খ্যাতি আইনস্টাইনকে স্পর্শ করত না। খ্যাতিতে তিনি নির্বিকার ছিলেন। কারণ খুঁজতে গেলে বলতে হয় মানুষটির ভিতরে ছিল বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব। খ্যাতি নিয়ে তিনি ভাবনা করতেন যখন খ্যাতি তাঁর জীবনে ঘা দিত। একাকী হয়ে গেলেই খ্যাতির কথা ভুলে যেতেন।

আসলে বিজ্ঞানী হিসেবেও আইনস্টাইন ছিলেন নিঃসঙ্গ ও একাকী। ১৯৩৩ সালে লণ্ডনের আলবার্ট হলে শরণার্থী জার্মান বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, লাইটহাউসের কীপারের কাজটি বিজ্ঞানীর পক্ষে বেশ উপযোগী। কারণ, কাজটি সহজ এবং তার ফলে চিন্তা করার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায়।

আইনস্টাইন কোনোদিন লাইটহাউসের কীপারের কাজ করেন নি। আর তিনি এদিক থেকে ভাগ্যবান যে রোজকার রুটির জন্য

তাঁকে লড়াই করতে হয়নি। বার্নের পেটেণ্ট অফিসে তিনি আনন্দেই ছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ ও মানবিক পরিবেশে। বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য সেখানে প্রচুর সময় পেয়েছিলেন।

শরণার্থী জার্মান বিজ্ঞানীদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা পড়িয়ে টাকা আয় করার চেয়ে তিনি বরং জুতো সেলাই করে বা কোনো একটা হাতের কাজ করে রুটির সংস্থান করবেন। পদার্থবিদ্যা হয়ে থাকবে তাঁর নেশা। এই মনোভাবের মধ্যে একটা ধর্মীয় অনুভূতি এসে যাচ্ছে, সাধুসন্তদের মধ্যে যা থাকে। এই হচ্ছে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের চরিত্র।

দৃষ্টান্ত হিসেবে আইনস্টাইন অসাধারণ। তাঁর বিচ্ছিন্নতা তাঁর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। ধরাবাঁধা পথে তাঁর চিন্তা ধাবিত হয়নি। তাঁর একাকীত্ব, নিজের তৈরি করা সমস্যা নিয়ে স্বাধীন চিন্তা, ভিড়ের সঙ্গে না চলা—এই ছিল তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। বিপুল খ্যাতির সময়ে তাঁকে ঘিরে কোলাহল হত, কিন্তু তিনি ছিলেন এতই নির্লিপ্ত ও তন্ময়নস্ক যে তাঁর মনের একাগ্রতা ক্ষুণ্ণ হত না।

আইনস্টাইন তাঁর 'অবিচুয়ারিতেও' নোবেল পুরস্কার পাওয়ার উল্লেখ করেননি। কারণ, এই একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতা। নোবেল পুরস্কার নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র মানসিক আলোড়ন ছিল না। ইন্‌ফেল্‌ড লিখেছেন, আইনস্টাইন যেদিন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনেছিলেন সেদিন রাতে যদি ঘুমোতে না পেরে থাকেন সেটা এই কারণে যে কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে ভাবছিলেন। সম্ভবত নোবেল পুরস্কারের পদকটিও তিনি ভালো করে দেখেননি।*

* বিশ্বের গণিতবিদ ও বিজ্ঞানীদের দানে পুষ্ট তহবিল থেকে মাক্স্ প্লাঙ্কের নামে বিশেষ একটি পদক দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আইনস্টাইনই প্রথম এই পদকটি পেলেন। বিকেল পাঁচটার সময়ে ইন্‌স্টিটিউট অব ফিজিক্স্-এর একটি অনুষ্ঠানে পদকটি দেবার কথা। সেদিন আইনস্টাইন সকালবেলা নিজের ঘরে বসে কিছু কাজ করলেন, দুপুরবেলা খেতে গেলেন ডাঃ ইয়ানোস প্লেশের (আইনস্টাইনের চিকিৎসক) বাড়িতে, কারণতার তত্ত্বের সংকট নিয়ে কিছু

বিপুল খ্যাতি নিয়ে আইনস্টাইন প্রায় এক কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে উঠলেন। তাঁর সম্পর্কে কত-যে গল্প কত-যে কাহিনী মুখে মুখে ফিরতে লাগল তার শেষ নেই। আইনস্টাইন একবার নিজের কাজ নিয়ে ডুবে থাকার সময়ে একটি চেক দিয়ে বইয়ের পৃষ্ঠা চিহ্নিত করেছিলেন। এ থেকে এই গল্প অবশ্যই চালু হতে পারে যে আইনস্টাইন দেড়হাজার ডলারের একটি চেক বইয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন আর সেই বইটি হারিয়েছেন। প্রতিবেশীর ছোট একটি মেয়ে একবার আইনস্টাইনের কাছে এসেছিল অঙ্ক কষিয়ে নেবার জন্য। তারপর থেকে গল্প শোনা যেতে লাগল যে আইনস্টাইন সারা বিশ্বের বাচ্চা মেয়েদের অঙ্ক কষে দিচ্ছেন। গোড়ার সেই মেয়েটিকেও আইনস্টাইন কিন্তু অঙ্ক কষে দেননি, বলেছিলেন এটা ঠিক নয়। বাস্তবে যাচাই করতে গেলে এমনি অনেক গল্পই মারা পড়ে। আসলে গল্পগুলোতে প্রকাশ পাচ্ছে আইনস্টাইন মানুষটির পরিচয় নয়, আইনস্টাইন মানুষটির কেমন হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে বিশ্বজগতের ধারণা। আইনস্টাইন ছিলেন স্বভাবতই বিনীত ও নম্র। তাই গল্পের আইনস্টাইন একটি মেয়ের মুখে যখন শোনেন— 'আপনি এখনো পদার্থবিদ্যা পড়ছেন! আমি তো সেই পঁচিশ বছর

আলোচনা করলেন, তারপরে বিকেল চারটে পর্যন্ত ঘুমোলেন। ঘুম থেকে উঠে টেবিলের সামনে বসতেই হাতের সামনে পেয়ে গেলেন একটা জুতোর দোকানের রসিদ। সেই কাগজেরই উল্টো পিঠে কুড়ি মিনিট ধরে কিছু লিখলেন, তারপরে সভায় গিয়ে হাজির হলেন। জনাকীর্ণ সভাগৃহে যথারীতি মাক্স্ প্লাঙ্ক মঞ্চে আসীন ছিলেন, যথারীতি কিছু বক্তৃতা হল, তারপরে পদকটি তুলে দেওয়া হল আইনস্টাইনের হাতে। আইনস্টাইন বললেন, 'আমি জানতাম এমনি এক সম্মান লাভ করলে আমি খুবই বিচলিত হব। তাই আপনাদের ধন্যবাদ জানাবার জন্য আমার বক্তব্য লিখে এনেছি।' তারপর পকেট থেকে সেই জুতোর দোকানের রসিদ বার করে কারণতার নীতি সম্পর্কে পড়ে গেলেন। সভার শেষে ডাঃ প্লেশ তাঁর জুতোর রসিদ ফেরৎ চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইন সেই রসিদ তো ফেরৎ দিলেনই, সেই সঙ্গে দিয়ে দিলেন প্লাঙ্কের মূর্তি বসানো নিরেট সোনার পদকটিও। আর কোনোদিনই তিনি সেই পদকটির দিকে ফিরে তাকাননি।

বয়সেই পদার্থবিদ্যার পড়া শেষ করেছি'—তখন বিনাবাক্যে মন্তব্যটি হজম করেন। গল্পের আইনস্টাইন বৃন্দবাদ্যের আসরে তালে ভুল করেন এবং তাঁকে ধমক শুনতে হয় 'আইনস্টাইন, তুমি কি এক-দুই গুণতেও শেখোনি?' গল্পের আইনস্টাইন হোটেলে গিয়ে চশমা খুঁজে পান না, তখন তিনি পরিচারককে অনুরোধ করেন খাদ্যের তালিকাটি পড়ে শোনাতে আর পরিচারক বলে 'আমাকে মাপ করবেন স্যার, আমিও লেখাপড়া শিখিনি।' গল্পের আইনস্টাইন উচ্চপদস্থ সরকারী মহলে অজানা অচেনা থেকে যান, ভিড়ের মধ্যে চ্যাপলিনসদৃশ একটি মানুষের মতো আলুথালু চলাফেরা করেন। গল্পের আইনস্টাইন মনুষ্যোচিত সমস্ত গুণের অধিকারী, বিশ্ব-নাগরিক, ঋষি-বিজ্ঞানী—তাঁর কাছ থেকে মানুষ আশা করে শুধুই গবেষণা নয়, সত্যের প্রকাশও।

বিপুল খ্যাতি নিয়ে অনেক সময় মজাও করতেন। কেউ হয়তো তাঁকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছে তিনি কী করেন, অমনি মনে পড়ে কতজন তাঁর ছবি আঁকতে চেয়েছে, তিনি জবাব দেন, 'আমি হচ্ছি শিল্পীর মডেল।'

বিপুল খ্যাতি আইনস্টাইনকে অন্য মানুষ করে তুলল। তিনি হয়ে উঠলেন সৌম্য, বিনম্র, কিছুটা বেখাপ্পা, কিছুটা ঋষিতুল্য। লোকের মুখে মুখে তাঁর নাম। ফলে আইনস্টাইন হয়ে উঠলেন অতিমাত্রায় দায়িত্বশীলও। সবাই তাঁর কথা শুনছে, কাজেই যা যথাথ তার পক্ষ নিয়ে তাঁকে কথা বলতেই হবে। যা তিনি ভালো মনে করতেন তাতেই নিজের নাম বসাতে প্রস্তুত ছিলেন। এত বেশিবার কাজটি করেছিলেন যে হিতে বিপরীত হয়েছিল। ত্রিশের দশকে এতবেশি বিদেশী ছাত্র আইনস্টাইনের সুপারিশ পত্র নিয়ে ইংলণ্ডে এসেছিল যে তাদের ভালোর জন্যই উপদেশ দেওয়া হত, আইনস্টাইনের সুপারিশ-পত্র তারা যেন চেপে যায়।*

* লিওপোল্ড ইন্‌ফেল্‌ডের সঙ্গে আইনস্টাইনের প্রথম দেখা হয় ১৯২০ সালে। ইন্‌ফেল্‌ড তখন ক্রাকাউ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তাঁর ইচ্ছে বার্লিনে এসে প্লাঙ্ক, লাউয়ে ও আইনস্টাইনের অধীনে পড়াশুনো

১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি ইংলণ্ডে সফর করতে এলেন। এই সফরের ফল কী হবে তা নিয়ে অনেকেরই আশঙ্কা ছিল। ইংলণ্ডে তখন 'জার্মান' শব্দটাই ছিল গালাগালির সামিল। জার্মান কুকুরকে পর্যন্ত মেরে ফেলা হয়েছিল। প্রথম প্রকাশ্য সভায় আইনস্টাইন বক্তৃতা দিলেন মানচেস্টারে। আর সেই প্রথম সভা থেকেই বোঝা গেল আইনস্টাইনের সফর সাফল্যমণ্ডিত হতে চলেছে। বিনম্র শান্ত স্বরে তিনি বিশ্বের রহস্য ব্যাখ্যা করলেন আর সহজেই শ্রোতাদের মন জয় করে নিলেন। আইনস্টাইনের এই সফর ব্রিটেন ও জার্মানির সম্পর্ক উন্নত করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করল।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানের বছরগুলিতে আইনস্টাইন ব্যাপকভাবে সফর করেছিলেন—জাপানে, আমেরিকায় ও পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশে। এই সমস্ত সফরের প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা ও আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সম্পর্কে

করেন। কিন্তু পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের পক্ষে, বিশেষ করে ইহুদীদের পক্ষে বার্লিনে পড়াশুনো করতে আসা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ইনফেলড তখন সাহস সঞ্চয় করে সরাসরি আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করলেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিতে গিয়ে ইনফেলড লিখছেন,

'সবশ্রেষ্ঠ জীবিত পদার্থবিজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, এই উল্লসিত আশা নিয়ে দুরু দুরু বুকে, গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমি হাবেরল্যাণ্ড-স্ট্রাসে-তে আইনস্টাইনের ফ্ল্যাটে বেল টিপলাম। ভারী আসবাবে ভর্তি অপেক্ষা করার ঘরে আমাকে বসানো হল। শ্রীমতী আইনস্টাইনকে জানালাম আমি কেন এসেছি। তিনি আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন, আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, কেননা চীনের শিক্ষামন্ত্রী এই মুহূর্তে তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, উত্তেজনায় আমার গাল জ্বালা করতে লাগল। ... আইনস্টাইন তাঁর পড়ার ঘরের দরজা খুলে চীনা ভদ্রলোককে বেরিয়ে যেতে দিলেন এবং আমাকে ঢুকিয়ে নিলেন। আইনস্টাইনের পরনে সকালের কোট ও ডোরা-কাটা পাৎলুন। পাৎলুনের একটি জরুরি বোতাম নেই। সেই পরিচিত মুখ, যা সেই সময়কার পত্রপত্রিকায় ঘনঘন দেখা যেত। কিন্তু তাঁর চোখের জাজ্বল্যমান আভা কোনো ছবিতেই ফুটতে পারে না।

কী বলব সেটা মনে মনে ভালোভাবে তৈরি করেছিলাম। কিন্তু সমস্তই

অপরের মতামত শোনা। আরও উদ্দেশ্য ছিল দেশে-দেশে ও জাতিতে-জাতিতে সম্পর্ক ভালো করে তোলা।

তাছাড়াও উদ্দেশ্য ছিল। তা হচ্ছে জিওনিজম-এর পোষকতা। বাস্তবে তার অর্থ ছিল, ইহুদীদের স্বদেশ হিসেবে প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা (১৯৪৮ সালে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)।

আবার এই বিশের দশকেই, যখন তিনি খ্যাতির তুঙ্গে, তাঁকে নিয়ে দুনিয়াব্যাপী প্রচণ্ড সোরগোল, তখনো কিন্তু তিনি তাঁর নতুন গবেষণা থেকে বিচলিত হননি। তিনি সন্ধান করেছিলেন বিদ্যুৎ-চুম্বকত্ব ও মহাকর্ষের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক—একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব। যা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে, 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার ভাষায়, 'গ্রহের চক্রগতি, পরিক্রমাশীল আলোর গতি, পড়ন্ত পাথরের প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণ, হীরকের দ্যুতি, রেডিয়ামের অস্থিরতা, হাইড্রোজেনের হাল্‌কাভার, সীসের গুরুভার, তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ, বস্তু-শক্তি-সময়-স্পেসের লক্ষ লক্ষ প্রকাশ।' আইনস্টাইন

ভুলে গেলাম। আইনস্টাইন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ও আমাকে একটা সিগারেট দিলেন। বার্লিনে আসার পরে এই প্রথম কেউ একজন আমার দিকে তাকিয়ে বন্ধুভাবে হাসলেন। সংক্ষেপে আমার অবস্থা তাঁকে জানালাম। আইনস্টাইন মন দিয়ে শুনলেন।

'শিক্ষামন্ত্রকের কাছে তোমার নাম সুপারিশ করতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু আমার চিঠির কোনো দাম নেই।'

'কেন?'

'কারণ আমি অনেক অনেককেই সুপারিশ করেছি—' তারপরে গলা নামিয়ে গোপন কথা বলার মতো করে বললেন, 'ওরা ইহুদী-বিরোধী।'

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

'তুমি যে পদার্থবিজ্ঞানী, এতে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক প্লাঙ্কের কাছে আমি চিঠি দেব। অধ্যাপক প্লাঙ্ক যদি সুপারিশ করেন তাহলে অনেক বেশি কাজ হবে। হ্যাঁ, এই হলেই সবচেয়ে ভালো হয়।'

তিনি লেখার কাগজ খুঁজতে লাগলেন। কাগজ সামনেই ছিল ... তিনি সেই কাগজে কয়েক লাইন লিখে দিলেন। একবার জানতেও চাইলেন না পদার্থবিজ্ঞানে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা আছে কিনা।'

চাইছিলেন বস্তু ও শক্তির নিখিল ধর্মকে একটিমাত্র সমীকরণে বা সূত্রে সম্পর্কিত করতে। আইনস্টাইনের বাকি জীবন এই একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের নিষ্ফল সন্ধানেই কেটেছিল।

১৯২৯ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে ৫০তম জন্মদিনে আইনস্টাইন সারা বিশ্ব থেকে অভিনন্দন লাভ করলেন। জার্মানির চ্যান্সেলর হেরমান মুলারের পক্ষ থেকেও তাঁকে সম্মান জানানো হল। এক আউন্স তামাক উপহার পেলেন একজন জার্মান শ্রমিকের কাছ থেকে। অন্যদিকে আপেক্ষিকতা বিরোধী কোম্পানী থেকে একটি পুস্তক প্রকাশিত হল—'আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে শত গ্রন্থকার'। আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন, 'আমি যদি ভ্রান্ত হই তাহলে একজনই তো যথেষ্ট।'

এই ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকেই প্রুশিয়ান আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের প্রথম ভাষ্য। কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলেও শেষপর্যন্ত বিশেষ সাড়া জাগল না। আইনস্টাইন অটল রইলেন।

কিন্তু তিনি বিচলিত হচ্ছিলেন বিশ্বের ঘটনাবলীতে কিছু বিপর্যয়ের সংকেত লক্ষ করে। প্যালেস্টাইনের ইহুদী বসতি-স্থাপনকারীদের ওপরে আরবরা হিংস্র আক্রমণ শুরু করেছিল। জার্মানিতে নাৎসীরা ক্ষমতা দখল করছিল। লীগ অব নেশন্‌স-এর অথর্বতা প্রকাশ পাচ্ছিল (প্রতিবাদে আইনস্টাইন বুদ্ধিজীবী সহযোগিতা কমিটি* থেকে পদত্যাগ করলেন)। নিউইয়র্কের

* লীগ অব নেশনস-এর আওতায় এই কমিটি গঠিত হয়েছিল—'বুদ্ধিজীবী সহযোগিতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিটি'। অনেকটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের য়ুনেস্কোর মতো। ১৭ মে ১৯২২ তারিখে লীগের সাধারণ সম্পাদক স্যার এরিক ড্রামণ্ড আইনস্টাইনকে এই কমিটির সদস্য হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন মাদাম কুরী, লোরেন্‌ৎস্‌, পল পাঁলেভে ও গিল্‌বার্ট মারে। এঁরা সদস্য হয়েছিলেন বিশেষ বিশেষ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, আপন আপন কৃতিত্বের গৌরবে। ২১ মার্চ ১৯২৩ তারিখে আইনস্টাইন কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন—'সম্প্রতি আমি স্থিরনিশ্চয় হয়েছি যে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বা শুভেচ্ছা কোনোটাই লীগ অব নেশন্‌স্‌-এর নেই।' আইনস্টাইনের পদত্যাগের আশু কারণ ছিল ফরাসীদের রুঢ় দখল।

শেয়ারবাজারে ধস নামায় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

১৯৩১ সালে আইনস্টাইন অভ্যাগত অধ্যাপক হয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে বিজ্ঞান নিয়ে যেমন আলোচনা করলেন তেমনি শান্তিবাদের পক্ষে প্রচার চালালেন। এমনকি 'যুদ্ধ-প্রতিরোধীদের আইনস্টাইন আন্তর্জাতিক তহবিল' স্থাপনেও অনুমতি দিলেন। এমনিভাবে বিপুল এক জনমতের চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেনিভায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ওপরে। পরে এই সম্মেলন অসার্থক হতে আইনস্টাইন হতাশাগ্রস্ত হন এবং জেনিভাতে এসে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ভণ্ডামির স্বরূপ প্রকাশ করেন।

আইনস্টাইন ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন। আইনস্টাইনের সারা জীবনে মানুষটিকে সবাই দেখেছে শান্তভাবে কথা বলতে, কখনো উত্তেজিত না হতে, উচ্ছল উদ্দাম প্রাণবন্ত হাসি হাসতে*, তাঁর এই

* আইনস্টাইনের মৃত্যুর মাত্র পক্ষকাল আগে শেষ যাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছিল তাদের একজন হচ্ছেন হারভাডের অধ্যাপক বার্নার্ড কোহেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ। তিনি লিখছেন,

'গোটা কামরায় সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে অতি প্রকাণ্ড একটা জানলা আর তার বাইরে সুন্দর সবুজ দৃশ্য। দেওয়ালের খালি জায়গায় টাঙানো রয়েছে বিদ্যুৎচৌম্বক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতাদের ছবি—ফ্যারাডে ও ম্যাক্সওয়েল। আইনস্টাইন এলেন, আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হাসলেন, তারপরে আবার ঘর ছেড়ে চলে গেলেন এবং পাইপে তামাক ভর্তি করতে করতে ফিরে এলেন।

তাঁর পোশাক অতি সাদাসিধে ধরনের। পরনে একটি বুকখোলা শার্ট, তার ওপরে নীল সোয়েটার, ছাইরঙা ফ্লানেলের পাৎলুন। পায়ে চামড়ার চটি। বসন্তকালের গোড়ার দিক বলে দিনটা অল্প ঠাণ্ডা ছিল, আইনস্টাইন তাঁর পায়ের ওপরে একটা কম্বল চাপিয়ে নিলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম—ভারি সুন্দর ও অসাধারণ একটি মুখ। সেখানে ধ্যানগম্ভীর বিষাদ, গভীর বলিরেখা, তবুও এমন ঝকঝকে দুই চোখ যে মনে হয় তাঁর কিছুমাত্র বয়স হয়নি। আমরা যখন কথা বলছিলাম তাঁর চোখ থেকে অনবরত জল

ক্রোধ প্রায় এক অস্বাভাবিক ঘটনা। একজন সাংবাদিককে তিনি বলেছিলেন, 'ওরা (রাজনীতিকরা ও রাষ্ট্রনেতারা) আমাদের প্রতারিত করেছে। ওরা আমাদের বোকা বানিয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার কোটি কোটি মানুষ, যাদের জন্ম হতে চলেছে এমন শত শত কোটি পুরুষ ও স্ত্রী—তারা সবাই প্রতারিত হয়েছে ও হচ্ছে, তাদের বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারসাজি করে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের জীবন ও স্বাস্থ্য ও কল্যাণ থেকে।' আইনস্টাইন সম্পর্কে বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 'তিনি ছিলেন শুধু বিরাট বিজ্ঞানী নন, বিরাট মানুষও। যুদ্ধের দিকে ভেসে চলা এক জগতে তিনি শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। উন্মত্ত জগতে তিনি ছিলেন প্রকৃতিস্থ, মতান্ধদের জগতে উদারনৈতিক।'

এই ঘটনার অল্প কিছুকাল পরে অষ্ট্রিয়ার মনঃসমীক্ষণবিদ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের সঙ্গে আইনস্টাইনের পত্রবিনিময় হয়। আইনস্টাইন বললেন, ঘৃণা ও ধ্বংসের প্রতি মানুষের নিশ্চয়ই একটা জন্মগত লালসা আছে। ফ্রয়েড স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, আছে। তার সঙ্গে আরো কিছু কথা যোগ করলেন, মানুষের আছে ভালোবাসা ও ঘৃণার অনুভূতি, এই কারণে যুদ্ধ জৈবগত দিক থেকে সুস্থ ব্যাপার। শান্তিবাদ হচ্ছে ব্যক্তিগত মানসিক বিশেষত্ব, আইনস্টাইনের

পড়ছিল। যখন হাসছিলেন, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছতে হচ্ছিল। মৃদু স্বরে ও স্পষ্টভাবে কথা বলছিলেন। ইংরাজিতে তাঁর অসাধারণ দখল, যদিও উচ্চারণ লক্ষণীয় রকমের জার্মান। আমি বলতে পারি, তাঁর মৃদু ভাষণ ও অনুরণিত হাসির মধ্যে পার্থক্যটা ছিল বিরাট। ঠাট্টাতামাসা উপভোগ করছিলেন আর যখনই মনের মতো কিছু বলতে পারছিলেন বা মনের মতো কিছু শুনছিলেন, হা-হা করে হেসে উঠছিলেন। সেই হাসি প্রতিধ্বনি তুলে দেয়াল থেকে দেয়ালে আছড়ে পড়ছিল। ব্যাপারটা অসাধারণ। তাঁর ছবি দেখে আমি মনে মনে তৈরি ছিলাম তাঁকে কি-রকম দেখব, তিনি কী পরে থাকবেন। তাঁর পড়ার ঘরের বিবরণও আমার শোনা ছিল। কিন্তু তাঁর এই অট্টহাসি, এই হা-হা হাসি, এই সহৃদয় সর্বগ্রাসী হাসি—এজন্য আমি একেবারেই তৈরি ছিলাম না।'

আইনস্টাইনের হাসির কথা আরো অনেকেই লিখে গিয়েছেন।

সাংস্কৃতিক উন্নতির উচ্চমানের সঙ্গে যা সরাসরি সম্পর্কিত।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে (১৪ জুলাই ১৯৩০) আইনস্টাইন আলোচনা করেছিলেন সত্যের প্রকৃতি নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

> প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের আলাপ হয়েছিল।…আইন-স্টাইন আর আমার মধ্যে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের মিল হল যে, নতুন নতুন যন্ত্রাবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ আহরণ করতে হবে।
>
> গত বছরের গ্রীষ্মে আবার জার্মানিতে যাই, বার্লিনের অদূরে কাপুট্-এ* আইনস্টাইনের নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম।…

---

* আইনস্টাইনের বয়স ৫০ বছর পূর্ণ হলে (১৯২৯) বার্লিন পৌরসভা আইনস্টাইনকে একটি বাগানবাড়ি উপহার দেবার সিদ্ধান্ত করেন। যেহেতু আইনস্টাইন নৌকো চালাতে ভালোবাসেন, তাই বার্লিনের উপকণ্ঠে লেকের ধারে একটি বাগানবাড়ি নির্বাচন করা হয়। খবরের কাগজে 'আইনস্টাইন ভবন' নাম দিয়ে এই বাগানবাড়ির ছবি পর্যন্ত বেরিয়ে যায়। কিন্তু আইন-স্টাইনের স্ত্রী এল্‌সা খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন সেই বাগানবাড়ি অন্য লোকের দখলে, এবং বিশ্ববিখ্যাত আইনস্টাইনের খাতিরেও তাঁরা উঠে যেতে রাজী নন। তখন পৌরসভা আইনস্টাইনকে উপহার দেবার জন্য একটুকরো জমি নির্বাচন করেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সেই জমিতে বাড়ি তোলা আইনত নিষিদ্ধ। তখন অন্য একটুকরো জমি দেবার চেষ্টা হয়, কিন্তু পৌরসভার এক সদস্যই প্রশ্ন তুলে বসেন, আইনস্টাইন কোন্ অধিকারে জমি পেতে চলেছেন? তখন আইনস্টাইন বার্লিন পৌরসভাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘোষণা করেন, তিনি নিজের পয়সাতেই জমি কিনবেন ও বাড়ি করবেন। এই হচ্ছে কাপুট-এ আইনস্টাইনের নিজের বাড়ি। ১৯৩২ সালের নভেম্বরে আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হবার আগে এই বাগানবাড়ি যখন ছেড়ে যাচ্ছিলেন, আইনস্টাইন তাঁর স্ত্রীকে বলেন, 'এবারে আমাদের এই বাগান-বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে তুমি বাগানবাড়িটাকে ভালো করে দেখে নাও।' এল্‌সা জিজ্ঞেস করেন, 'কেন?' আইনস্টাইন বলেন, 'তুমি আর কখনো এই বাগানবাড়ি দেখতে পাবে না।' আইনস্টাইনের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল, যদিও এল্‌সা তখন বিশ্বাস করেননি।

তাঁর দৃঢ় প্রতীতি এই যে, মানুষের মন বুদ্ধির নাগালের বাইরেও আছে এক সত্য। আমার বিশ্বাস, ব্যষ্টি-মানব ঐক্যসূত্রে বাঁধা সেই দিব্য মানবের সঙ্গে, যিনি আমাদের অন্তরে আবার বাইরেও। (অনূদিত, 'আইনস্টাইন : জীবন-জিজ্ঞাসা' থেকে)

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সত্যের প্রকাশ মানুষের মধ্যে দিয়ে। আইনস্টাইন বলেছিলেন, সত্যকে গ্রহণ করতে হবে মানুষ নির্বিশেষে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে। 'আমার কথাই ঠিক তা আমি প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু এই আমার ধর্ম।' দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন, 'জ্যামিতিতে পীথাগোরাসের উপপাদ্যটি এমন একটি তত্ত্বকে উপস্থিত করছে, যা বিশ্ব-সংসারে মানুষ থাক বা না-থাক সত্য হতে বাধা নেই।' নিরীশ্বরবাদকে অস্বীকার করে তারপরে বলেছিলেন, 'স্পিনোজার ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি, যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন অস্তিত্বশীলের সামঞ্জস্যের মধ্যে।'

আইনস্টাইনকে বহুবার এ-প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা। তিনি একই কথা বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি স্পিনোজার ইশ্বরে, যে ঈশ্বর বিশ্বের গাণিতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সমার্থক। আমি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না যে ঈশ্বরের ভাবনাচিন্তা মানুষের মঙ্গল নিয়ে, মানুষের নৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে।' অর্থাৎ তিনি ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না।

ইন্‌ফেল্‌ড লিখছেন, আইনস্টাইনের কাছে কোনো কিছুই পদার্থ-বিদ্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানবিক সম্পর্ক নয়, ব্যক্তিগত জীবন নয়, সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে চিন্তা ও এই উপলব্ধি যে কেমনভাবে 'ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন'। ঈশ্বরের নাম নিয়ে এই কথাটি নানাভাবে বলতেন আইনস্টাইন। তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় অনুভূতি এই ছিল যে প্রকৃতির নিয়মগুলোকে সরলভাবে ও সুন্দরভাবে বিবৃত করা চলে। যখনই নতুন কোনো ধারণা মাথায় আসত তিনি নিজেকে প্রশ্ন করতেন, 'ঈশ্বর কি এইভাবে জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন?' কিংবা প্রশ্ন করতেন, 'গাণিতিক এই কাঠামো কি ঈশ্বরের উপযুক্ত?' সাধারণ ভাষায় বলতে হলে, এই প্রশ্নের অর্থ—তত্ত্বটি কি যুক্তির দিক থেকে যথেষ্ট সরল?

ইন্‌ফেল্‌ড বলছেন, আইনস্টাইন যতোবার নিজস্ব ধরনে ঈশ্বরের নাম করেন, একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজকও তা করেন না।

প্রিন্সটনের ফাইনহলে একটি ঘর সাধারণত বন্ধ অবস্থায় থাকে, কিন্তু বিশিষ্ট কোনো অতিথি এলে খুলে দেওয়া হয়। ঘরের ভিতরে চুল্লির গায়ে আইনস্টাইনের একটি উক্তি খোদাই করা আছে: রাফিনীর্ট ইস্ট হের গোট্‌, আবের বোশাফ্‌ট ইস্ট এযার নিখ্‌ট (God is subtle, but he is not malicious)—ঈশ্বর অণীয়ান কিন্তু বিদ্বেষপরায়ণ নন।

আইনস্টাইন প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন ১৯২১ সালের মার্চে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জিওনিস্ট আন্দোলনের নেতা ডঃ ভাইৎস্‌মান। প্যালেস্টাইনে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থসংগ্রহ করাই এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল। আইনস্টাইন ততোদিনে জিওনিস্ট উদ্দেশ্যের সমর্থক হয়ে উঠেছেন। অথচ ১৯১১ সালে যখন তিনি প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন তখন যদিও ঘোষণা করতে হয়েছিল তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে চাননি। কিন্তু সেখানেই তিনি প্রথম লক্ষ করেন ইহুদী-বিরোধী মনোভাবের আলোড়ন। ১৯১৯ সালেই তিনি অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডঃ ভাইৎস্‌মানের সঙ্গে আমেরিকা সফরে সম্মতি দিয়েছিলেন।*

* জাহাজে চেপে আমেরিকায় পাড়ি দেবার সময়ে ভাইৎস্‌মান আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অল্প কয়েক কথায় আপনি আপেক্ষিকতা ব্যাখ্যা করতে পারেন?' ১৯১৯ সালের নভেম্বরের পর থেকে এ-প্রশ্ন আইনস্টাইনকে অনেকবার শুনতে হয়েছে, জবাবও তৈরি ছিল, ভাইৎস্‌মানকেও সেই স্মরণীয় জবাবটিই শুনিয়েছিলেন, 'আপনি যদি আমার জবাবের ওপরে খুব বেশি গুরুত্ব না দেন, যদি সেটাকে একধরনের তামাসা হিসেবে ধরেন, তাহলে আমি এইভাবে আপেক্ষিকতার ব্যাখ্যা করব। আগেকার কালে বিশ্বাস করা হত, বিশ্ব থেকে যদি সমস্ত বস্তু অদৃশ্য হয় তাহলে থেকে যায় সময় ও স্পেস। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে, বস্তুর সঙ্গে অদৃশ্য হয় সময় ও স্পেসও।'

আমেরিকা সফরে আইনস্টাইন সকলের কাছে সমান অভ্যর্থনা পাননি। কিছুসংখ্যক আমেরিকান আইনস্টাইন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত। সেটা আরো বিশেষ করে এই কারণে যে লেনিন সম্পর্কে আইনস্টাইন বলেছিলেন, লেনিন মহান ব্যক্তি। কিছুসংখ্যক আমেরিকানের কাছে আইনস্টাইন বামপন্থী বলে নিন্দিত ছিলেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের শীর্ষস্থান কেউ অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে তা হয়নি। বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান তিনি করতেন একেবারে তার ভিতরে প্রবেশ করে। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান একই ভাবে করতে যেতেন, আর তাই অনেক সময়েই অসার্থক হতেন। চালাকি ও কৌশল তিনি জানতেন না, তাই রাজনীতিতে কোনো অসাধারণত্ব দেখাতে পারেননি।

শেষ জীবন

১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করে। আইনস্টাইন তখন ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে। মার্চ মাসের মধ্যেই জার্মানিতে নাৎসী সন্ত্রাস শুরু হয়ে গেল। আইনস্টাইন ঘোষণা করলেন তিনি আর জার্মানিতে ফিরে যাবেন না। নাৎসীরা জার্মানিতে তাঁর বাড়ি তছনছ করল, তাঁর ব্যাঙ্কের অর্থ বাজেয়াপ্ত করল, তাঁর বই পোড়াল, তাঁর মাথার জন্য হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করল। আইনস্টাইন বললেন, তাঁর মাথার যে এত দাম তা তিনি জানতেন না।

১৯৩৩ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে জার্মানিতে শুরু হয়ে গেল সরকারী পদ থেকে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে ইহুদী বিতাড়ন। ষোল-শত লেকচারার বরখাস্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফ্রীৎস হাবের। তিনি সপরিবারে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন,

তবুও রেহাই পেলেন না। আর মাত্র কয়েক মাস পরে তাঁর অবসর নেবার কথা ছিল, সেইটুকু সময়ও তাঁকে দেওয়া হল না। মনের দুঃখে জেরুজালেমে যাওয়ার পথে তিনি মারা যান। আর আইনস্টাইনের পক্ষ নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলার জন্য মাক্স প্লাঙ্ককে হিটলার এই বলে শাসায় যে নিতান্ত বয়স হয়েছে তাই, নইলে মাক্স প্লাঙ্ককে জেলে পোরা হত।

আমেরিকা থেকে আইনস্টাইন সস্ত্রীক গেলেন বেলজিয়ামে। বেলজিয়ামের রাজা আলবার্টের সঙ্গে আইনস্টাইনের আগে থেকেই পরিচয় ছিল, রানী এলিজাবেথের সঙ্গে তিনি সঙ্গীতচর্চা করেছেন, কাজেই বেলজিয়ামের সমুদ্র-তীরের একটি শহরে তিনি নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে গেলেন।

কিছুদিন পরে ব্রাসেলস্-এ গিয়ে রাজা আলবার্টের সঙ্গে দেখা করলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতে অস্বীকার করাকে তিনি সমর্থন করেন কিনা। রাজার সঙ্গে আলোচনার পরে আইনস্টাইন প্রকাশ্য ঘোষণা করে শান্তিবাদ বর্জন করলেন এবং হিটলার জার্মানিকে প্রতিরোধ করার জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতির ডাক দিলেন।

১৯৩৪ সালে রাজা আলবার্ট মারা যান। তারপরেও বিধবা রানীর সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে আইনস্টাইনের বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ বজায় ছিল।

১৯৩৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে আইনস্টাইন শেষবারের মতো ইউরোপ ছেড়ে চলে যান। তাঁর গন্তব্য স্থান প্রিন্সটনের 'ইনস্টিটিউট অব অ্যাড্ভানস্ড স্টাডি'। এই প্রিন্সটনেই আইনস্টাইনের বাকি জীবন কেটেছে।

আইনস্টাইন যখন আমেরিকায় পৌছন, তাঁর সম্পর্কে তাঁর এক বন্ধু লিখছেন, 'দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর মধ্যে একটা কিছুর মৃত্যু ঘটেছে। আমাদের ঘরে একটা চেয়ারে তিনি বসেছিলেন, মাথার সাদা চুল আঙুলে পেঁচাচ্ছিলেন, আর বিশ্বের তাবৎ বিষয় নিয়ে স্বপ্নের মধ্যে থেকে কথা বলছিলেন। তাঁর মুখে আর কোনো হাসি ছিল না।'

১৯০৫ সালে আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন, ভর ও শক্তি সমতুল। তারপর থেকেই বিজ্ঞানীরা ভেবে আসছিলেন, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভরে আবদ্ধ শক্তিকে মুক্ত করার কোনো উপায় আছে কিনা। অতি বিপুল এই পারমাণবিক শক্তি। এক-কিলোগ্রাম কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যায়, এক-গ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে তার দশহাজার-গুণ অধিক পারমাণবিক শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ১৯০৫ সালে এমন কথা স্বপ্নেও ভাবা যেত না যে পারমাণবিক শক্তি মানুষ আয়ত্ত করতে পারবে। কিন্তু ১৯৩৯ সালে মনে হতে লাগল ব্যাপারটা সম্ভব হলেও হতে পারে।

পদার্থবিজ্ঞানীরা আতঙ্কিত হলেন। পরমাণুর শক্তি নিয়োজিত হতে পারে যেমন মানুষের কল্যাণে, তেমনি বোমা তৈরির জন্যও। পরমাণুবোমার ধ্বংস করার ক্ষমতা যে কতখানি তা কল্পনাতেও আনা যায় না। জার্মানরা ১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়া দখল করে নিয়েছে, ১৯৩৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়া। জার্মানির হাতে যদি পরমাণু বোমা এসে যায় তাহলে তো নাৎসীবাদের প্রসার ঠেকানো প্রায় অসম্ভব। পরমাণুর নিউক্লিয়াস সম্পর্কে বেশির ভাগ জ্ঞান তো জার্মানির গবেষণাগারগুলি থেকেই পাওয়া গিয়েছিল।* বিজ্ঞানীদের

* পরমাণু-বোমা তৈরি হওয়ার সঙ্গে আইনস্টাইনের নাম জড়িত করে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, যার অনেকটাই অসঙ্গত। তাই ব্যাপারটা আসলে কী ঘটেছিল তা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

যাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার বিদারণ সেটি ঘটেছিল ১৯৩৮ সালে, বার্লিনের কাইজার ভিল্‌হেল্‌ম গেজেলশাফ্‌ট (সমিতি)-এ। এই আবিষ্কারের সঙ্গে তিনজন বিজ্ঞানী যুক্ত ছিলেন—অটো হান্‌, ফ্রান্‌ স্ট্রাস্‌মান ও অস্ট্রীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী লিজে মাইট্‌নার। প্রকৃতপক্ষে, আরো আগে, ১৯৩৪ সালে, নিউ-ক্লিয়ার বিদারণ ঘটাতে পেরেছিলেন ইতালিতে ফার্মি এবং ফ্রান্সে আইরিন ও ফ্রীডরিক জোলিও কুরী। ব্যাপারটা তখন ঠিকমতো ব্যাখ্যা করা যায়নি। ব্যাখ্যা পাওয়া গেল ১৯৩৮ সালে যখন লিজে মাইট্‌নার ও তাঁর বোন-পো অটো ফ্রিশ বুঝতে পারলেন যে হান্‌ ও স্ট্রাসমানের পরীক্ষাকার্যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বিদারণ ঘটে গিয়েছে। লিজে মাইট্‌নার ইহুদী ছিলেন—সুইডেনে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরীক্ষাকার্যের ফল তিনি জানতে পারলেন

আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল এই কারণে যে জার্মানরা চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ইউরেনিয়ামের রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছিল।

আইনস্টাইন ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন এই কারণে যে বেলজিয়ামের রাজ-পরিবারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে আইনস্টাইন যখন পেকোনিক-এ তাঁর গ্রীষ্ম-আবাসে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে হাজির হলেন দুই পদার্থবিজ্ঞানী—লিও জিলার্ড ও ইউজিন ভাগ্‌নার। দুজনে আইনস্টাইনকে বুঝিয়ে বললেন ইউরেনিয়াম নিয়ে পরিস্থিতি কী ভয়ানক হতে পারে। তাঁরা প্রস্তাব করলেন, বেলজিয়ামের রানীর কাছে আইনস্টাইন একটি চিঠি লিখুন এবং রানীকে অনুরোধ করুন এমন ব্যবস্থা নিতে যাতে বেলজিয়াম কঙ্গোর ইউরেনিয়াম কিছুতেই জার্মানদের হাতে না পড়ে। আইনস্টাইন রাজী হলেন।

পরে ঠিক হল, আইনস্টাইন একটি চিঠি লিখবেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের কাছে এবং এই কথাটি জোরের সঙ্গে জানিয়ে দেবেন যে পরমাণু-বোমা প্রস্তুত করা যেতে পারে। যে-কোনো পদার্থবিজ্ঞানী চিঠি লিখলেই প্রেসিডেণ্ট সেটি পড়বেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু চিঠি যদি লেখেন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাহলে সেই চিঠি প্রেসিডেণ্টের হাতে পৌঁছবে আশা করা চলে। চিঠির গুরুত্ব বাড়াবার জন্য আইনস্টাইনের নাম প্রয়োজন ছিল।

হান্‌-এর কাছ থেকে পাওয়া চিঠি থেকে। হান্‌ বুঝতে পারছিলেন না ইউ-রেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে ঘা দিলে কেন বেরিয়াম নিউক্লিয়াস পাওয়া যাচ্ছে। বেরিয়াম আসছে কোথা থেকে? লিজে মাইট্‌নার ও অটো ফ্রিশ ধরতে পারলেন, আসলে যা ঘটে গিয়েছে তা হচ্ছে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের বিদারণ। অটো ফ্রিশ কাজ করতেন কোপেনহেগেনে নীল্‌স বোরের গবেষণাগারে। বোর এই খবর পেয়ে গেলেন। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক সভায় বোর এই খবর জানালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদার্থবিজ্ঞানীদের। এত সব কাণ্ডকারখানার কোনো কিছুর সঙ্গেই আইনস্টাইন জড়িত ছিলেন না।

এই চিঠির ফলে গঠিত হয়েছিল ইউরেনিয়াম বিষয়ক একটি উপদেষ্টা কমিটি। ইতিমধ্যে ব্রিটেনের বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে হিসেব পাওয়া গেল যে পরমাণু-বোমা নিশ্চিতই তৈরি হতে পারে। তারপরেই আমেরিকায় শুরু হল পরমাণু-বোমা তৈরি করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে একথা জানা সম্ভব ছিল না যে জার্মানিতে পরমাণু-বোমা তৈরি করার প্রয়াস বিশেষ অগ্রসর হয়নি।

আমেরিকান নাগরিক হিসেবে (১৯৪১ সালে আইনস্টাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছিলেন) আইনস্টাইন যুদ্ধপ্রয়াসে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পরমাণু-বোমা বানাবার প্রকল্পে তাঁর কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেওয়া হয়নি। তিনি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর পরামর্শদাতা। তাছাড়া, নিজের দুটি পাণ্ডুলিপি বিক্রি করে যুদ্ধ-তহবিলে এককোটি দশলক্ষ ডলার তুলে দিয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালের মে মাসে মিত্রশক্তির কাছে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে থাকে। ইতিমধ্যে তিনটি পরমাণু-বোমা আমেরিকার হাতে তৈরি হয়ে রয়েছে। ১৬ই জুলাই তারিখে নিউ মেক্সিকোর মরুভূমি থেকে বিশাল এক ব্যাঙের ছাতার মতো ধোঁয়ার মেঘ উঠতে দেখে বোঝা গেল পরমাণু-বোমার পরীক্ষাকার্য সফল। ৬ই আগস্ট তারিখে দ্বিতীয় পরমাণু-বোমাটি ফেলা হল জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপরে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ শহরটি ধ্বংস হয়ে গেল, পলকের মধ্যে মারা গেল সত্তরহাজার মানুষ, আরো বহু হাজার মানুষ তেজস্ক্রিয় রশ্মির ক্রিয়ায় মরার সামিল হয়ে রইল। এমনকি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিশুদের জীবনেও মৃত্যুর কালো ছায়া পড়ল।

আইনস্টাইনের সচিব (হেলেন ডুকাস) খবরটা বেতারে শুনলেন এবং বিকেলবেলা চায়ের সময়ে আইনস্টাইনকে জানালেন।

আইনস্টাইনের মুখ থেকে বোবা একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। তাঁর যে কী কষ্ট হচ্ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আরো তিনদিন পরে তৃতীয় বোমাটি ফেলা হল নাগাসাকি শহরের ওপরে। জাপান আত্মসমর্পণ করল। যুদ্ধ শেষ।

তারপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আইনস্টাইন তাঁর সময় ও তাঁর খ্যাতি নিয়োজিত করেছিলেন নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিপর্যয়ে মানবজাতি যাতে নিজেকে ধ্বংস না করে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এই সময়ে তাঁর চিঠি, তাঁর বার্তা, তাঁর প্রবন্ধ, তাঁর সাক্ষাৎকার, সমস্ত কিছুতেই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ও অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ছিল এই একটিই কথা—পারমাণবিক অস্ত্রের ওপরে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ চাই। অতীতের আইনস্টাইন সম্পর্কে কারও কারও ধারণা, তিনি ছিলেন বিমূঢ় আদর্শবাদী। কিন্তু এই শেষ দশবছরের আইনস্টাইন সম্পর্কে একথা বলা চলে না। তখন তিনি লক্ষ্যে স্থির, বক্তব্যে অবিচলিত। পরমাণু-বোমা তৈরি করার রহস্য সকলকে জানিয়ে দেওয়া হোক, তা তিনি চাইতেন না। তিনি স্পষ্টই বলতেন, আসল রহস্য তো হিরোশিমাতেই প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। সেটা এই যে পরমাণু বোমা সত্যিই বানানো যায়। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, সব দেশই পরমাণু বোমা হাতে পেয়ে যাবে। কাজেই এমন একটি বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যাতে মানবজাতির এই সর্বনাশা বিপর্যয়টি ঘটে যাবার কোনো কারণ না থাকে। এই বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সর্বপ্রকারে তিনি চেষ্টা করে গিয়েছেন। তাঁর জীবনের শেষ কীর্তি, রাসেল-আইনস্টাইন ঘোষণায় সই করা। ইংরাজ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলও পরমাণু বোমার ধ্বংসকাণ্ড সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাঁরই সঙ্গে একযোগে ঘোষণাটি তিনি প্রকাশ করেন। ঘোষণায় ছিল নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি। এই ঘোষণা থেকেই পাগওয়াশ সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে সমস্ত দেশের বিজ্ঞানীরা শান্তির সন্ধানে মিলিত হন।

১৯৪৫ সালে, যুদ্ধ শেষ হবার অল্প কিছুকাল পরে, আইনস্টাইন প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। কিন্তু তার-পরেও প্রতিদিন ইনস্টিটিউটে আসতেন এবং কয়েক ঘণ্টা কাজ করে যেতেন। আইনস্টাইনের কোনোদিনই মোটরগাড়ি ছিল না।

প্রিন্সটনে ১১২ মার্সার স্ট্রীটে যে-বাড়িটি তিনি কিনেছিলেন সেখানে এমনকি মোটরগাড়ি ঢোকার রাস্তা পর্যন্ত ছিল না। সত্তর পার হবার পরেও ইনস্টিটিউটে যাতায়াত করতেন একপিঠে হেঁটে, অন্যপিঠে ইনস্টিটিউটের বাসে।

প্রিন্সটনের এই বাড়িতেই ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে আইনস্টাইনের দ্বিতীয় স্ত্রী এল্‌সা মারা যান। তার দু-বছর আগে প্যারিসে মারা গিয়েছিল তাঁর বড়ো সৎ-মেয়ে ইল্‌জে। ছোট বোন মায়া ছিলেন মুসোলিনির ইতালিতে—সেখানে অসহ্য মনে হওয়াতে ১৯৩৯ সালে স্বামী-সহ চলে এলেন প্রিন্সটনে। স্ত্রী মারা যাবার পরে প্রিন্সটনের বাড়িতে আইনস্টাইনের দেখাশোনা করার জন্য ছিল সৎ-মেয়ে মার্গোট ও সচিব হেলেন ডুকাস।

আইনস্টাইনের পড়ার ঘরটি ছিল শোবার ঘরের ঠিক পাশেই। কয়েকটি খাড়া-খাড়া পিঠওলা চেয়ার, একটি টেবিল, আর দেয়াল বরাবর সারি সারি বইয়ের তাক—এই ছিল আসবাব। আইনস্টাইন তাঁর নিজের সম্পর্কে লেখা বই একেবারেই পড়তেন না। সাহিত্য পড়তে ভালোবাসতেন প্রধানত রুশ ঔপন্যাসিকদের—যেমন, দস্তয়েভস্কি ও তলস্তয়। গান্ধীর অনুরাগী ছিলেন, গান্ধীর আত্মজীবনী নিজে পড়তেন, অপরকে পড়ে শোনাতেন। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন ম্যাক্‌কার্থিবাদের প্রবল দাপট এবং আমেরিকানবিরোধী ক্রিয়াকলাপ তদন্ত কমিটির সামনে বুদ্ধিজীবীদের মাথা কাটা যাচ্ছে তখন আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'এই পাপের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর করণীয় কী? সত্য কথা বলতে কি, আমি গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগের বৈপ্লবিক পন্থা ছাড়া অন্য কোনো উপায় দেখি না।') আর পড়ে শোনাতেন হেরোডোটাস ও ফ্রেজারের 'গোল্‌ডেন বাউ'। 'ডন কুইক্‌সোট' তাঁর অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল এবং বারে বারে পড়েছেন। ইউরোপ থেকে তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তিনজন পদার্থবিজ্ঞানীর প্রতিকৃতি—মাইকেল ফ্যারাডে, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্‌সওয়েল ও নিউটন। এই তিনটি প্রতিকৃতি তাঁর পড়ার ঘরের দেওয়ালে সাজানো ছিল।

আইনস্টাইন প্রিন্সটনে এসেছিলেন ১৯৩৩ সালে যখন তাঁর বয়স চুয়ান্ন। তারপরেও তিনি পদার্থবিদ্যায় প্রচুর কাজ করে গিয়েছেন।

তবুও সত্যের খাতিরে বলতে হয়, তাঁর যে বিরাট কীর্তি, যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক পদার্থবিদ্যা, তা ছিল তাঁর পিছনে। পদার্থ-বিদ্যার জগৎ তাঁকে অনেকখানি উপেক্ষা করেই চলছিল। কিন্তু তিনি নিজে জানতেন, সময় চলে যাচ্ছে, বিশ্ব-রহস্যের চূড়ান্ত সমাধানটি হয়তো আর লাভ করা হল না। তাই একটি মিনিটও সময় নষ্ট করেননি। কিন্তু মিথ্যে আশাও ছিল না। ১৯৫২ সালে নিজেই লিখছেন, 'আমার কাজের কথা বলতে পারি, এখন আর সেটা বড়ো কিছু নয়—প্রচুর ফল আমি আর পাই না। বর্ষীয়ান রাষ্ট্রনেতা ও ইহুদী ঋষির ভূমিকা পালন করেই এখন আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

আইনস্টাইন বলতেন, তাঁর কোনো বিশেষ প্রতিভা নেই, আছে শুধু তীব্র কৌতূহল। বেঁচে থাকতেন কাজের ওপরে। তিনি যাই করুন, মনের মধ্যে সবসময়ে থাকত বৈজ্ঞানিক চিন্তা। সঙ্গে সবসময়ে থাকত তাঁর নোটবই—যখন তিনি নৌকায় চেপে জলে ভেসে বেড়াতেন, যখন তিনি রেলস্টেশনে বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করতেন। পিয়ানো বাজাতে বাজাতে হঠাৎ বলে উঠতেন, 'এই তো, পেয়ে গিয়েছি'—দেখা যেত, বৈজ্ঞানিক কোনো সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে বাতিল করে চলতেন। স্যুট পরার প্রয়োজন বোধ করতেন না, একটা জ্যাকেট বা সোয়েটার পরেই কাজ চলে যেত। সাজগোজ করতেন না—যেখানে সম্ভব এড়িয়ে চলতেন।

ঢিলেঢালা পোশাক, অগোছালো, বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাওয়া সাদা চুল—কোনোটাই তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়। এমনটি করলে খবরের কাগজে প্রচার ভালো চলবে, এমন কথা কখনো ভাবেননি। তাঁর মন আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত—তাই এমনটিই হয়ে গিয়েছে। এমনটিই আইনস্টাইন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের বিনয়ী। একবার অক্সফোর্ডের কলেজে ভোজের আসরে তিনি উপস্থিত, তাঁকে ঘিরে ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের মধ্যে দারুন ছুটোছুটি ও দারুন উত্তেজনা, তিনি সরলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আজ কি বিশেষ কোনো ব্যাপার আছে?

আইনস্টাইন মনে করতেন, তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত কথা নিয়ে কারও কোনো আগ্রহ থাকা উচিত নয়। নিজের আত্মজীবনীতে শুধুই প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানবিষয়ক তাঁর চিন্তা।

অবসর নেবার পরেও আইনস্টাইন রোজ সকালে ইনস্টিটিউটে এসে কাজ করতেন। দুপুরে বাড়ি ফিরে যেতেন। বিকেলে ও সন্ধ্যায় বোন মায়ার সামনে বসে বই পড়তেন। ১৯৫১ সালে মায়া মারা যান।

আইনস্টাইন পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না। ১৯২৮ সালে একবার নৌকাভ্রমণ থেকে ফিরে আসার পরে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। তখনই ধরা পড়েছিল অসুখটা হার্টের। তারপরে শল্য-চিকিৎসা হয়েছিল একবার ১৯৪৫ সালে, আরেকবার ১৯৪৮ সালে। কিন্তু ১৯৫০ সালের পর থেকেই তার শরীর ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। আমেরিকায় আসার পরে তিনি আর বিদেশে যাননি।

১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে আইনস্টাইন মারা যান। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অপারেশন করলে হয়তো আরো কিছুদিন বাঁচতেন। কিন্তু আইনস্টাইন রাজী হননি। মৃত্যুর সময় যদি হয়ে থাকে তো তাই হোক। এক বন্ধুর কাছে লিখেছিলেন 'বয়সে যে ন্যুব্জ, মৃত্যু তার কাছে আসবে পরিত্রাণ হিসেবে।'

আইনস্টাইন যদি আরো কয়েক বছর বেঁচে থাকতেন তাহলে দেখে খুশি হতেন যে পদার্থবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সাধারণ আপেক্ষিকতা ও মহাকর্ষ সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। পালসার, কালো-বিবর, ইত্যাদির আবিষ্কারে সাধারণ আপেক্ষিকতার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ, মহাকর্ষীয় বিকিরণও এখন আর নিছক কল্পনার বিষয় নয়। অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন, মহাকর্ষের পথ ধরেই পৌঁছনো যাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের আরো কাছে, যদিও এই পথের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্বও মিলিত হবে। কেমনভাবে তা কেউ বলতে পারে না। আইনস্টাইনও পারেননি। হাসপাতালে যে-রাত্রে মারা যান, তাঁর বিছানার পাশে একটি নোটবইয়ের পৃষ্ঠা খোলা

ছিল। একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব নিয়ে কিছু আঁক কষেছিলেন, শেষ করতে পারেননি। পরদিন সকালে উঠে শেষ করবেন ভেবেছিলেন।

মৃত্যু এসেছিল মধ্যরাত্রির কিছু পরে, ঘড়িতে তখন একটা বেজে পঁচিশ মিনিট। ইংরেজি ক্যালেণ্ডারের হিসেবে অল্প কিছুক্ষণ আগে নতুন দিন সোমবার শুরু হয়েছে। হাসপাতালে এসেছিলেন শনিবার, অনেক বলা-কওয়ার পরে। তাঁর মহাধমনী শক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং যে-কোনো সময় ফেটে পড়বার আশঙ্কা ছিল। শল্য-চিকিৎসা ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা ছিল না। কিন্তু আইনস্টাইন রাজী হননি। বলেছিলেন, একসময়ে তো শেষ আসবেই—যখনই আসুক, কী যায়-আসে। শনিবারের সকাল পার হতে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালে আসার পরে ভালো বোধ করতে লাগলেন। তক্ষুনি টেলিফোন করলেন মার্সার স্ট্রীটে, চেয়ে পাঠালেন তাঁর চশমা ও নোটবই। শেষের সময় যদি না হয়েই থাকে তাহলে বাকি সময়টুকুর অপচয় কিছুতেই নয়।

মৃত্যুর আগে জার্মানভাষায় বিড়বিড় করে কী যেন বলেছিলেন। নার্স তাঁর কথা বুঝতে পারেনি। শেষ হিসেব বাকি থেকে গেল বলে আইনস্টাইন কি অনুতাপ করেছিলেন? কোনো কারণ ছিল না। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি ('মাইন ভেল্ট্‌বিল্ট' বা আমার চোখে জগৎ নামে প্রকাশিত রচনা-সংকলনে): 'দার্শনিক অর্থে মানব স্বাধীনতায় আমার আদৌ বিশ্বাস নেই। প্রত্যেক মানুষ কাজ করে শুধু বাইরের বাধ্যবাধকতায় নয়, আভ্যন্তরিক প্রয়োজন অনুসারেও। শোপেনহাওয়ারের এই উক্তি—'মানুষ যা চায় তা সে করতে পারে, কিন্তু মানুষ যা চায় তা সে চাইতে পারে না'—যৌবনকাল থেকেই আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব অনুপ্রেরণা হয়ে থেকেছে।'—তাঁর জীবনে সত্যের চেয়েও বেশি। তিনি যা চেয়েছেন তা করতে পেরেছেন। উপরন্তু যা চেয়েছেন তা চাইতেও পেরেছেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীর শেষকথা নিশ্চয়ই অনুতাপের ছিল না।

শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর মস্তিষ্ক নিয়ে যেন গবেষণা করা হয়, তাঁর দেহভস্ম যেন অজ্ঞাত স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া

হয়। এই দুটি ইচ্ছা মান্য করা হয়েছে। তাঁর মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা এখনো শেষ হয়নি।

কিন্তু অন্য যে-কাজটি তিনি অনুমোদন করতেন না তা হচ্ছে তাঁকে নিয়ে জীবনী লেখা, তাঁর জীবন নিয়ে নাটক করা, তাঁর মূর্তি গড়িয়ে স্থাপন করা। জীবিতকালেই আইনস্টাইন দেখে গিয়েছিলেন নিউ-ইয়র্কের রিভারসাইড চার্চে বিশ্বের চিরকালের চোদ্দজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মধ্যে তাঁর মূর্তি বসানো হয়েছে। দেখে হেসেছিলেন। বেঁচে থাকলে তাঁকে নিয়ে এত জীবনী লেখা হচ্ছে দেখে আরো হাসতেন। এই বইয়ে যতোটুকু তাঁর জীবনী দেওয়া হয়েছে তাও অনুমোদন করতেন না। আইনস্টাইন তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, তাঁর মতো মানুষের হয়ে-ওঠার মৌল বিষয় হচ্ছে তিনি কী চিন্তা করেন, কেমনভাবে করেন। বিজ্ঞানে তাঁর সিদ্ধিও চিন্তাগত পরীক্ষাকার্যের মধ্যে দিয়ে, জার্মানভাষায় যাকে বলা হয় গেডান্‌কেন। আত্মজীবনীতে তিনি এই গেডান্‌কেনকেই উপস্থিত করেছেন। তবুও আইনস্টাইনের মতো বলা চলে, ঈশ্বর, তাই কি হয়।

আলবার্ট আইনস্টাইন

(জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা)

১৮৭৯, ১৪ মার্চ	জার্মানির উল্‌ম শহরে জন্ম (বর্তমানে পশ্চিম জার্মানি)।
১৮৮০	আইনস্টাইন পরিবার উল্‌ম ছেড়ে ম্যানিখে।
১৮৮১	আইনস্টাইনের বোন মায়ার জন্ম।
১৮৮৫	ম্যানিখের ক্যাথলিক স্কুলে পড়াশুনো শুরু।
১৮৮৯	ম্যানিখের লুইটপোল্ড জিমন্যাসিয়ামে ভর্তি।
১৮৯৫	জুরিখ পলিটেকনিকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য। জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগ।
১৮৯৫-৯৬	আরাউ কান্টোনাল স্কুলে পড়াশুনো।
১৮৯৬-১৯০০	জুরিখ পলিটেকনিকে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন।
১৯০০, জুলাই	জুরিখ পলিটেকনিক থেকে স্নাতক।
১৯০১, ২১ ফেব্রুয়ারি	সুইস নাগরিকত্ব লাভ।
১৯০২, ২৩ জুন	বার্ন পেটেন্ট অফিসে চাকরি শুরু।
১৯০৩, ৬ জানুয়ারি	জুরিখ পলিটেকনিকের সহপাঠিনী মিলেভা মারিচকে বিবাহ।
১৯০৪	প্রথম পুত্রসন্তান হান্‌স-এর জন্ম।
১৯০৫	'আনালেন ডেয়ার ফিজিক' পত্রিকায় ব্রাউনীয় বিচলন, আলোক-বিদ্যুৎ ক্রিয়া ও বিশেষ আপেক্ষিকতা বিষয়ে আইনস্টাইনের নিবন্ধ প্রকাশিত।
১৯০৮	বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিভাট্‌ডোৎসেণ্ট নিযুক্ত।
১৯০৯	জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানিত।
৬ জুলাই	বার্ন পেটেণ্ট অফিসের চাকরিতে ইস্তফা। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক।
১৯১০, জুন	দ্বিতীয় পুত্রসন্তান এডুয়ার্ডের জন্ম।

১৯১১, মার্চ	প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। জুরিখ থেকে প্রাগে।
	বেলজিয়ামের ব্রাসেল্স-এ প্রথম সোল্ভে কংগ্রেসে যোগদান।
১৯১২, আগস্ট	প্রাগ থেকে জুরিখে। জুরিখ পলিটেকনিকে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক।
১৯১৩	মার্সেল গ্রসমানের সঙ্গে সাধারণ আপেক্ষিকতা সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধ। নীলস্ বোর-এর পরমাণু-তত্ত্ব প্রকাশিত।
১৯১৪, ৬ এপ্রিল	জুরিখ থেকে বার্লিনে। প্রুশীয় বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য এবং প্রস্তাবিত কাইজার ভিল্হেল্ম ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ। স্ত্রী মিলেভার সঙ্গে বিচ্ছেদ।
	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু। শান্তিবাদী আন্দোলনে যোগদান।
১৬ নভেম্বর,	নয়েস ফাটেরলাণ্ড পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির সংশ্রবের বিরোধিতা।
১৯১৫, সেপ্টেম্বর	সুইজারল্যাণ্ডের ভেভে-তে রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
১৯১৬	সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশিত।
১৯১৮	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ।
	ভার্সাই-এ শান্তি সম্মেলন শুরু হবার আগে রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আইনস্টাইন সহ ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ জন বুদ্ধিজীবীর আবেদন।
১৯১৯, ১৪ ফেব্রুয়ারি	মিলেভার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ। আগে থেকেই কথা হয়ে থাকে যে আইনস্টাইন যখন নোবেল পুরস্কার পাবেন তার পুরো অর্থ মিলেভার প্রাপ্য হবে।
২৯ মে	গিনী উপসাগরে প্রিন্সিপে দ্বীপে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ে এডিংটন কর্তৃক তারার আলোকচিত্র গ্রহণ ও সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের প্রমাণ লাভ।
২ জুন	বাবার দিক থেকে খুড়তুতো বোন ও মায়ের দিক থেকে মাসতুতো বোন এল্সাকে বিবাহ।
৭ নভেম্বর	লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় সংবাদ: 'বিজ্ঞানে বিপ্লব: নিউটনীয় ধ্যানধারণা বাতিল'।
১৯২০	মায়ের মৃত্যু। জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ।
	জার্মানিতে ফিলিপ লেনার্ডের মতো বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে

	ইহুদী-বিরোধী বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের আইনস্টাইন-বিরোধী আন্দোলন শুরু।
১৯২১	জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম সফর।
৮ জুন	ব্রিটেনে প্রথম সফর। মানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে আপেক্ষিকতা বিষয়ে বক্তৃতা।
১৯২২, ২৮ মার্চ	পল লাজভ্যাঁর আমন্ত্রণে প্যারিসে আগমন ও বক্তৃতা।
১১ জুন	বার্লিন রাইখ্‌স্টাকে জার্মান শান্তি ফাউণ্ডেশনের সভায় বক্তৃতা।
নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর	একমাসব্যাপী জাপান সফর। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার কাজের জন্য, বিশেষ করে আলোকবিদ্যুৎ ক্রিয়ায় কাজের জন্য ১৯২১ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ। জাপান সফরের জন্য নোবেল পুরস্কার-দান অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত।
১৯২৩, ২ ফেব্রুয়ারি	তেল আভিভে উপস্থিতি।
৭ ফেব্রুয়ারি	হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন। ফেরার পথে মাদ্রিদে। মাদ্রিদের বিজ্ঞান আকাদেমিতে বক্তৃতা।
২১ মার্চ	লীগ অব নেশন্‌স-এর আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সহযোগিতা কমিটি থেকে পদত্যাগ।
নভেম্বর	ম্যানিখে হিটলারের ক্ষমতা-লাভের চেষ্টা ব্যর্থ। হিটলারের অভ্যুত্থানের সময়ে বার্লিন ত্যাগ ও লীডেন-এ আশ্রয় গ্রহণ।
১৯২৪	পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সম্ভাব্যতার সূত্র আবিষ্কার।
জুলাই	অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে ‘প্লাঙ্ক সূত্র ও কোয়ানটাম প্রকল্প’ বিষয়ে লেখা। আইনস্টাইন-কৃত জার্মান অনুবাদে এই লেখা ‘ৎসাইটস্রিফ্‌ট ফ্যুর ফিজিক’ পত্রিকায় প্রকাশিত।
১৯২৮	হঠাৎ শরীর ভেঙে পড়তে জানা যায় আইনস্টাইনের হৃৎপিণ্ডের অবস্থা ভালো নয়। একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব নিয়ে কাজ শুরু।
১৯২৯	বার্লিনের কাছে কাপুট্‌-এ গৃহ নির্মাণ। প্রুশীয় বিজ্ঞান আকাদেমির কাছে একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব বিষয়ে নিবন্ধ।

	'আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে একশোজন গ্রন্থকার' প্রকাশিত। বেলজিয়ামের রাজ-পরিবার দর্শন। বেলজিয়ামের রাজা ও রানীর সঙ্গে আইনস্টাইনের বন্ধুত্বের সূত্রপাত।
১৯৩০, ১৪ জুলাই	রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
১৪ ডিসেম্বর	নিউ ইয়র্কে উপস্থিতি ও শান্তিবাদী বক্তৃতা
১৯৩১ ফেব্রুয়ারি	আমেরিকার পাসাডেনায় (ক্যালিফোর্নিয়া) মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে হাব্‌ল-এর সঙ্গে আলোচনা এবং পরে ঘোষণা যে গোলকাকৃত মহাবিশ্বের ধারণা তিনি ত্যাগ করেছেন।
এপ্রিল থেকে মে	অকসফোর্ড পরিদর্শন ও রোড্‌স ভাষণ-দান। বিজ্ঞানে ডক্টরেট লাভ। অক্‌সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চে বক্তৃতা। রিসার্চ ফেলোশিপ গ্রহণ (যার ফলে বছরে একটি শিক্ষণকাল অক্‌সফোর্ডে কাটিয়ে যাবার সুযোগ লাভ)।
জুন	বার্লিনে।
শেষদিক	পাসাডেনায় (ক্যালিফোর্নিয়া) দ্বিতীয়বার আগমন।
১৯৩২ বসন্ত	বার্লিনে প্রত্যাবর্তন।
মে	ইংলণ্ডের কেমব্রিজে বক্তৃতা। গবেষক ছাত্র হিসেবে প্রথমবার অক্‌সফোর্ডে। বার্লিনে প্রত্যাবর্তন।
১৯৩৩ জানুয়ারি	আমেরিকায়, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে আগমন। জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতা দখল। জার্মানিতে ফিরে না যাবার ঘোষণা।
২৭ ফেব্রুয়ারি	হিটলার চ্যান্সেলর হবার পরে বামপন্থীদের ওপরে আক্রমণ শুরু করার কারণ তৈরি করার জন্য রাইখ্‌স্টাকে আগুন দেবার ব্যবস্থা।
মার্চ	জার্মানিতে আইনস্টাইন ও অন্যান্য জার্মান বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে নাৎসীদের আক্রমণ। একটি অ্যালবাম প্রকাশিত যাতে আইনস্টাইনের ছবির নিচে লেখা—'এখনো ফাঁসি দেওয়া হয়নি'। আমেরিকা থেকে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা।
২৮ মার্চ	আন্‌টোয়ার্প বন্দরে জাহাজ থেকে অবতরণ। মোটরে

ব্রাসেলস। জার্মান দূতাবাসে গমন ও জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগ।

'প্রুশীয় বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যপদ ত্যাগ।

লে কক্ সমুদ্রতীরে শরীররক্ষকের পাহারায় আশ্রয় গ্রহণ

২০ জুন গ্লাস্গো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের উদ্ভব' বিষয়ে বক্তৃতা।

২৫ জুলাই চার্চিল, চেম্বারলেন, লয়েড জর্জের সঙ্গে আলোচনা।

১৮ আগস্ট জার্মানির যুদ্ধ-প্রয়াসের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে চিঠি।

৭ অক্টোবর আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা।

প্রিন্সটনে 'ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্স্ড স্টাডিজ'-এ যোগদান।

১৯৩৬, ২০ ডিসেম্বর আইনস্টাইনের স্ত্রী এল্সার মৃত্যু।

১৯৩৮ বার্লিনে অটো হান কর্তৃক ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস বিদারণ।

১৯৩৯, ২ আগস্ট পরমাণু-বোমা নির্মাণের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে আইনস্টাইনের চিঠি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু।

১৯৪১ আমেরিকান নাগরিকত্ব লাভ।

১৯৪৫ জাপানের শহরের ওপরে পরমাণু-বোমা না ফেলার জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে আইনস্টাইনের চিঠি। চিঠি খোলার আগেই ১২ এপ্রিল ১৯৪৫ তারিখে রুজভেল্টের মৃত্যু।

৬ আগস্ট হিরোশিমার ওপরে পরমাণু বোমা।

৯ আগস্ট নাগাসাকির ওপরে পরমাণু বোমা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ।

১৯৫২ ইজরাইলের প্রেসিডেন্টের পদ প্রত্যাখ্যান।

১৯৫৩ ১২ জুন আন্-আমেরিকান তৎপরতা কমিটির কাছে উপস্থিত হতে যাঁরা অস্বীকার করেছেন তাঁদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় আইনস্টাইনের চিঠি।

সেনেটর ম্যাক্কার্থি কর্তৃক আইনস্টাইনকে 'আমেরিকার শত্রু' বলে ঘোষণা!

১৯৫৪		মানবিক অধিকারের সপক্ষে ও পরমাণু-বোমার বিরুদ্ধে প্রচার।
১৯৫৫	১৬ এপ্রিল	রাসেল প্রেরিত নিউক্লিয়র যুদ্ধ-বিরোধী ঘোষণায় আইনস্টাইনের স্বাক্ষর দান। আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর এই ঘোষণা রাসেল-আইনস্টাইন ইস্তাহার রূপে প্রচারিত। এই ইস্তাহার থেকেই শান্তির উদ্দেশে বিজ্ঞানীদের পাগ্ওয়াশ সম্মেলন শুরু।
	১৮ এপ্রিল	৭৬ বছর বয়সে আইনস্টাইনের মৃত্যু।

গ্রন্থপঞ্জী

(যে-সব বই থেকে বিশেষভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে)

1. Einstein—Jeremy Bernstein
2. Einstein—B. Kuznetsov
3. Einstein : The Life and Times—Ronald W. Clark
4. The Universe and Dr. Einstein—Lincoln Barnett
5. Relativity : The General and the Special Theory —Albert Einstein
6. Relativity and Man—V. Smilga
7. What is the Theory of Relativity—L. Landau, Y. Rumer
8. Albert Einstein and Relativity—D. Raine
9. ABC of Relativity—Bertrand Russel
10. Relativity and Common Sense—Hermann Bondi
11. Relativity for the Layman—J. A. Coleman
12. Special Relativity—J. G. Taylor
13. Space Time & Gravitation—Sir Arthur Eddington
14. Relativity & High Energy Physics—W.G.V. Rosser
15. The Special Theory of Relativity—H. Muirhead
16. Space and Time in the Modern Universe —P. C. W. Davies
17. Geometry Relativity and the Fourth Dimension —Rudolph U. B. Rucker
18. What Is Time ?—J. G. Whitrow
19. Einstein : The Man and His Achievement —BBC Broadcast Talks under the editorship of G. J. Whitrow
20. The Strange Story of the Quantum—Banesh Hoffmann
21. Born-Einstein Letters—Edited by Max Born
22. Ideas and Opinions—Albert Einstein
23. Quest : The Evolution of a Scientist—Leopold Infeld

অনুক্রমণী

আলবার্ট আইনস্টাইন

জীবন

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
১০	২	এল্‌জা	এলসা
২১	৩	এল্‌জা	এলসা
৭৯	১২	থাকার দরুন	থাকার দরুন বিষুবরেখার
৯৩	৭	সঙ্গে ও স্থিতিশীল	সঙ্গে স্থিতিশীল
১৩১	৮	কেন্দ্রাতিগ শক্তি	কেন্দ্রাতিগ বল
১৩১	১১	কেন্দ্রাভিগ শক্তি	কেন্দ্রাভিগ বল
১৪৭	১৫	মাপের প্রায় গুণ	মাপের প্রায় ২২/৭ গুণ
১৮২	১২	আদৌ নম্ভব নয়	আদৌ সম্ভব নয়